বাঙালির আড্ডা

ক্যালকাটা পাব্‌লিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

আড্ডা দিতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের

আড্ডার আগে

আড্ডা মানে শুধুই আড্ডা নয়। 'আড্ডা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ নানাভাবে পাওয়া যায় অভিধানগুলিতে। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত ও সংকলিত) দেখা যাচ্ছে এই শব্দটি একান্তভাবে বাঙালির নিজস্ব নয়। 'দ্রাবিড় শাখার কোন কোন ভাষায় বিতঃ মালটো ভাষায় আড্ডা— বাড়ি; পরিবার।' এই অভিধান জানাচ্ছে হিন্দিতে 'অড্ডা' শব্দটির অর্থ 'ঠিকানা-- (অসদর্থে জুয়া খেলার, গাঁজার, গুলির আড্ডা), ঠিকানা, বাসা।'

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খন্ড)-এ হিন্দি 'অড্ডা' শব্দটিকে তুলনা করা হয়েছে সংস্কৃত 'অট্ট'-র সঙ্গে। আবার তামিল ভাষায়ও 'আডর' শব্দটির সঙ্গে মিল আছে বাংলা 'আড্ডা' শব্দের অর্থের। সেখানেও বলা হচ্ছে 'সমবেত হওয়া, একসঙ্গে মেলা'। উচ্চারণভঙ্গিতে পৃথক বটে, কিন্তু শব্দার্থ একই।

বাংলায় আড্ডা শব্দের অর্থ আছে নানাভাবে। এখানে চারটি অভিধান অনুসরণ করলে আমারা দেখব 'আড্ডা'র যেমন নানা অর্থ আছে, তেমনই যাকে আমরা 'আড্ডা' বলি, সেটিও খুব প্রশংসনীয় নয় অভিধানে।

'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ আড্ডা শব্দের অর্থ— ঠিকানা, বাসা, একত্র হইবার বা মিলনেব স্থান (বিশেষত দুষ্টলোকদিগের), সাম্প্রদায়িক আখড়া, উত্তরণ স্থান, সরাই, চটি, গাড়ি, পাল্কির বাহকেরা যেখানে ভাড়া খাটিবার জন্য উপস্থিত থাকে।

'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ এই শব্দটির অর্থ— নির্দিষ্ট থাকার স্থান, বাসস্থান, ঠিকানা, বাসা, ঠিকা গাড়ি, পাল্কি, বিশেষ কাজের জন্য লোকেদের সম্মিলিত স্থান, একই ব্যবসা বা একই দেশের লোকেদের বাসস্থান, আখড়া, পথিকদের বিশ্রামস্থান, সরাই বা চটি, যানের আরোহীদের উঠানামার বিশেষ স্থান, দুর্বৃত্তলোকের মিলনের স্থান, পায়রা বসিবার উঁচু স্থান বা ছতরি।

'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত)-এ এর অর্থ-- অবস্থিতি, স্থান, বাসা, গাড়ি প্রভৃতি থামিবার স্থান, স্টেশন, আখড়া, অনেক লোক জটলা করিবার জায়গা, আমোদপ্রমোদের বৈঠক।

'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' (সাহিত্য সংসদ) জানাচ্ছে, আড্ডার অর্থ, বাসস্থান, মিলন স্থল (চোরের আড্ডা, গুলির আড্ডা), আখড়া, বৈঠক (শব্দটি প্রধানত নিন্দার্থে ব্যবহৃত)।

আড্ডা-র এতরকম অর্থ হলেও গ্রহণীয় হয়েছে 'মিলনস্থল' বা 'আমোদপ্রমোদের বৈঠক'। আড্ডা বলতে আমরা বুঝি সমবেত হয়ে গল্পগুজব করা। এর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে নেমেছে অন্যান্য অর্থ।

এত বিশদে কেন দেওয়া দরকার হল আড্ডার অর্থ? তার কারণ আড্ডা বলতে আমরা সমবেত হয়ে গল্পগুজব করার কথা বললেও, অভিধান অনুযায়ী এটাও নিশ্চিত হয়ে বলা হয়, আড্ডার কোনও সুফল নেই। অভিধানে আড্ডাকে বাঙালির জীবনের একটি সদর্থক গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে উল্লেখ করার সুযোগ হয়নি, সম্ভবত এই শব্দটি 'নিন্দার্থেই' ব্যবহৃত হত। মূলত, আড্ডাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল বা হয় কিছু অসৎ উদ্দেশে মিলিত হওয়া মানুষদের মধ্যে বা অপ্রয়োজনে আমোদের কথা চালাচালির মধ্যে। যে কারণে 'আড্ডামারা' বা 'আড্ডাবাজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ আড্ডায় আলস্যে সময় কাটান, বৃথা বা অনর্থক গল্পগুজবে সময় কাটান বা দুর্বৃত্তলোকের মিলনস্থান বা দুষ্টলোকেদের একত্র হওয়া কিংবা দলবদ্ধ হয়ে রঙ্গতামাশা করা বলে আড্ডাকে লঘু করে দেখানো হয়। অভিধান এইসব লক্ষণ দেখেই আড্ডার সংজ্ঞা তৈরি করেছে।

এটা থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে 'আড্ডা'র পরিচয় খুব সম্মানের নয়। বা আড্ডাবাজকে খুবই হেয় করে দেখতে হবে। এটা অবশ্য হয়েছে আড্ডার চরিত্রের প্রকাশ্য কিছু দিকের জন্য।

এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছে, আমরা ভাইবোনেরা যখনই আড্ডা দিতাম, মা বলতেন 'খালি ক্যাজাব ঠোকা হচ্ছে'। এর অর্থ মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারিনি এটি কোথাকার আঞ্চলিক শব্দ। তবে সেটি যে খুব রেগে, তাচ্ছিল্য করে বলতেন তা বুঝতে পারতাম। এছাড়াও নিশ্চয় আড্ডাকে তাচ্ছিল্য করে আরও অভিধান বহির্ভূত শব্দ আছে।

আড্ডা দেওয়া বা আড্ডামারা কোনও দিনই প্রশংসার যোগ্য হয়নি। ভাল ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে, তারা বৃথা কথার কচকচানিতে সময় নষ্ট করে না। আর গাঁজাখোর, গুলিখোর, বেকার, বখাটেরা আড্ডা দেয়। যারা কোনও কম্মের নয়, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় আর সারাক্ষণ আড্ডা মারে, তারা একেবারে বখে যাওয়া ছেলেপুলে। আমাদের গুরুজনদের এই বিশ্বাস ছিল, এখনও সেই বিশ্বাসে টাল ধরেনি।

কিন্তু আড্ডা যেমন অনেক কুফল দেখায় তেমনই তার আলোকময় দিক একটা ছিল, আছেও। বলতে হয় আড্ডার ভালো-মন্দ দুটি দিক আছে। এটা কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সফল ও সৃষ্টিশীলতায় অনুরাগী আড্ডাবাজরা 'আড্ডাবাজ' বলে গ্রহণীয় হন না। সমৃদ্ধ আড্ডার আলোকিত দিকটিও ঠিক আড্ডা বলে তুচ্ছভাবে ভাবা হয় না। বরং যে হাসিঠাট্টা, গল্প অবান্তর বা উদ্দেশ্যমূলক নয় সেগুলিই সাধারণের কাছে আড্ডা বলে বিবেচ্য। এই বৈষম্য বেশ চোখে পড়ে।

পাড়ার রকে (এখন প্রায় বিলুপ্ত) বসে দিনরাত বহমান আড্ডা, চায়ের দোকানে চায়ের ভাঁড় হাতে স্থূল কথায় সময় কাটানো, রাস্তার মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসি তামাশা

করা— এইরকম আরও আড্ডা থেকে প্রাপ্তি কিছু হয় না, হয়তো মনের উত্তরণও ঘটে না। এই আড্ডাই আমাদের চোখে পড়ে। আড্ডার এই মন্দ দিকটিই আমাদের কাছে আলোচিত, সেই কারণে আমরা আড্ডাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখি।

কিন্তু আড্ডার একটি ভালো দিক বা সুস্থ দিক আছে। সেই দিকটি এতই উজ্জ্বল যে আড্ডা সম্পর্কে মানুষের ধারণা পালটে দিতে পারে। সেই সব আড্ডায় জড়ো হন সাহিত্যস্রষ্টা, চিত্রকর, দার্শনিক, সঙ্গীতপ্রিয় এবং এইরকম আরও নানা কর্মে নিষ্ঠ মানুষেরা। সেই আড্ডায় তরল কথা হয়, খুনসুটি থাকে, পরচর্চাও হয়, কিন্তু গোপনে ও কখনও প্রকাশ্যেও থাকে জ্ঞানের আদানপ্রদান, কোনও সৃষ্টিশীল কর্মের প্রেরণা, মতবিনিময় ও সজীব মানসিকতার চলাচল।

বাঙালির এক চলমান সংস্কৃতি হল আড্ডা, যা আজও স্বীকৃত শিল্পকলা নয়। অথচ এই আড্ডা থেকেই উঠে এসেছে সৃষ্টিশীল ভাবনা ও কর্ম। অভিনব সব যোগাযোগ ঘটে গেছে আড্ডা থেকেই।

আমরা সেইসব আড্ডার দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে থাকি। সাগ্রহে ব্যাকুলভাবে জানতে চাই আড্ডার মর্মকথা। জানতে চাই আড্ডার নানা ক্ষেত্রে তার রূপ, গড়ন। সুবাস নিতে চাই আড্ডার।

আর কে না স্বীকার করবেন 'আত্মঘাতী বাঙালি'র অনেক কিছু গেলেও আড্ডাটি কতটা সরেস ও মধুময় আজও। আড্ডা ছাড়া বাঙালিকে ভাবা যায় না। তিনজন বাঙালি পৃথিবীর যে কোনও কোণে মিলিত হলে অবধারিতভাবে আড্ডায় মগ্ন হবেই। এ হচ্ছে বাঙালির নিয়তির মতো, পিছু পিছু ধায়।

এমনই একটি প্রেরণা থেকে সংকলন করতে চেষ্টা করি বাঙালির আড্ডার নানা ক্ষেত্র ও আড্ডাধারী বুদ্ধিজীবীদের তুমুল আড্ডাকে। ২০০৩-এ প্রথম প্রয়াস স্ব-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হৃদয়' পত্রিকায় 'বাঙালির আড্ডা'কে বিষয় হিসেবে পেশ করা। বলতে দ্বিধা নেই সেই সংখ্যাটি বেশই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণাই ছিল মূলত আগ্রহের। স্বক্ষেত্রে সফল ও নামি বিদগ্ধজনেরা শুনিয়েছিলেন তাঁদের সরস আড্ডার গল্প। ব্যক্তিগত আড্ডাই সমষ্টির ছবি দেখিয়েছে একটু আড়াল রেখে। তরল, সরল আড্ডার মধ্যে থেকে যে কীভাবে সৃষ্টির প্রেরণা ও সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, তারই আকরকথা তাঁদের লেখনীগুলি। বিশেষ করে এই মানুষদের আড্ডা যে নিছক আড্ডা হয়ে থাকেনি তার আভাসটুকু পাওয়া খুব জরুরি বাঙালির জন্য। বলতে হয়, এই সময়ে যখন আড্ডা স্বার্থসর্বস্বপ্রায়, ব্যক্তিগত ধান্দা পূরণের এক গোপন সহায়ক হতে চলেছে, তখন এইসব বিশিষ্ট মানুষদের নিঃস্বার্থ আড্ডা থেকে সামান্য মনোশিক্ষা তো নেওয়া যেতে পারে।

সেই সংখ্যাটিই আমাকে 'বাঙালির আড্ডা' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের আগ্রহ জাগায়। মূল উদ্দেশ্য আড্ডার গল্প শোনা ও আড্ডা নিয়ে দু'চার কথা জানা ও জানানো। 'হৃদয়' থেকে

শিবনারায়ণ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, সুধীর চক্রবর্তী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, হিরন মিত্রের ব্যক্তিগত আড্ডার স্মৃতিচারণার সঙ্গে আরও কিছু সংগ্রহ করে গাঙচিল-এর কাছে প্রস্তাব দিই বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে। অণিমা-অধীর বিশ্বাস সাগ্রহে রাজি হন দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াই। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ১৩৯০ সালে প্রকাশিত 'শারদীয় সত্যযুগ' পত্রিকার কাছে। সেখানে পেয়েছি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি। চণ্ডী লাহিড়ী ও কিন্নর রায়ের লেখা দুটি পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ 'কিঞ্জল' পত্রিকার (জানুয়ারি ২০০৭) কাছে। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই অশোককুমার রায়কে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে সাগ্রহে খুঁজে দিয়েছেন 'মানসী' পত্রিকার (৩য় সংখ্যা, ১৯৬২) একটি মূল্যবান আড্ডা।

আড্ডার নানা ক্ষেত্র আছে। বলা যায় বাঙালির আড্ডা সর্বআঙ্গিকেই আছে। আড্ডা নিয়ে তাত্ত্বিক কিছু আলোচনা তাই বিষয়ভুক্ত হল। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নৃত্য থেকে সংস্কৃতির নানা অঙ্গন তো বটেই বিভিন্ন স্থানবিশেষে আড্ডা পরিচিত হয়েছে, খ্যাত হয়েছে। আড্ডার এত দিককে সমষ্টির মধ্যে আনার প্রচেষ্টা নয়, বরং বলা যায় এই বিষয়টিকে উত্থাপন করার একটা চেষ্টা করেছি। তাই এই বইটিকে প্রথম খণ্ড হিসেবেই পাঠকের সম্মুখে আনা হল। বইটি আদরণীয় হলে নিশ্চয় প্রকাশক নিশ্চিন্ত হবেন, তিনি খুশি হলে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অনুমতি পাব বলেই আমার বিশ্বাস।

লীনা চাকী
জানুয়ারি ২০০৯

বি, ৮৫ লেকটাউন
কলকাতা-৭০০ ০৮৯

সূচি



পঞ্চাশের দশকে পাইকপাড়ার আড্ডা

শিবনারায়ণ রায়

আমের যেমন রকমফের আছে— ল্যাংড়া, আল্‌ফান্‌সো, হিমসাগর থেকে ভুতো বোম্বাই, বড় সিঁদুর, মধুগুলগুলি— আড্ডারও তেমনই কছম নানা। অল্পবয়সে দেখতাম সকাল থেকেই বেকার তরুণদের রকবাজ গুলতানি। প্রদোষকালে প্রাচীনদের বেঞ্চি পেতে পরনিন্দা, আর মধ্যদিনে অন্দরমহলের গৃহিণীদের খাস মজলিস। বয়স বাড়তে চোখে পড়ে উচ্চরোল রাজনৈতিক আসর, কলস্বন ফুটবল প্রেমিকদের বৈঠক, কফিহাউসে উঠতি কবিদের সরগরম সংলাপ, আপন আপন ক্লাবহাউসে উঠতি বড়লোকদের অমায়িক আস্ফোটন আর খালাসিটোলায় টপভুজঙ্গ সাঙাতদের সরস খিস্তিখেউড়। এদের সকলেরই এক-এক রকমের আড্ডা— অর্থাৎ সঙ্গসুখকামীদের মিলনস্থল।

আমার যৌবনকালে দুটি বিপরীত প্রকৃতির আড্ডায় বিশুদ্ধ সঙ্গসুখলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমটি ছিল বিভিন্ন বয়সী আদর্শনিষ্ঠ র‍্যাডিক্যালদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসমাকুল সমাগম। একটি বড় টেবিলের চারপাশ ঘিরে রোজ সন্ধ্যা ছটা থেকে

রাত দশটা/সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমরা আমাদের রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, বিলি ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতাম— তারই সঙ্গে প্রচুর তর্ক এবং মাটির ভাঁড়ে চা চলত। দিনেরবেলা সকলেই রুজিরোজগারে ব্যস্ত— আর তাই সন্ধ্যাটাই ছিল আমাদের মুক্তির উদ্দীপনের আর উপভোগ্য আড্ডার স্বেচ্ছাবৃত সময়।

দ্বিতীয় আড্ডাটি ছিল একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের র‍্যাডিক্যাল বন্ধুরা কেউ আসতেন জগদ্দল, কেউ খিদিরপুর, কেউ বালিগঞ্জ, কেউ শ্যামবাজার, কেউ বা হাওড়া কোন্নগর থেকে। আমরা জমা হতাম কলেজ স্ট্রিটে তিনতলায় আমাদের অপেক্ষমাণ দফতরে। সেখান থেকে বার হত আমাদের সাপ্তাহিক দ্য র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। দ্বিতীয় আড্ডার বন্ধুরা প্রায় সকলেই পরস্পরের প্রতিবেশী। বেশিরভাগের বয়স তিরিশের সামান্য এদিকে বা ওদিকে। বয়স এবং বাসস্থানের নৈকট্য ছাড়াও আমাদের পারস্পরিক আকর্ষণের মূল সূত্র ছিল শিল্প সাহিত্যের চর্চা— কেউ লিখিয়ে, কেউ আঁকিয়ে, কেউ গাইয়ে— এবং যাঁরা এর কোনওটাই নন, তাঁদের শিল্পসাহিত্যে অকৃত্রিম অনুরাগ। পাইকপাড়ার এই আড্ডা প্রায় দশ বছর জমজমাট ছিল— এরই টানে বাইরে থেকেও অনেকে এসে যোগ দিতেন— এই সমাবেশে রাজনীতি বা দলগত রেষারেষির কোনও স্থান ছিল না।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেকার এই সুহৃদসমাবেশের উল্লেখ ইতিপূর্বে কেউ-কেউ করেছেন। যদি পরিকল্পিত আত্মজীবনী লেখার সুযোগ সামর্থ্য শেষপর্যন্ত থাকে, এই পর্বটির জন্য একটি পরিচ্ছেদ সংরক্ষণের অভিলাষ আছে। আপাতত এর সূচনা এবং কিঞ্চিৎ ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ করে এর চেহারা এবং চরিত্রের খানিকটা আভাস দেবার চেষ্টা করব। তবে এটি কোনওক্রমেই সেই পূর্ব পরহীন সমাবেশের পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিন্যস্ত বিবরণ নয়। এটিকে বরং একটি নিতান্তই খসড়া হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে।

পঞ্চাশের দশকের সূচনায় আমার একক আস্তানা ছিল টালার নীলমণি মিত্র লেনের একটি তিনতলা বাড়ির ছাদের একটেরে এক চিলেকোঠায়। আসবাবের মধ্যে একদিকের দেয়াল জোড়া বইয়ের একটি বড় শেল্‌ফ— কেরোসিন কাঠের উপর ঘন করে আলকাতরার পোঁচ দেওয়ার ফলে মোটামুটি ভারসহ এবং মজবুত— একটি হাতলহীন চেয়ার এবং লেখার উপযোগী ছোট টেবিল, দশহাত ঘুরে আসা একটি প্রাগৈতিহাসিক পোর্টেবল টাইপরাইটার, মাটিতে মাদুর বিছানো, কোণে জলের কুঁজো। সৌভাগ্যবশত ঘরের তিন দিকে জানালা থাকায়

আলোহাওয়ার কোনও অভাব নেই। একজন অবিবাহিত অধ্যাপকের পক্ষে যথেষ্টর চাইতে বেশি। পাশ দিয়ে যখন ট্রেন যাতায়াত করে তখন জানালা ক'টিতে কেঠো সঙ্গত বাজে।

কিন্তু অবিবাহিত অধ্যাপকরাও কখনও-সখনও প্রবলভাবে প্রেমে পড়ে এবং একদা সেই চিলেকোঠায় 'রাজ্যহীন' এক রাজকন্যার আগমন ঘটল। সেই চিকনবরণী মঞ্জুকেশিনী তন্বী কন্যা সংসারকর্মে আমারই মতো অপটু বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যক্রমে তিনি অনিঃশেষ হৃদয়বতী এবং কষ্টসহিষ্ণু। ফলে আমি ঘরে থাকি বা না থাকি সেখানে আতিথ্য ছিল অবারিত, বন্ধুসমাগমের শেষ ছিল না। অতঃপর কিঞ্চিৎ চেষ্টাচরিত্র করে এল চৌকি, বিছানা, বালিশ, জানালার পর্দা, অনিয়মিত চা এবং কখনও-সখনও টোস্ট মামলেটের জন্য ইলেকট্রিক হিটার, আর সারাদিনের রুজিরোজগার এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় শেষে রাতের ভোজনপর্ব সরল করার উদ্দেশ্যে অধুনাবিস্মৃত কিন্তু সেকালের মহা-উপযোগী, উদ্ভাবনা ইন্দুভূষণ মল্লিকের ইকমিক কুকার। নবদম্পতির উড়নচণ্ডী গার্হস্থ্য জীবনকে কিঞ্চিৎ সুভদ্র করার ব্যাপারে সহায়ক ছিলেন আজীবন অকৃতদার দুই বন্ধু— টেম্পল প্রেসের মালিক যোগেন বসু আর কলেজজীবন থেকে আমার সঙ্গী সুশীল ভদ্র। এক-এক রাতে কোনও কোনও নাছোড়বান্দা সাহিত্যিক বন্ধু আসেন তাঁর সদ্যরচিত উপন্যাস বা নাটকের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে। সেটি পড়ে শোনাতে শোনাতে রাত দুটো আড়াইটে বেজে যায়, খাটের একপ্রান্তে বেচারি বরবর্ণিনী গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েন, মাঝখানে সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুসমাসক্ত অধ্যাপক আধশোয়া অবস্থায় আধঘুমে সিগারেটে টান দিতে দিতে পাণ্ডুলিপির পাঠ শোনে, কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বকামী সাহিত্যিক অক্লান্ত উৎসাহে তাঁর স্বরচিত কাহিনি পড়ে চলেন। দরিদ্র অধ্যাপকের পরম সৌভাগ্য তাঁর প্রিয়তম দয়িতা তাঁর এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন আধখ্যাপা অস্ফুটপ্রতিভা বন্ধুদের অত্যাচার শুধু মেনে নেন না, তাঁদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় অচিরে দাদা-ভগ্নী সম্পর্ক পাতিয়ে নেন। যে যুগে তেঁতুলপাতায় অক্লেশে ন'জন ধরত, হায় রে, সেই দরদিয়া যুগ ষাট সত্তরের দশকে উগ্র অসহিষ্ণু শহর কলকাতায় চিরতরে হারিয়ে গেল। সংসার চলছে ঠিকই, কিন্তু চিলেকোঠার ঘরে বর্ধমান অতিথি সৎকার ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এমন সময় একদিন সোদরপ্রতিম বন্ধু গৌরকিশোর ঘোষ এসে বললেন, "শিবদা, পাইকপাড়ায় একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যেতে পারে, আমার মা-বাবা বোনদের কলকাতায় নিয়ে আসতে চাই, যদি আপনারা আসেন তাহলে দু'জন মিলে ফ্ল্যাটটা নেওয়া

যেত।" আমার ছন্নছাড়া জীবনে লক্ষ্মীর আগমনের বার্তা পেয়ে আমার মা-বাবাও শেষ বয়েসটা আমাদের সঙ্গে একত্রে থাকার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী দশ বছরে আমাকে নানা কারণে এতবারই আস্তানা বদল করতে হয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু গৌরের মতো পরম বন্ধুর সঙ্গে একত্র বাসের লোভনীয় আকর্ষণ থাকলেও সপরিবারে ফ্ল্যাটে বাসের খরচা তো কম নয়। আমাদের সময় কলেজ-অধ্যাপকদের মাইনে ছিল মাসে দেড়শো থেকে আড়াইশোর মধ্যে। ফলে আমাকে সকালে এবং দুপুরে দুটি কলেজে কাজ নিতে হল। সৌভাগ্যবশত দ্বিতীয় কলেজের মাইনেটা ছিল কিছুটা ভদ্ররকমের। একেবারে নিশ্চিত নই গৌর তখন সত্যযুগ পর্ব শেষে আনন্দবাজারে যোগ দিয়েছে কিনা। মোদ্দা কথা দেখা গেল দুই পরিবার মিলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার মতো আমাদের সামর্থ্য হয়েছে।

তবে প্রথম যে অপরাহ্নে সেই ফ্ল্যাট দেখার জন্য পাইকপাড়ায় যাই সেদিন বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। দোতলায় ফ্ল্যাট, উঠে দেখি মধ্যিখানের ঘরে গৌরের বাবা, মেসোমশাই একটা তক্তপোশের ওপরে মশারি টাঙিয়ে যোগাসনে বসে আছেন। মশারির চারপাশ এবং ছাদ ঘিরে ঝাঁক-ঝাঁক দুর্ধর্ষ মশা দুর্গ নিপাতনে ব্যাপৃত। মেসোমশাই বললেন, চট করে মশারির ভেতরে চলে এসো শিবু, কিছু জরুরি কথা আছে। নানা তানাই-ভানাইয়ের পর তাঁর আসল কথাটা হল, দেখ মশা ব্যাপারটা কিছুই নয়, চিত্ত যদি নির্বিকল্প থাকে তবে মশা তো মশা, মুখ্যমন্ত্রীরও সাধ্য নেই তোমাকে কুপোকাত করতে পারে। একেবারে মোক্ষম কথা। গৌরের বাবার যোগ্য বাণীই বটে। তিনি ছিলেন যথার্থই নির্মোহ নির্দায়িত্ব পুরুষ। তাঁর বাণীই মেনে নিলাম।

এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই টের পাওয়া গেল, কলকাতায় এত পাড়ায় থেকেছি বটে, কিন্তু পাইকপাড়ার মতো পছন্দসই পাড়া আগে দেখিনি। ফ্ল্যাট থেকে বেরোলেই শাক-সবজির মস্ত খেত, পুকুর, মন্দির, ওয়ার্কশপ, আর তার ধারেই খোলা ড্রেনের অপর পাশে এমন একটি মায়াজাল বিছানো আবাস, সুরসিক ফরাসি পর্যটকদের ভাষায় যেখানে প্রবেশের পথ শতাধিক কিন্তু যেখান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাওয়া দায়। তার কারণ সেই আবাসের যিনি গৃহস্বামী তিনি যেমন অমায়িক ও অতিথিবৎসল, তাঁর স্ত্রী ততোধিক সহৃদয়া এবং হাস্যমুখী। গৌরকিশোর সেই পরকে-আপন করা গৃহস্থালিতে নিয়ে গেলেন এবং প্রথম পরিচয়েই সুরূপা এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে গীতার এবং আমার সেই যে

প্রণয় সম্পর্কের সূচনা হল, নানা ভাগ্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও তা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বজায় থাকে।

গৌরীশঙ্কর আসলে ছিলেন মনেপ্রাণে কথাসাহিত্যিক। আরও অনেক বই ছাড়াও 'অ্যালবার্ট হল' এবং' ইস্পাতের স্বাক্ষর'-এর মতো দুটি ভিন্ন প্রকৃতির উৎকৃষ্ট উপন্যাসের তিনি লেখক। কিন্তু একসময়ে প্রকাশনার ব্যবসায়ে নেমে তার একূল-ওকূল দু-কূলই শেষপর্যন্ত যায়। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর যতটা খ্যাতি-স্বীকৃতি পাওয়ার কথা তা তিনি পাননি, অপর পক্ষে পাকা ব্যবসাদার না হওয়ার ফলে প্রকাশনার ব্যবসা শেষপর্যন্ত তাঁকে ডোবায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে গড়ে ওঠা পাইকপাড়ার সাহিত্যিক-আড্ডার যে দুটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল তার মধ্যে প্রধান কেন্দ্রটি ছিল তাঁর শয্যাগৃহ-কাম-বৈঠকখানা। মিত্র ও ঘোষ প্রতিষ্ঠানের গজেন্দ্র মিত্রের অভিভাবকত্বে তিনি বেশ কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ফলে সে-যুগের তাবড়-তাবড় সব কথা-সাহিত্যিকদের তিনি ছিলেন স্নেহভাজন। সে যুগের সাহিত্য-সম্রাট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীর বৈঠকখানায় মাঝে-মধ্যেই এসে আড্ডা জমাতেন। কখনও-সখনও 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক'-এর বিভূতিভূষণ, ক্বচিৎ বিস্তারিতবপু ডাক্তার-সাহিত্যিক বনফুল, মাঝে-মধ্যে কুস্তিগীর দীর্ঘকায় প্রতিভাবান ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর তৎকালীন বিশেষ জনপ্রিয় কিছুটা হ্যাংলাটে চেহারার লেখক অবধূত। অবধূতের লোকঠকানো রদ্দিমালের চাহিদা বেশিদিন থাকবে না, আমার কোনও প্রবন্ধে এই মন্তব্য করায় অবধূত গৌরীশঙ্করকে পত্রক্ষেপে হুঁশিয়ার করেন, তাঁর বন্ধু শিবনারায়ণ যদি বাচালবৃত্তি ত্যাগ না করেন তাহলে তিনি, অবধূত, এমন মন্ত্রপূত বাণ প্রয়োগ করবেন যার ফলে সপ্তাহখানেকও কাটবে না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে উক্ত শিবনারায়ণের বাক্যস্ফূর্তি চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু এখনও বেঁচে আছি, অনুমান তাঁর মন্ত্রশক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমরা, যারা গৌরীর সমবয়সী, তারা কেউই এঁদের কারও আকর্ষণেই ওই বৈঠকখানায় জমায়েত হইনি। গৌরীশঙ্কর তো ছিলেনই , তাছাড়া ক্রমে গড়ে উঠেছিল আমাদের অনেকের ভিতর পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ। তবে এ গেহের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন সেখানকার গেহিনী সুরূপা। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা হয়েও আমাদের মতো উচ্চণ্ডেদের খুব সহজেই নিজের জন করে নিয়েছিলেন—আমাদের কারও জাতিবর্ণগত বাছ-বিচার করে না৷ চলার ফলে তাঁর বিশেষ স্নেহবান দাদা শুনেছি বোনের কাছে এলেও সেই অশাস্ত্রীয়

গৃহে জলস্পর্শ করতেন না। সুরূপার কল্যাণে সে বাড়িতে কোনও সময় অসময় ছিল না— গেলেই সুস্বাদু চা পাওয়া যেত (চায়ের এবং আরও অনেক ব্যাপারেই গৌরীশঙ্কর ছিলেন খুবই শৌখিন)— এবং চায়ের সঙ্গে কিছু না কিছু টায়েরও অভাব ঘটতে দেখিনি। সুরূপার প্রশ্রয় ছাড়া পাইকপাড়ার আড্ডা আদৌ গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ।

বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় ছোট হলেও রায়বাড়ির রূপবতী নববধূটিও ছিলেন সুরূপার মতই দিলদরাজ, প্রাণবন্ত, অনসূয় এবং অতিথিপরায়ণ। সহধর্মিণীর গুণকীর্তন এদেশে অসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু প্রায় দশ বছরব্যাপী আমাদের এই আড্ডা এতটা অবিরোধ এবং ফুর্তির সঙ্গে টিকে থাকতে পারত না, যদি না আমাদের সবরকম হৈ-হল্লায়, উদ্যোগ উদ্যমে আর বেলেল্লাপনায় দুই বাসার দুই গৃহিণীর সোৎসাহ সমর্থন থাকত। সুরূপার চাইতে বয়স কমের জন্যও বটে, আড্ডাবাজ আধুনিক পরিবার থেকে আসবার ফলেও বটে গীতার পক্ষে আমাদের আড্ডায় প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া কিছুটা সহজাত ছিল। সুরূপা ছিলেন আমাদের বন্ধুদের বৌদি আর গীতা তাদের আদরের ছোট বোন। অন্যদের মধ্যে কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রী শোভনারও এই আড্ডার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশ্রয় ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের বাড়ির অল্পবয়সিনীরা শুনেছি রঙ্গরসিকতা করতেন।

আমাদের আড্ডার সদস্যরা ছিলেন হরেকরকম। কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম-কানুন ছিল না, তবে সকলেরই রুজি-রোজগারের দায়-দায়িত্ব থাকবার ফলে সাধারণত প্রায় নিয়মিত আমাদের আড্ডা বসত রবিবারে এবং ছুটি-ছাটার দিনের সকালে। আট/সাড়ে আটটায় শুরু হয়ে চলত দুপুর দুটো আড়াইটে পর্যন্ত। মুখ্যত গৌরীশঙ্করের শয্যা-কাম-বৈঠকখানায়, মাঝে-মধ্যে গৌরের এবং আমাদের মিলিত ফ্ল্যাটে। আমাদের মিলিত ফ্ল্যাটের সামনের দু'খানি ঘরের একটিতে বাসিন্দা আমার মা-বাবা, অন্যটিতে আমাদের দুই কচিকাঁচা। চন্দন, ছুয়া এবং গীতা। আর পিছনের ঘরদুটিতে গৌরের মা অর্থাৎ আমাদের প্রিয় মাসিমা এবং গৌরের বোনেরা। মধ্যিখানের বড় ঘরটিতে দেয়াল জুড়ে ছিল আমার গ্রন্থসংগ্রহ। সেটি ছিল একই সঙ্গে আমার লেখাপড়ার ঘর এবং গৌরের শয়নকক্ষ। আমরা সহজেই একটা চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে আমাদের সেই যৌথ ঘরে দুপুরে এবং রাতেও আড্ডা বসত, কখনও-সখনও রাত্রের আড্ডা গড়াত চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত।

সকালের আড্ডায় হাজির হতেন পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের থলি, আমাদের প্রবীণ সদস্য দক্ষিণাদা, যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দক্ষিণা বসু। সঙ্গে নিয়ে আসতেন নানা টাটকা ভেতরের খবর যা সেদিনের কাগজে মিলত না, অনেকক্ষেত্রে যেসব গুপ্তকাহিনি চিরদিনই অপ্রকাশ্য থেকে যেত। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে আমি যখন বছরখানেকের জন্য ফেলোশিপ নিয়ে দেশের বাইরে যাই স্নেহপ্রবণ দক্ষিণাদা অভিভাবকের মতো নিত্যই গীতার সংসারের খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। আসতেন আমাদের সবচাইতে কাছের পড়শি যুবক বিশুবাবু। তিনি সাহিত্যিক নন, কিন্তু সুরসিক এবং বিজয়ার রাত্রে তাঁর হাতের তৈরি সিদ্ধির শরবত ছিল প্রসিদ্ধ। এমনিতেই দুই বাসার গৃহিণী মহা হাসকুটে। সেই শরবত পান করে যেভাবে সামান্য কারণে অথবা অকারণে তাঁরা হাসিতে গড়িয়ে পড়তেন তার ছোঁয়া সঙ্গে সঙ্গে আড্ডায় সংক্রামিত হত। আসতেন সন্তোষ ঘোষ— কথার অফুরন্ত ফোয়ারা— সন তারিখ স্মরণে নেই তবে মনে হয় 'কিনুগোয়ালার গলি' পড়ে তখনই আমি তাঁর অনুরক্ত— সব কিছুতেই তাঁর আগ্রহ এবং সব বিষয়েই তাঁর প্রবলভাবে উচ্চারিত মত। সাহিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্ক বেধে যেত। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আমার খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে একবার তাঁকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলা গিয়েছিল। সেদিন আড্ডায় আছেন গৌর, নরেন মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাজ্যেশ্বর মিত্র, অহিভূষণ মালিক, সন্তোষ এবং আমি। হয়তো আরও দু-একজন থেকে থাকবেন। সমকালীন বাংলাসাহিত্য এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছে। সকলেই আপন আপন মত বলছেন, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়ে চলেছে সন্তোষের বক্তব্য। তারাশঙ্কর, বনফুল, বিমল মিত্র থেকে নারায়ণ গাঙ্গুলি, সমরেশ বোস, সুবোধ ঘোষ কেউই আলোচনা থেকে বাদ যাননি। সমালোচক হিসাবে আমার দুর্নাম অনেকদিনের, কিন্তু সেদিন সন্তোষ একজনকেও রেয়াত করেননি। তীব্র, নিষ্ঠুর, শ্লীল, অশ্লীল, আগ্রাসী, উলঙ্গ আক্রমণ— বাক্যের পর অর্ধসমাপ্ত, অসমাপ্ত বাক্যে প্রবীণ এবং সমকালীন লেখকদের ধরছেন আর দুঃশাসনের বিক্রমে তাদের নিরাবরণের চেষ্টা করছেন। আমি সকলের অজান্তে টেবিলের নীচে একটি ব্যাটারি সেট করা টেপরেকর্ডার চালিয়ে রেখেছিলাম। আলোচনা যখন সাময়িকভাবে সমে পৌঁছেছে আমি টেপটি ঘুরিয়ে নিয়ে বাজাতে শুরু করি। শেষ হলে সন্তোষ মহা সন্ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ আপনি করেছেন কী! এ-যদি অন্য কেউ শোনে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আমার ধোপা নাপিত হুঁকো কলকে

সব যে বন্ধ হয়ে যাবে। লিখে খাই মশাই, আপনি কি সপরিবার আমাদের ভাতে মারবেন! না— টেপটি আমি আজ পর্যন্ত কোনও মাতব্বর ব্যক্তিকে শোনাইনি, তবে হারানো দিনের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেটি আমার সংগ্রহে তোলা আছে।

একেবারে উল্টো প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আমার পড়শি মস্ত গল্প লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন পরিচয় হয় সেদিন ভারী লজ্জা পেয়েছিলাম। তিনি যখন তাঁর নাম পরিচয় দিলেন আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো বলি, আপনার 'কিনু গোয়ালার গলি' আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদু হেসে বললেন,হ্যাঁ, অনেকেই এ ভুল করে, কিন্তু সন্তোষবাবুর মতো আমি তো চোখা কলমে লিখতে পারি না। আর তখনি সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল এই লেখকের 'দ্বীপপুঞ্জ' পড়ে কিছুদিন আগেই অন্যদের কাছে তারিফ করেছি। কিন্তু জ্যা-মুক্ত বাণ তো ফেরানো যায় না। নরেন মিত্র আমাকে ক্ষমা চাইবার অবকাশ দিলেন না। তাঁর মতো যথার্থ নিরভিমান প্রতিভা আমি অন্তত আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তিনি মৃদুস্বরে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ নিয়ে আলাপ শুরু করলেন এবং এইভাবে আমাকে সময় দিলেন তাঁর অন্য যে দু'একটি বই আমি ইতিমধ্যে পড়েছি— দেহমন ও দূরভাষিণী— তাদের উল্লেখ করে আমার ভুল পদক্ষেপ শুধরে নিতে। বস্তুত নরেনবাবু আমাদের আড্ডায় যখন আসতেন, কথা বলতেন খুব কম, যা বলতেন তাও খুব নিচু গলায়, তাঁকে কারও প্রায় চোখেই পড়ত না, এবং আমাদের ভিতরে গুজব ছিল ওই আড্ডা থেকেই তাঁর অনেক কাহিনির কাঁচামাল ছেঁকে নেন। তাঁর বাড়িতে গেলে দেখতাম ছোট টেবিলটিতে তিনি একাগ্রচিত্তে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন, আমাদের সেখানকার আড্ডা জমিয়ে রেখেছেন তাঁর সঙ্গীতজ্ঞা সহধর্মিণী শোভনা, তাঁর পরম অনুরক্ত ছোট ভাই ধীরেন মিত্র এবং ধীরেনের মৃদুহাসিনী লাবণ্যময়ী অর্ধাঙ্গিনী গৌরী।

এই আড্ডার আরেক গুণী সদস্য ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রী রূপে ইতিমধ্যেই পরিচিত সুরসিক প্রজ্ঞা রাজ্যেশ্বর মিত্র। যেহেতু আমি বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রীর সন্তান তিনি সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন আমিও কিছুটা বেদচর্চা করেছি। (বস্তুত পিতৃকণ্ঠে প্রত্যূষে বেদমন্ত্র শোনা ছাড়া বৈদিক ভাষা তখনও আমার অবোধ্য ছিল এবং এখনও তা অগম্য রয়ে গেছে— আমার যৎসামান্য দৌড় নির্বাচিত কিছু কিছু ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য পর্যন্ত)। ফলে বৈদিক মন্ত্রে সুর নিয়ে তিনি যেসব গবেষণা করেছিলেন সে বিষয়ে মাঝে মধ্যে আমার মতামত শুনতে চাইতেন। অপর পক্ষে আমার চেষ্টা ছিল তাঁর ভাবনার ধারাটিকে আমাদের কাছাকাছি যুগের অভিমুখে ফেরাবার

দিকে। এবং কখনও-সখনও সফল হলে সেদিনের সকালটি নিধুবাবুর টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রার গানে এবং উনিশ শতকের বিস্মৃত নানা সঙ্গীতে অতি মধুর হয়ে উঠত। তবে রাজ্যেশ্বরের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন পাকা ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর ততটা সুরেলা ছিল না। ক্বচিৎ তিনি পুরো গানের সবটা গাইতেন, তবে সে অভাব ভরিয়ে দিতেন নির্বাচনের বৈচিত্র্যে। সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফারসিরও চর্চা করেছিলেন, এবং ফলে পরবর্তীকালে তাঁকে দিয়ে রামমোহনের তুহফাত বাংলায় তর্জমা করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করি।

আমাদের আড্ডায় গানের কথা যখন উঠলই সবচাইতে স্মরণীয় সৌভাগ্যের কথাটাই বলি। এখনকার প্রজন্মের শ্রোতারা কালীপদ পাঠকের নামের সঙ্গে কতটা পরিচিত জানা নেই। বাজারে তাঁর রেকর্ড বা টেপ কোথাও দেখি না, পাওয়া গেলেও তা খুবই দুর্লভ। তাঁকে আমাদের এই আড্ডায় টেনে আনতেন সর্বত্রবিহারী সর্বজনপ্রিয় রূপদর্শী গৌরকিশোর। কালীপদ পাঠক ছিলেন টপ্পা গানের সর্বশেষ মহৎ শিল্পী, যাঁর গলায় স্বরগ্রাম সাধা, আর সেই অলৌকিক প্রতিভার দ্বারোদঘাটন করবার জন্য দু'এক পাঁইট রম ছিল যথেষ্ট। মেজাজ শরিফ থাকলে প্রহরের পর প্রহর টপ্পার গীতল প্রবাহ বয়ে চলত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা। সেই যে শুনেছিলাম "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" প্রেমের সেই মহামন্ত্র আশি বছর পেরিয়েও শান্তিনিকেতনের রুদ্রপলাশের আগুন ভরা পেয়ালার রূপ দেখতে দেখতে আজও বুকের হাড়ে বাজে। ভাগ্যিস গৌরের নির্দেশে তাঁর কিছু গান টেপ করে নিয়েছিলাম। তাঁর পরে আর কিছু-কিছু গুণীজনের গলাতেই টপ্পা শুনেছি। কিন্তু সেই রসালো স্বাদ পাইনি। আর যখন তিনি বলতেন তাঁর সঙ্গীতে শিক্ষানবিশির কিস্‌সা, সেই গুরুর দরজায় কচ্ছপের কামড় দিয়ে পড়ে থাকা, সেই অশেষ সাধনায় গুরুর নেকনজর লাভ, সেই অন্তহীন রেওয়াজের বিবরণ— বেঁটেখাটো হাসিখুশি মানুষটির টাকপড়া মাথা ঘিরে একটা আলোকবলয় যেন কখনও-সখনও দেখা দিত যা আমার কোনও সাহিত্যিক বন্ধুর মাথায় কখনও দেখিনি। কালীপদ ছিলেন গানের জগতের সন্ত পুরুষ।

মাঝে-মধ্যে আসতেন গৌরীশঙ্করের অতিথি হয়ে আরেক সঙ্গীতবিশারদ, অমিয় সান্যাল। গৌরী তাঁর বইয়েরও প্রকাশক। রসিক কিন্তু কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির, পরিবেশটি ঠিক মনোমতো না হলে বড় একটা মুখ খুলতেন না। অপর পক্ষে আমাদের সবিশেষ স্নেহভাজন সুহৃদ অহিভূষণ ছিলেন যদিও পেশায় আঁকিয়ে— তাঁর আঁকা স্কেচ বা কার্টুন ছাড়া রূপদর্শীর সরস লেখাগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত

না— তাঁর গলাটি ছিল দরাজ গম্ভীর। আমাদের সন্তান চন্দন (আমার দেওয়া পোশাকি নাম অমিতাভ) ছিল অহির মহাভক্ত। তার কোলে বসে মুগ্ধ হয়ে তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নাড়া আর তার গলায় সরগমের ওঠাপড়া দেখত এবং শুনত এবং তার অনুকরণ করতে ভালবাসত। আমরা অধিকাংশই সমবয়সী ছিলাম বটে, কিন্তু আড্ডার সময় বৃদ্ধ এবং শিশু, গৃহস্বামিনী অথবা সেবিকা সকলের জন্যই সে সমাগমের দরজা ছিল সদাই খোলা।

অহিভূষণের গলা ছিল যেমন ভারী, তাঁর দেহখানিও তার তুলনায় কম ওজনদার ছিল না। একদিন সামাল দিতে না পেরে গৌরীর চৌকির একটা পায়া ভেঙে পড়ল। অহি তো মহা বিব্রত। কিন্তু সুরূপার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসির প্রশ্রয়ে তাঁর লজ্জা মুছতে বেশি সময় লাগেনি।

তবে আমাদের আড্ডার স্থায়ী সদস্যদের বেশিরভাগই ছিলেন সদ্যস্ফুটমান কিছু কবি, সাহিত্যিক। আসতেন চারুদর্শন, মিষ্টভাষী, লম্বিতকেশ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ছন্দের কান তাঁর নির্ভুল, চিত্তজয়ী তাঁর আবৃত্তি। তাঁর 'নীলনির্জন' পড়ে আমরা মুগ্ধ— তাঁর 'হা-রে-রে রঙ্গিলা, তোর কথার টানে টানে' আমরাও পাগল। আবার তাঁর মতো আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও শান্তি দেয়নি, তবে 'শোকের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে' প্রেম আমাদের মধ্যে কাউকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আসতেন সহজ সরল স্বদেশী ঐতিহ্যে আন্তরিক অনুরাগ নিয়ে নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী কবি ও সঙ্গীতসাধক অরুণ ভট্টাচার্য। একেবারে বিপরীত ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যদৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত হতেন বিদগ্ধ নাগরিক কবি এবং সাহিত্য সমালোচক অরুণ সরকার। ছন্দ এবং শব্দ নির্বাচনে তাঁর অসামান্য নিপুণতা— লিখেছেন খুবই কম, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই নিখুঁত। তাঁর সেই প্রার্থনার পংক্তিগুলি— 'সেই রাত্রি তোমারই দখলে / আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে / আমার সত্তাকে করে ছাই ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই।' কিংবা 'রভসে দাউ দাউ সমুদ্রের / শরীরে পাকে পাকে ফসফরাস, / অন্ধকারে চুল এলিয়ে দাও / নখরে নীল হোক শুভ্র বুক।'— আশি বছর পেরিয়ে আজও ভুলতে পারি না। আসতেন সকলের স্নেহভাজন তরুণ রোমান্টিক কবি দেবদাস পাঠক, ল্যাগবগে চেহারা আর চোখভর্তি উদ্ভট কল্পনা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলুথালু পোশাকে কথাকার সন্তোষ গাঙ্গুলি, ঋজুকায় তকল্লবি নবনাট্যম গোষ্ঠীর একাধারে নাট্যকার, প্রযোজক এবং নায়ক দেবব্রত সুরচৌধুরী, নির্মেদ, কষ্টসহিষ্ণু, আপাতদৃষ্টিতে পরিপুষ্ট কিন্তু ভিতরে ব্যাধিজীর্ণ, স্পিনোজা-শিষ্য দার্শনিক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধকার শীতাংশু

চাটুজ্যে। প্রত্যেকের কথা স্মরণে নেই, কিন্তু দুই বিশেষ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিকের উল্লেখ না করলে পাইকপাড়ার আড্ডার কাহিনিতে মস্ত ফাঁক রয়ে যাবে।

প্রথমজন আমাদের সমবয়সী বিমল কর। পাইকপাড়ার একমাত্র দ্বিতল কিন্তু টিনের চালওয়ালা বাড়িতে শীতাংশু এবং কয়েকজন ভাড়াটের সঙ্গে তিনি বাস করতেন। এই নিরতিশয় লাজুক মানুষটিকে আড্ডায় নিয়ে আসেন তাঁর পরমবন্ধু গৌরকিশোর। (তিনিও পূর্বে ওই টিনের দুর্গের বাসিন্দা ছিলেন)। বিমলের শরীরে তৎকালে যে রূপ— অপুষ্টিতে অনিদ্রায় অথবা হজমের ব্যাধিতে— তাতে যে কোনও মেডিকেল কলেজের ক্লাসের দেওয়ালে তাঁকে টাঙিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকবৃন্দ অনায়াসেই ছাত্রছাত্রীদের শরীরস্থান বিদ্যার জ্ঞান দান করতে পারতেন। গৌরের সেজ বোন মীরা অভিযোগ করত যে বিমলদার সঙ্গে রিকশায় চড়লে সারা দেহে হাড়ের গুঁতোর ছাপ থেকে যায়। এহেন বিমল ছিলেন কিন্তু হাড়েমজ্জায় কথাসাহিত্যের নির্মীয়মাণ শিল্পী। তাঁর সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত বই 'হ্রদ'-এর বেশ কিছু কপি সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রী বিরাট এক থলি ভর্তি করে কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরতেন।

এখন, গৌরের কাছে খবর পাওয়া গেল বিমল একটি অসামান্য গল্প লিখেছে, নাম 'ইঁদুর'। আমি প্রস্তাব করলাম লেখক এটি প্রকাশের পূর্বে আমাদের আড্ডায় স্বয়ং পড়ে শোনান। গৌরের মুখে শুনেছিলাম বিমলের তলপেটে যখনি খেঁচ ধরে, তখনি নাকি তাঁর মাথায় একটি করে গল্পের কাঠামো বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে। এদিকে উঁচকপালে পশ্চিমমুখী সাহিত্যসমালোচক বলে আমার দুর্নাম লেখকমহলে রটে গিয়েছিল। বিমল গৌরের হাতে তাঁর গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ধরিয়ে দিলেন, তারপর যতক্ষণ না আড্ডা ভাঙল তিনি আশ্রয় নিলেন গৌরীশঙ্করের পায়খানার নিভৃতিতে। কমিউনিস্ট বনবার আগে পর্যন্ত যে মহাসূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসের আমরা অনেকে সবিশেষ অনুরাগী ছিলাম, বাংলায় যাঁর উত্তরসাধক কে হবেন বা হতে পারেন তা নিয়ে যাদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না, বিমল করের গল্পটি শুনে তাদের অনেকের সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম— 'ইউরেকা'! গল্পটিতে কিছু কিছু ত্রুটি অবশ্যই ছিল কিন্তু মনোজগৎ বিশ্লেষণে বিমলের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমাদের নজর এড়ায়নি। পরবর্তীকালে বিমল ভালো-মন্দ বিস্তর গল্প উপন্যাস লিখেছেন, তাঁর কাহিনি অবলম্বনে ফিল্ম হয়েছে, গাড়ি, বাড়ি, পরিপুষ্ট চেহারা, পরবর্তী প্রজন্মের গল্প

লেখকদের মধ্যে তাঁর মস্ত প্রতিপত্তি— বর্তমানের বিখ্যাত বিমলের সঙ্গে সেই লাজুক রোগা বেগানা বিমলকে মেলানো বেশ শক্ত। কিন্তু সেই আড্ডার দশকে অখ্যাত বিমল ছিলেন একান্তভাবেই আমাদের একজন।

আরেকজন ছিলেন দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট, আকারেও ছোট। সম্ভবত যাদের বামন বা ডোয়ার্ফ বলা হয় তাঁদের দলে পড়েন। কিন্তু তখনই ছাত্রমহলে একজন পান্ডা, সক্রিয় কমিউনিস্ট, বড় কথা, ইতিমধ্যেই পাকা হাতের কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। হাতের কাছে বইটি নেই, মনে করতে পারছি না, 'চর্যাপদের হরিণী' কোন সালে প্রকাশিত হয়। গৌরীশঙ্করের বিশেষ স্নেহভাজন, কখনও-সখনও পাইকপাড়ায় তাঁর গৃহেই রাতের জন্য আশ্রয় নিতেন। কোনও-কোনও দিন এমন হয়েছে, সুরূপা গৌরীকে চা দিতে গেছেন, শুধিয়েছেন তোমার বামন বন্ধুটি আছেন না চলে গেছেন, এতই খুদে মাপের মানুষ যে গৌরীর বুকের নীচে লেপের তলায় ঘুমোলে বাইরে থেকে তাঁর উপস্থিতি টের পাবার কোনও উপায় নেই। গৌরীশঙ্কর চোখ বড় বড় করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করতে সুরূপা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপর বারান্দায় এসে নিঃশব্দে হেসে কুটিপাটি।

এমন এক সন্ধ্যায় সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে আমাদের বিতর্ক ঘোরতর জমে উঠেছে। বিশুদ্ধ শিল্প বলে কি সত্যিই কিছু আছে? সাহিত্যিক সামাজিক জীব, যেহেতু ভাষা থেকে বিষয়বস্তু ও ভাবনাচিন্তা সাহিত্যের সব উপাদানই সমাজ থেকে নেওয়া/পাওয়া, সেহেতু সমাজের প্রতি সাহিত্যিকদের একটা অচ্ছেদ্য নৈতিক দায়িত্বও তো আছে। তা তো আছে, কিন্তু আসল সমস্যাটা সেই দায়িত্বের স্বরূপ নিয়ে। শিল্পী উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি করেই কি সে দায়িত্ব পালন করেন না? তবে তাঁকে দল পাকাতেই বা কেন হবে, কেন হতে হবে মিছিলের সামিল, কেন বিশেষ কোনও দল, শ্রেণি বা মতবাদের সমর্থক হতে হবে? বেশ উত্তেজিতভাবে আড্ডা চলতে চলতে রাত কখন বারোটা বেজে গেছে, কেউ টের পাইনি। হঠাৎ দীপেন ফুকরে উঠলেন, তাঁকে বাসায় নাকি ফিরতেই হবে, কথা দিয়ে এসেছেন। পাইকপাড়ায় ততক্ষণে বাস ভোঁ- ভোঁ। শেষপর্যন্ত দীপেনের করুণদশা দেখে গৌর আর আমি স্থির করি ট্যাক্সি করেই তাঁকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেব। ট্যাক্সি করে দীপেনকে কলকাতার দক্ষিণ দেশে পৌঁছে দেবার পর গৌর বললেন, ফেরার পথে সন্তোষদার ফ্ল্যাট পড়ে (সন্তোষ তখনও পাইকপাড়ায় ভাড়াটে হয়ে উঠে আসেননি), তাকে তোলা যাবে? ডাকতেই পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে চাদর সামলাতে

সামলাতে চোখ মুছতে মুছতে সন্তোষ বেরিয়ে এলেন। পাইকপাড়ার কাছাকাছি আসতে সন্তোষ বললেন, আরে মোহরের তো (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) কাল রেডিওতে প্রোগ্রাম আছে, ও নরেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ওঠে জানি, চলুন ওখানে ডাক পাড়া যাক।

রাতের সেই প্রায় তৃতীয় প্রহরে নরেন মিত্রের দরজায় তিন ডাকাতের হাঁক পড়ল। ভীত সচকিত গৃহস্বামী উঠে এসে আমাদের দেখে অবাক। সন্তোষ তখন আমাদের পান্ডা, ট্যাক্সিভাড়া সম্ভবত তিনিই মিটিয়ে ছিলেন। মোহরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বিশেষ সম্পর্ক। হুকুম দিলেন মোহরকে খবর দিন, তাঁর গান শুনবেন বলে শিবনারায়ণবাবু এসেছেন। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে উঠে এলেন মোহর, পিছনে কিছুটা হতভম্ব অবস্থায় শোভনা, গৌরী, ধীরেন। কিন্তু মোহরের অতি প্রসন্ন মুখ, এতটুকু বিরক্তির কোনও চিহ্ন নেই, যেন আমাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমার দীর্ঘজীবনে পৃথিবীতে এমন দু-চারজন মানুষই দেখলাম যাঁদের রক্তে প্রতিভা আর প্রসক্তি প্রায় সমান মাপে মেশানো। (মহাপ্রতিভাধর পাবলো পিকাসো ছিলেন একেবারে বিপরীত প্রকৃতির— অসামান্য সৃজনীশক্তির সঙ্গে এমন প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা এবং অপ্রসাদ ক্বচিৎ দেখা যায়)। চা এল, চৌকিতে, মোড়ায়, মেঝেতে, সভা বসল। মোহর একটির পর একটি বাছা বাছা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন, আমাদের চিরকালের জন্য ঋণী করে রাতের শেষ প্রহরে তিনি বিশ্রামের জন্য বিদায় নিলেন। কণিকার মৃত্যুর কিছুদিন আগে শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, নানা কথার সূত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করি। ব্যাধিজীর্ণ, রুদ্ধকণ্ঠ কণিকা ডুকরে ওঠেন, হায় কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব আশ্চর্য সহজ আনন্দের দিনগুলি।

অবশ্য আমাদের নৈশ আড্ডা সবসময়েই ঠিক এই ধরনের নির্ভার বা রোচিষ্ণু ছিল না। একবার প্রায় পক্ষকাল ধরে রেনেসাঁস বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সেদিন আমি সেটি শেষ করেছি। ঠিক হল রাতে আহারাদির পরে সেটি শোনা যাবে এবং তা নিয়ে আলোচনা হবে। বেশি লোক নয়, গৌর, শীতাংশু, আর যতদূর স্মরণে পড়ে অরুণ ঘোষ নামে এক যুবক (মেধাবী কিন্তু কিছুটা হামবাগ এবং অপত্রক, পরে আমেরিকায় উচ্চ মাইনেয় চাকরি পায়)। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হল। সমালোচনার মুখ্য প্রসঙ্গগুলি তুললেন শীতাংশু, তারপর তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে খানিকটা আলোচনা চলল। দু'বোতল পানীয় এবং সঙ্গে কিছু ভাজাভুজি আনানো ছিল, রাত আড়াইটে নাগাদ যখন আলোচনা একটা প্রায় মোক্ষম স্তরে

পৌঁছেছে, কোথায় কতটুকু ঘষামাজা দরকার সেটা স্থির হলে তবেই লেখাটি হয়তো প্রকাশ করা যেতে পারে, গলা আরেকটু সরস হলেই সিদ্ধান্তে সুরাহা হয়, তখন আবিষ্কার হল যে দু'টি পানীয়ের বোতলই নিঃশেষিত। ততক্ষণ দোকানপাট অবশ্যই বন্ধ। এদিকে শ্রীমান অরুণ আমাদের তর্কের সুযোগে হয়তো তাঁর সহ্যের পক্ষে কিছুটা বেশি পানীয় গলা দিয়ে অধঃক্ষেপ করিয়েছেন— মুহূর্তে মেঝে ভাসিয়ে ঘর দুর্গন্ধে ভরিয়ে তাঁর উদ্‌গীর্ণ বমি অসমাপ্ত আলোচনায় বুৎক্রম যবনিকা টেনে দিল। বেচারি গীতা! পাশের ঘরে আমার মা-বাবা শুয়েছেন, গীতার ঘরে দুই শিশু। তিনি কারুর সুখশান্তির কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নীরবে সেই বমন পরিষ্কার করলেন। শ্রীমান অরুণের মাথা ধুইয়ে তাঁকে একপাশে শুইয়ে দিলেন। আমরা তিন হতভম্ব ভাবুক কী যে করি ভেবে পেলাম না। কোথায় রেনেসাঁস, কোথায় সর্বংসহা, সেবাব্রতী অবিহ্বল তরুণী বাঙালি রাজকন্যা। ধরতাই বুলি যে কতটা ফাঁকা হতে পারে এই হ্বিগেনস্টাইনি তত্ত্বের সঙ্গে আবার পরিচয় ঘটল।

তবে সুখদ রাত্রির আড্ডাও যে একেবারে বসেনি তাও নয়। শান্তিনিকেতন থেকে সদলবল শান্তিদেব ঘোষ এসেছেন, গৌর তাঁর এবং সাগরময়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র, গৌরের ডাকে তাঁদের নিয়ে আসর বসল, আমাদের চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যের সেই মধ্যপ্রদেশী বড় কামরায়। শান্তিদেবের গান, গৌড়ানন্দের রসিকতা, চা-পান সিগারেটের অফুরন্ত সরবরাহ, পাইকপাড়ায় সেই একটা মশা-অধ্যুষিত কক্ষই রূপান্তরিত হল একটি হ্লাদিত সমারোহে। প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পরে মেলবোর্নের বুলিনপাড়ায় আমাদের গৃহে যে-রাত্রে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ একবার অন্তরঙ্গ আসর জমিয়েছিলেন সে-রাত্রে পাইকপাড়ার নৈশ আড্ডার কথা সুরভিত স্মৃতিতে ভেসে এসেছিল।

আড্ডার সূত্রে কিছু কিছু ভিনদেশি গুণীদেরও পাইকপাড়ায় আগমন ঘটত। একবার আমাদের পাইকপাড়ার ঘরে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে গেলেন তরুণ ইংরেজ সাহিত্যশাস্ত্রী ডেভিড ম্যাকাচিওন, তখন তিনি বিশ্বভারতীতে ইংরেজি এবং সম্ভবত ফরাসি পড়ান— দিনরাত আলোচনা, বেশিটা সময় ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে, কখনও কখনও কলকাতার সমাজ সাহিত্য বিষয়ে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল দুই বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম নিয়ে— ক্রমে এই বিষয়টিতে তিনি একজন আন্তর্জাতিক অথরিটি হয়ে ওঠেন। আমাদের গভীর দুর্ভাগ্য অকালে পোলিও ব্যাধির আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যত্র তাঁর কথা কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিখেছি। টেরাকোটা শিল্প বিষয়ে তাঁর বিশদ নোটিস্ এবং বিপুল প্রতিচ্ছবি সংগ্রহ

বিলাতে বিক্টোরিয়া অলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হয়েছে। একদিন দেখি দুই বাড়ির দুই পুত্র সুরূপার ছেলে বুলান, গীতার ছেলে চন্দন, তখন তাদের বছরপাঁচেক বয়স হবে, পরস্পরের গভীর বন্ধু, দুটি ছোট ছোট ইজিচেয়ারে মুখোমুখি বসে তাদের উদ্ভাবিত কোনও বিচিত্র ভাষায় গভীর আলাপে মগ্ন। প্রশ্ন করে জানা গেল তাদের একজন হয়েছেন ডেভিডকাকা, অন্যজন শিবকাকা— এবং আমাদের অনুকরণে তাদের স্বকপোলকল্পিত ইংরেজিতে তারাও অজ্ঞেয় কোনও গুরুতর বিষয়ে কথোপকথনে ব্যাপৃত। একবার এলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড শিল্‌স্— এসেছেন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় এবং জীবনযাত্রায় ঐতিহ্যের স্থান কতখানি গভীর সে-সম্পর্কে সরেজমিনে তদারক করতে। সেবার গুরেভিচ এবং মানহাইমের যুক্তি নিয়ে আমাদের আলোচনা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় সেই আলোচনাসভায় গীতার বাহুবন্ধন থেকে পালিয়ে উলঙ্গ দেহে তেল চকচকে নৃত্যপরায়ণ চন্দনের প্রবেশ। র‍্যাডিক্যালের ঘরেও ঐতিহ্য যে কত প্রবল শিল্‌স্ তার হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন এবং এই জলজ্যান্ত দৃশ্যটি তাঁর সিদ্ধান্তে হয়তো কিছু প্রভাবও ফেলতে পারে।

তবে ভিনদেশি আগন্তুকদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন স্বামী অগেহানন্দ ভারতী। সাড়ে ছ'ফুট দৈর্ঘ্য এবং তারই অনুপাতে প্রসার। যতদূর মনে পড়ে জন্মসূত্রে তাঁর নাম লিওপোল্ড ফিশার। এদেশে এসে প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনে পরে শঙ্করাচার্যের সংগঠনে যোগ দিয়ে তাঁর নতুন নাম হয় অগেহানন্দ। তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। গীতা আট-ন'জনের হিসাব করে নানাবিধ খাদ্য যত্ন করে রেঁধেছিলেন। অগেহানন্দ এসেই ঘোষণা করলেন তিনি প্রথমে আহার করবেন, পরে ভুক্তা বিশিষ্ট যা থাকবে অন্য অতিথিরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু প্রায় আড়াই সের ছাগমাংস, গুটি আটেক বড় মাপের গলদা চিংড়ি, তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘি ভাত, গাঙ্গুরামের দই, সন্দেশ কিছুই পড়ে রইল না। আহারের পর গীতাকে নির্দেশ দিলেন একটি কম্বল পেতে দিতে, ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর তিনি তত্ত্বালোচনায় রাজি আছেন। তত্ত্ব মাথায় উঠল, সকলের জন্য চিঁড়ে দই, মিষ্টি নতুন করে নিয়ে আসতে হল। অতিথিরা কোনওরকমে আহারের পর বিদায় নিলেন। অগেহানন্দের বিরাট পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটল না। হয়তো প্রবৃত্তিও ছিল না। অথচ মানুষটি সত্যিই বহুবিদ্য এবং বহুভাষী ছিলেন। তাঁর নামে কিংবদন্তির অন্ত ছিল না।

ভিন্ন প্রকৃতির আগন্তুক ছিলেন সেকালের কলকাতায় সকলের পরিচিত বেলজিয়ান জেসুইট পাদ্রি পিয়ের ফাঁলো, কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে তাঁর 'শান্তিভুবন' থেকে সাইকেলে প্যাডেল করে আসতেন সুদূর উত্তর কলকাতায় এই কট্টর নাস্তিকের গৃহে। ধর্মালোচনা সযত্নে বাদ দিয়ে সাহিত্য এবং কিছুটা দর্শন নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিচার বিবেচনা হত। তাঁর সঙ্গে আমার একটি দীর্ঘ বিতর্ক বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় দু-তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ আগ্রহ এবং চেষ্টা সত্ত্বেও যাদবপুরে তাঁর তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দেবার সৌভাগ্য যে আমার শেষপর্যন্ত হয়নি শুনেছি তার অন্যতম মুখ্য কারণ এই মিতভাষী জেসুইট পাদ্রিটির প্রবল বিরোধিতা।

যাই হোক, গোড়াতেই বলেছি পাইকপাড়ায় আড্ডার সবচাইতে নিয়মিত এবং আগ্রহী আড্ডাবাজরা ছিলেন মুখ্যত উদীয়মান কবিসাহিত্যিক, এবং ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। আমরা ঠিক করলাম একটা আদর্শ সাহিত্য পত্রিকা বার করা দরকার, যা কোনও বিশেষ ব্যক্তি, বা মতের বা দলের মুখপত্র হবে না। যেখানে রচনার উৎকর্ষ এবং বিষয় ও স্টাইলের অভিনবত্বই হবে রচনা নির্বাচনের নির্ণায়ক। পত্রিকার নাম হল 'উত্তরসূরী'। আমার প্রখ্যাত র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি, নাস্তিকতা এবং পশ্চিমঘেঁষা সাহিত্যরুচি যাতে নতুন পত্রিকাকে গোড়া থেকেই না চিহ্নিত করে সম্ভবত সে দিকটি বিবেচনা করেই আমার সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে জুড়ে দেওয়া হল আমাদের প্রতিবেশী নারায়ণ চৌধুরীর নাম। নারায়ণ চৌধুরী সে সময় রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যপ্রেমিক প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ এবং সদাশয় এই মানুষটি তাঁর মস্ত সংসার চালাবার প্রয়োজনে বিবিধভাবে রুজিরোজগারের ধান্দায় প্রায় সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন। আমাদের আড্ডায় আসতেন বটে, কিন্তু সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও আমাদের বেপরোয়া এবং বেহিসেবি মেজাজের সঙ্গে তাঁর খাপ খেত না। তাছাড়া নানাধরনের ফরমাসী লেখায় এবং কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় তাঁর হাতে অপচয় করার মতো সময়ও বিশেষ একটা ছিল না। রবিবার এবং ছুটির দিনগুলিতেও তিনি ব্যস্ত। মোদ্দা কথা উত্তরসূরী-র সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি সম্পাদনার ব্যাপারে বস্তুতপক্ষে কখনও কোনও অংশই নেননি।

উত্তরসূরী-র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯৫২ সালের মে মাসে। দু'মাসে একবার করে বার হবে এরকম পরিকল্পনা ছিল। আমার সংগ্রহে উত্তরসূরী-র তৎকালীন সংখ্যাগুলির একটিও নেই। স্মৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করে লিখছি। পাইকপাড়ার সাহিত্যিকরা তো লিখতেন বটেই, তাছাড়া যে-সব বিখ্যাত পূর্বসূরীদের

সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার কমবেশি চেনাজানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁরাও আমার অনুরোধপত্র পেয়ে লেখা পাঠান। প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর এবং বুদ্ধদেব বসু, কবিতায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সম্ভবত সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তারাশঙ্কর আমাদের আড্ডায় আসতেন, আমাকে কিঞ্চিৎ স্নেহও করতেন। একদিন রাত দশটার সময় এলেন বাগবাজারে গঙ্গার ইলিশ কেনায় তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য, সেই ইলিশ বাড়িতে মাঝরাতে আনার ফলে আমার মা-র এবং গীতার হিমশিম অবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে যে লেখার প্রসঙ্গ তুলিনি তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন, তুমি তো শুনি ইংরেজিতে এলেমদার লেখক (সে সময়ে আমি দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুখ্যত ইংরেজিতেই লিখতাম), তা আমার কিছু বই ইংরেজিতে তর্জমা করলেও তো পাবো, আর আমার সাহিত্যকর্ম নিয়ে ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে কিছু লেখো। তোমরা চেষ্টাচরিত্র করলে আমি কি আর নোবেল প্রাইজ পেতে পারি না! নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা সম্ভবত তাঁর ছিল, কিন্তু আমি তাঁর অনুরোধ রাখতে পারিনি। দ্বিতীয় কারণ, তিনি আড্ডায় জমিয়ে বসতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যতম স্নেহভাজন প্রকাশকটিকে রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য টাকার জন্য তাগাদা দিতেও ভুলতেন না। তারাশঙ্করের স্ত্রী-ও মাঝে মাঝে তাগাদা দিতে আসতেন। আমার ধারণা হয়েছিল, অন্য সব লেখক বিনা পারিশ্রমিকে লিখলেও তারাশঙ্কর লিখবেন না। পয়সাকড়ির ব্যাপারে তাঁকে মনে হয়েছিল বেশ হিসেবি।

তা স্থির হল, প্রতি মাসে এক একজন সদস্যের বাড়িতে আড্ডার বৈঠক বসবে, আর সেখানে পত্রিকার জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পাঠ, আলোচনা এবং প্রাথমিক নির্বাচন হবে। আর তার সঙ্গে ইতরজনের জন্য কিছুটা মিষ্টান্নের ব্যবস্থা থাকবে। এবং সে যুগে আমরা সকলেই ছিলাম ইতরজন। প্রথম অধিবেশনে মুড়ি, জিলিপি দিয়ে শুরু, দ্বিতীয়বারের অধিবেশনে এল সিঙাড়া এবং রসগোল্লা, তৃতীয়বারে কমলাভোগ এবং পেস্তাবাদাম দেওয়া পায়েস। ক্রমে দেখা গেল আতিথেয়তার ব্যাপারে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, এতে অবশ্যই গৃহিণীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। চাঁদা যা ওঠে পত্রিকার ব্যয় মেটাবার পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রতুল। এদিকে আতিথ্যের পেছনে ব্যক্তিগত ব্যয় বেড়েই চলেছে। উত্তরসূরির চেহারা খুবই অভিজাত, উৎকৃষ্ট কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, রচনা, সেই হিসাবে গ্রাহক পাঠক সীমাবদ্ধ এবং বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে। তবু যে পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল তার প্রধান কারণ আমাদের আর্থিক লোকসানের অনেকটা

দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিমল করের সূত্রে পাওয়া এক উদারহৃদয় সাহিত্য প্রকাশক, আমরা তাঁকে টি কে. নামেই জানতাম। সম্ভবত উপাধি ছিল ব্যানার্জি। কিন্তু একসময় টি . কে-র লক্ষ্মীর ঝাঁপিতেও টান ধরল। মনে হয় ছ'সংখ্যা বেরোবার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছুকাল পরে অধ্যবসায়ী এবং নিষ্ঠাবান কবিবন্ধু অরুণ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় উত্তরসূরী আবার প্রকাশিত হয়, এবং কয়েক বছর নিয়মিত চলে। অরুণই উদ্যোগ করে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কথারা তোমার মন' প্রকাশ করেন।

কাগজ উঠে গেলেও আড্ডার খামতি ঘটেনি। বছরে সবচাইতে আমাদের বড় উৎসব ছিল দোলের দিন। আমাদের মতো উত্তরতিরিশ সাহিত্যিকরা যদি ফাগ ওড়াতে ওড়াতে এবং গান গাইতে গাইতে পথে বেরোই তাহলে পাইকপাড়ার ভদ্রলোকেরা সেটাকে কীভাবে নেবেন তা নিয়ে গোড়ায় কিছুটা সংশয় ছিল। পড়শিদের সহনশক্তি এবং কৌতুকবোধের একটা আন্দাজ পাবার জন্য ঠিক হল, দুঃসাহসী গৌরকিশোরকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করা যাক। বাসা বদলের সময় বড় বড় পাটের বস্তায় আমার কিছু বই কাগজপত্র এসেছিল। তাদের মধ্যে প্রমাণসই একটি ছালার দুটি কোণ এবং মাথার দিকটি গোল করে কেটে তৈরি হল হাতাহীন অভূতপূর্ব একটি লম্বা কুর্তা। গৌর সানন্দে সেটি পরিধান করবার পর এক ডজন সজনের ডাঁটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁর মাথায় চড়ানো হল যিশুর কাঁটাওয়ালা মুকুটের অনুকরণে। গৌরকে অবশ্য রুয়োর আঁকা বিষাদক্লিষ্ট যিশুর মতো দেখায়নি। সেই বিচিত্র বেশ পরিধান করে গৌরকিশোর পুরো পাইকপাড়া নৃত্যসহকারে পরিক্রমা করে এলেন। ঘরে ঘরে বাতায়ন উদঘাটিত করে কৌতূহলী গৃহবাসিনীরা এই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখলেন, পথে ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কেউ গায়ে পানের পিক ফেলেনি, ধুলো ছোড়েনি। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নামা গেল দোলের উৎসবে। সুরূপা এবং গীতা হয়তো প্রকাশ্যেই যোগ দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু পাইকপাড়া ঐতিহ্য ক্রান্ত উত্তর কলকাতারই প্রসারমাত্র, তখন নারীমুক্তির অস্ফুট বাণীও এদিকে উচ্চারিত হয়নি। আমরাও সকলে কিছু বীরপুঙ্গব ছিলাম না, মোদ্দা ব্যাপারটা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। গৌর আর আমি পকেটভর্তি ফাগ নিয়ে হাজিরা দিলাম গৌরীশঙ্করের বাড়িতে; সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন রুমালে আবির নিয়ে লুঙ্গি পরনে দক্ষিণাদা. রং ছড়াতে ছড়াতে মাখাতে-মাখাতে আমরা পথে তুলে নিলাম নরেন আর ধীরেন মিত্র দুই ভাইকে, তারপর টিনের কেল্লা থেকে শীতাংশু, সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে

বিমল এবং পরিশেষে ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী এবং দেবব্রত সুরচৌধুরীকে। প্রত্যেক বাড়িতেই আমরা গৃহিণীদের কপালে কপোলে এবং কেশে রং মাখিয়েছি— তাঁরা সাগ্রহে মুখ মাথা এগিয়ে দিয়েছেন— একমাত্র নীরেনের স্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিয়েছিলেন দোরগোড়ায় ফোঁটা দিয়ে বিদায় নিতে— এই ধরনের বয়স্ক লোকেদের বেয়াড়া ফুর্তিতে তাঁর শিক্ষিত রুচি সায় দেয়নি। তরুণ কবি দেবদাস পাঠক, স্বল্পবাক অহিভূষণ, প্রাজ্ঞ রাজ্যেশ্বর, হিসেবি কবি অরুণ ভট্টাচার্য এবং বেহিসেবি সুররেয়ালিস্ত সন্তোষ গাঙ্গুলিও সম্ভবত আমাদের বাৎসরিক আনন্দযাত্রায় যোগ দিতেন। এমনকী বিনিশ্চিতবুদ্ধি আত্মবেদী অম্লান দত্ত— সে সময়ে তিনিও পাইকপাড়া নিবাসী এবং আমাদের বিশেষ বন্ধু— সেই আনন্দমিছিলে কখনও সখনও অংশভাক্ ছিলেন বলেই আমার মনে পড়ে।

তবে উৎসব সত্যিই জমে ওঠে যখন টালাপার্কের পাশের ফ্ল্যাট থেকে মৃদঙ্গ বা খোল নিয়ে বেরিয়ে আসতেন সে যুগের প্রখ্যাত অঙ্কনশিল্পী অন্নদা মুন্সি। তাঁর কথা এখন অনেকেই ভুলেছে, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের এককালীন গুরু অন্নদা মুন্সির ছিল বহুমুখী প্রতিভা। ছবি আঁকতেন, বাজনা বাজাতেন, দিশি-বিলিতি সুর নিয়ে পরীক্ষা করতেন, উদ্ভট নানা স্বপ্ন দেখতেন, এবং পরবর্তীকালে আমি যখন মেলবোর্নে তিনি নিয়মিতভাবে স্বহস্তে চিত্রিত একটির পর একটি কার্ড পাঠাতেন, আর তাতে ঘোষণা থাকত তাঁর পুত্র কখনও মুসা, কখনও জরথুস্ত্র, কখনও মোতসার্ট, কখনও বেঠোভেন প্রভৃতি বিভিন্ন অবতারে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্নদার বাজনার সঙ্গে আমাদের পা-গুলিও চঞ্চল হয়ে উঠত। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা প্রথমে সজনীকান্ত দাস এবং সর্বশেষে তারাশঙ্করের বাড়ি চড়াও হতাম। তাঁরাও বেরিয়ে এসে যোগ দিতেন এবং পাইকপাড়ার মানুষ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য মিছিল দেখত।

তবে অন্নদা মুন্সির কিছু কিছু বিটলেপনাও ছিল। তিনি প্রায়ই পিছন থেকে সজনীকান্তের কাছাটি টেনে খুলে দিয়ে 'হায় সজনী, দিন রজনী' বলে গান ধরতেন। আর একদা শনিবারের চিঠির সেই কুখ্যাত সম্পাদক, পরে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট কর্মকর্তা সজনীকান্ত দাস 'আহা অন্নদা কি হচ্ছে' বলে কাছা সামলাতেন। দুই বয়স্ক ব্যক্তির কাণ্ডকারখানা দেখে ভাবা কঠিন ছিল আপন আপন ক্ষেত্রে দুজনেই মাতব্বর পুরুষ। সজনীকান্ত প্রসঙ্গে মনে পড়ল শেষদিকে তিনি যখন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, গৌরীশঙ্কর এক সন্ধ্যায় আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। বিরাট তাঁর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ অযত্নে বিক্ষিপ্ত। সজনীকান্ত হঠাৎ আমার হাতদুটি চেপে

ধরে বললেন, শুনেছি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আপনার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক আছে। যৌবনে শনিবারের চিঠিতে তাঁকে এবং আরও অনেককে বিস্তর আঘাত করেছি। অনেকেই আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে। আপনি কি তাঁকে দেখা হলে বলবেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। পরে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ যথাস্থানে পৌঁছে দিই।

দোলের প্রথম পর্ব শেষ হত বেলা দেড়টা/দুটো নাগাদ। আমরা কেউ কেউ টালাপার্কের মস্ত তড়াগে ঝাঁপাই ঝোড়ন করে লাল চোখ নিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরতাম। গৃহিণীরা ভাত বাড়তে বাড়তে ঘটনাবলির বিবরণ সকৌতুকে শুনতেন। কিন্তু দোলের উৎসব এখানেই শেষ হত না। রাতে গানের আসর বসত, কখনও তারাশঙ্করের প্রাসাদে, অধিকাংশ সময়েই গৌরীশঙ্করের বাড়ির ছাদে। আসর শেষে প্রচুর ভোজের ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের আর্থিক অবস্থার অবশ্যই ফারাক ছিল— কিন্তু আড্ডার পিছনে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারে কারও ক্ষেত্রেই কখনও কার্পণ্য দেখিনি।

তবে সব কিছুরই শেষ আছে। মাঝে বছরখানেক বাইরে ছিলাম, কিন্তু আড্ডা যথারীতি সচল ছিল। এরপর এক একে ছাড়াছাড়ি শুরু হল। বিচিত্র পদ্ধতিতে শীলা এবং গৌরের মিলন ঘটল (সে আরেক ঐতিহাসিক কাহিনি)। এবং তাদের স্বভাবত আলাদা বাসস্থানের প্রয়োজন হল। অন্যরাও এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে গেলেন, কেউ চাকরির চাপে, কেউ সুবিধেমতো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। আমার পিতার মৃত্যুর পরে আমিও শেষ পর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করলাম— প্রথমে মুম্বই, পরে অনেক দূরে পাড়ি মেলবোর্নে। পাইকপাড়ায় থাকার মধ্যে রয়ে গেলেন গৌরীশঙ্কর আর নরেন্দ্র মিত্র। গৌরীর বইয়ের ব্যবসায় ভাঙন ধরেছে; এবং নরেন্দ্রবাবু তাঁর লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত। পাইকপাড়ার আড্ডা ক্রমে হয়ে গেল ইতিহাসের বিষয়, শুধু কিছু আনন্দস্মৃতি রয়ে গেল যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের মনে। তারই একটা খসড়া বিবরণ ধরা রইল এই কয়েকটি পাতায়।



আড্ডামেলা হোক

মৃণাল সেন

আমি আড্ডাকে মোটামুটি একটা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ফেলছি। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গল্পপোষ্য জীব। মানুষ আড্ডাবাজ জীবও বটে। পাড়ার রকে বসে আড্ডা থেকে শুরু করে চায়ের দোকানে, কফিহাউসে এবং বৈঠকখানায় নিয়মিত আড্ডা, মজলিশ ব্যাপারটা তো ঘটেই যাচ্ছে। আড্ডার রং ঢং আলাদা নিশ্চয়। আদপে আড্ডাই সেসব। ব্যাপারটা এতই সনাতন যে আমি ভাবি আড্ডা নিয়ে মেলা হয় না কেন? এতকিছুর মেলা হয় আমাদের পশ্চিমবাংলা বা দুই বাংলাতেই, হয়তো ভারতবর্ষের সমস্ত পরিমণ্ডলেই হয়, কিন্তু আমি ভাবি আমাদের দেশে, এই রাজ্যে এত মেলা, সেখানে কেন আড্ডার মেলা হবে না। এই নিয়েই কথা বলা যাক না কেন।

আমি কতকগুলো পয়েন্ট ভাবছিলাম। যেমন এটা একটা নেশার মতো হয়ে যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভয়ঙ্কর আড্ডাবাজ লোক। আড্ডা দিতে দিতে নিজেকে ভেঙেছি। আবার নির্মাণও করেছি। আড্ডার ভিতর দিয়ে আবার নিজেকে মেরামতও

করে নিয়েছি। আড্ডাতে যেমন পরনিন্দাও হয়, তেমনই আড্ডাতে ক্রিয়েটিভ আলোচনাও হয়। কাজেই আড্ডাকে ভাঙাগড়ার কাজে প্রয়োগ করা হয় এবং সেটা হয়তো নিজের অজান্তেই করে যাচ্ছি। আবেগেই আমরা এসব করে যাই। এটা দলবদ্ধভাবে করি আবার একান্তেও করি। এই আড্ডা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে পারতাম এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা ধরে, বা বেশ কয়েক দিন ধরে তাহলে বেশ হত।

এখন আড্ডার মেলাটা কী ধরনের হবে, কেমন করে হবে? যেমন, ছবির মেলা হয়, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, থিয়েটারের মেলা হয়, কবিতার মেলা হয়, বইয়ের মেলা হয়, সে রকম ভাবে আড্ডার মেলা হবে না কেন? এ ধরনের মেলা যে হয়নি তা নয়। কেঁদুলির মেলার কথাই ধরা যাক। কেঁদুলির মেলা তো এখন কবিয়ালদের মেলা। তারা কবিতার কথা বলছে, ছড়ার কথা বলছে। সাত দিন ধরে, পনেরো দিন ধরে হয়তো। সেখানে আড্ডায় যারা যায় তাদের যে কবিয়াল হতে হবে, কবি হতে হবে তেমন তো কথা নেই। সে সেখানে তার মত করে উপভোগ করতে পারে, ছন্দের ভিতর ছন্দপতন ঘটিয়ে দিতে পারে— এটাও আড্ডার অংশ। যাইহোক, মেলাটা যে কীভাবে হবে সেটা বেশ কয়েকজন বসে মাথা খাটিয়ে সাত দিনের একটা আড্ডার ব্যবস্থা করা যায়। তবে বলা যায় না গোটা ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আড্ডার কথায় বলা যায়, যিশুখ্রিস্টের জন্মের চারশো পাঁচশো বছর আগে প্লেটো যেটা করতেন— অ্যাকাডেমিক, সিনকোজিম, তারপর ব্যাংকেটিং, সে-ও তো আড্ডার মতো করেই হত। প্লেটোর বিখ্যাত সেই ডায়লগ। তার মধ্যে কেউ প্রশ্ন করছে, কেউ জবাব দিচ্ছে— দার্শনিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সেটা। এই ধরনের হবে না কেন? তেমন যে হবে না এটা জোর করে বলা যায় না। তেমন তো ঘটেছে তাঁদের সময়ে। একটা আড্ডায়, সেইসময় প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা তার আগে সাইক্লিসিস যুগে যা হয়েছে তেমন যে এখনও হতে পারে না তা তো নয়। আড্ডাটাকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখলেই সেটা হতে পারে। আড্ডার মধ্যেও একটা মেথড থাকে। মেথড ইন ম্যাডনেস। সেরকমভাবে নিয়ন্ত্রণ নয়, এটুকু যাবে এটুকু যাবে না, তা নয়, নিজেরাই নিজেদের সেই নিয়ন্ত্রণ করবে। যেমন ব্যক্তি হিসাবে আমি নিয়ন্ত্রণ করছি আড্ডাটাকে। কিভাবে কি করব না করব এভাবে। সে রকম ভাবে যদি হয়, তাহলে কীরকম হয়? এসব কথাই ভাবছি।

একটা সময় ছিল যখন আমরা ভয়ঙ্কর আড্ডা মারতাম। এমনও হয়েছে, সারাদিন আমরা গল্প করে চলেছি। আমার এক বন্ধু, এখন রিটায়ার করেছেন, বাড়িতেই থাকেন, মানে খুব বেশি বের হন না--- একদিন বললেন,'মৃণাল তোমার মনে আছে রাত্তির দিন রাত্তির করে পরের দিন সকালে আড্ডা মেরে আমরা যে যার বাড়ি গেলাম। কতরকমের যে কথা আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল' কথা, কথা, আর কথা, নানারকম, তার সঙ্গে হই হুল্লোড়। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে চলে গেছি আড্ডা দিতে দিতে। সেখান থেকে আর এক জায়গায়।

একটা চায়ের দোকান ছিল, প্যারাডাইস কাফে, সেটা ছিল, হাজরা রোডে, এখন আর নেই। আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব— তখন কিন্তু আমরা ছবির বাইরের লোক— আমরা ছবি করতে চাইছি, সেই প্যারাডাইসে বসতাম। আমরা কফিহাউস অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না, তাই প্যারাডাইসে আমরা বসতাম। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আট-দশ ঘন্টা সেখানে কাটাতাম। ভাবা যায় না এখন। তাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এখন অনেকেই ভারতবিখ্যাত হয়েছেন।

একটা টান ছিল সেই আড্ডার। কেন, কীসের টানে যে যেতাম! আমরা ছবি করব, অথচ ছবিতে ঢোকার মতো পরিবেশও পাচ্ছি না। জায়গাও পাচ্ছি না যে যেতে পারব। কিন্তু এই থেকেই আমরা আরম্ভ করলাম। নানাভাবে, নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম আড্ডা থেকেই। সেই দোকানদারটি আমাদের উঠে যেতে বলতেন না। আমরা খুব যে চা খেতাম তাও নয়। তিনি বোধহয় খুব রেস খেলতেন, কারণ সবসময় তাঁর হাতে রেসের বই দেখতাম। আমাদের সব কথা শুনতেন। হয়তো এক কাপ চা চারজনে ভাগ করে খেতাম। পাশেই বিড়ির দোকান, সেখান থেকে আমি আর তাপস কিংস্টার সিগারেট কিনে খেতাম। দু'পয়সার মতো দাম ছিল দশটা সিগারেটের। একদিন তাপসের সঙ্গে ফোনে সেসব কথা নতুন করে আলোচনা করছিলাম। সেসময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতাম— হরলিকস-এর বিজ্ঞাপন, 'প্রত্যুষের দুর্বলতা'। আমি বললাম, "তাপস, সকালে কি তোর দুর্বলতা হয়?" ও বলেছিল, "হ্যাঁ হয়, কাশি আর দুর্বলতা।" আমি বললাম, "আমারও হয়।" আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, সে বলল, "ওই অত খারাপ সিগারেট খেয়ে।" কী করব? আমরা দামি সিগারেট খেতেও পারতাম না। আবার ঋত্বিকের মত বিড়িও খেতে পারতাম না। ও বিড়ি খেত। তখন দশ পয়সায় পঁচিশ বান্ডিল বিড়ি। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই দোকানে ঋত্বিকের ধার হয়েছিল আশি টাকা! এর থেকেই ওর চরিত্রের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই সবই হতো;

সেইসময় 'ম্যাসেস অ্যান্ড মেনস্ট্রিম' বলে কমিউনিস্ট পার্টির একটা কাগজ ছিল। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কাগজটা কোয়ার্টার্লি। দু'চারজন রাখতেন। সেই কাগজটা আমরা পেয়ে গেলাম। তার ভিতরে দেখলাম পাবলো নেরুদার একটা কবিতা। ইংরাজি অনুবাদ প্রায় চোদ্দো পাতার। সেটা নিয়ে গেলাম আমাদের আড্ডাখানায়। বললাম,'শোন সবাই।' সেই চোদ্দো পাতা কবিতার নাম 'ফিউরিটি'। শেষে লিখছেন,'সং হোয়ার ইন আমেরিকাজ'। যেহেতু পাবলো নেরুদা একটি দেশের অ্যামবাসাডর ছিলেন, তাই নানা দেশে ঘুরেছেন। পরে সব ছেড়ে দিয়ে এইসব শুরু করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হল তাঁর। পরে পুলিশ তাঁকে তাড়া করেছে, তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আড্ডার চেহারাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই বলছি। কবিতাটা পড়া হল, যেটা নিয়ে আলোচনা হল। কে অনুবাদ করবে কবিতাটা। তখন আমাদের একটা ব্যাপার ছিল, কোকাকোলা বাজারে এসেছে, কিন্তু আমরা কেউ ওই পানীয়টা খেতাম না। প্রথমত, অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না। তাছাড়া ভাবতাম ওটার মধ্যে আমেরিকান কোনও বিষ আছে। খেলেই আমেরিকানাইজড্ হয়ে যাব ভাবতাম আমরা। তাই খেতাম না। তা সেই কবিতাটা চেঁচিয়ে যখন পড়ছি, একটা জায়গায় লেখা দুপুরবেলাটা ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে, কোথায় যাই, তেষ্টাও পেয়েছে। একটা কফির দোকানে ঢুকে গেলাম। এক বোতল কোকাকোলা কিনে খেলাম। আমরা লাফিয়ে উঠলাম। পাবলো নেরুদা কোকাকোলা খেয়েছেন! আমরা লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। এইসব ছেলেমানুষিও করেছি।

এই চায়ের দোকানে বসেই তখন আমরা ছবি নিয়ে লেখাপড়া করছি, কাগজে লিখছি ছবি নিয়ে, কিন্তু স্টুডিওতে ঢুকতে পারছি না। ভাবছি আমাদের কিছুই হবে না। তখন ঠিক করলাম আমরা ট্রেডইউনিয়নিজম করব। ট্রেডইউনিয়নিজম করার নাম করে ভিতরে যাব, আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছবি করা। এইভাবে স্টুডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারপর ঠিক হল আমরা এবার ছবি করব। কী করে করা যায়? শুনেছি কাকদ্বীপে তখন মুক্তাঞ্চল। সেখানে গিয়ে ছবি করা যেতে পারে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল স্ক্রিপ্ট লেখার। আমরা তার আগে কেউ কিছু করিনি কিন্তু। ডিরেক্ট করার দায়িত্ব ঋত্বিকের। মিউজিক তো হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বাজবে। সেটা সলিল চৌধুরী করবে। স্ক্রিপ্ট লিখেও ফেললাম, নাম 'জমির লড়াই'। সব কিন্তু ওই চায়ের দোকানে বসে যাবতীয় ভাবনাচিন্তা করা। ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম আড্ডা মারতে পারত। কারণ ও চাকবি করত।

আমাদের চেয়ে বেশি রোজগার করত বলে ও আমাদের চোখে ছোট হয়ে থাকত। ও পয়সা রোজগার করে, আমরা কোনও রোজগার করি না। ঋষি ছিল অ্যাসিস্টান্ট এডিটর, মাইনে আট টাকা। আমাদের পয়সাকড়ি দিত সেখান থেকে। দু'চার টাকা যা দরকার হত পেতাম। সবই আড্ডায় হত। ঋষি একটা ক্যামেরা জোগাড় করল। কোথায় প্রসেস করব? এক ভদ্রলোকের নিজস্ব ল্যাবরেটরি ছিল, সেখানে করব। ওখানে যাওয়ার ব্যাপারটাও কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর সেখানে পৌঁছনো গেল না। এইজন্য যে, যখন সব ঠিকঠাক, তখন কলকাতায় সে বছর, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস হচ্ছিল। দু'জন এসেছেন বাইরে থেকে। দুজনেই বিখ্যাত ব্যক্তি। একজন জোলিও কিওরি, অন্যজন বার্নাল। প্রথমজন ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয়জন ব্রিটিশ। দু'জনেই কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার। তাঁদের অন্যান্য কাজ তো ছিলই, আর একটা কাজ ছিল, জরুরি একটা দলিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেই দলিলে লেখা আছে— ইন্টারন্যাশন্যাল ক্যামেন্টাস বা তেমন কোনও নাম— এইরকম, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির যে আন্দোলন চলছে, সেটা ভুল। এটা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে, পথটা ঠিক নয়। ইন্টারন্যাশন্যাল কমিউনিস্ট পার্টি যখন বলেছে তখন এটা আমাদের আর করা যাবে না। ওই আড্ডাখানায় বসে আমরা খবরটা পেলাম, এবং সিদ্ধান্ত নিলাম।

সেই স্ক্রিপ্টটা আমার কাছে ছিল। তখন রাতে একটা করে সিগারেট খেয়ে বাড়িতে ফিরতাম। পার্কসার্কাসে যে দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতাম, এক রাতে সেই দোকানদার বলল, বাবু সাবধানে থাকবেন। আপনার ওখানে পুলিশ আসবে কিছু কাগজপত্রের সন্ধানে। আসলে ও পুলিশের ইনফর্মার, কিন্তু আমাদের কানে দিল। তখনই সেটা আমি পুড়িয়ে ফেললাম। সত্যিই সে রাতে পুলিশ এসেছিল। জীবনের প্রথম স্ক্রিপ্ট পুড়িয়ে ফেললাম। সেটা নিয়ে পরদিন আড্ডাখানায় বসে আলোচনা করলাম। এইরকম নানা কাণ্ড হত। আড্ডাও হচ্ছে, গানও হচ্ছে, গল্পও হচ্ছে। সলিল একটা কবিতার চার লাইন লিখেছে, ওখানেই টেবিল বাজিয়ে গানটার সুর করা হল। এভাবেই আমাদের অবিরত আড্ডা চলেছে। তার মানে, আড্ডায় সিরিয়াস ব্যাপারও চলত, নানারকম আলোচনাও হত— সবই হত আর কী।

আমাদের বাড়িতেও আড্ডা হত। পার্কসার্কাসে একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম। বাবা তখন দেশভাগের পর চলে এসেছেন। দেশ ভাগ হল '৪৭-এ,

বাবা-মা ছিলেন '৪৮ পর্যন্ত। বাবা উকিল ছিলেন, মাঝেমাঝে কোর্টে যেতেন। সে বাড়িতে একটা ঘরে বসে সাত-আটজন আড্ডা মারতাম। হত কী, বাবা হয়তো কখনও দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন, আমার সিগারেট খাচ্ছি। কেউ মুখ বন্ধ করে রেখেছি, কেউ হাত পিছনে। মাকে বললাম, মা বাবাকে একটু বলোতো হঠাৎ করে এ ঘরে যেন না আসেন। বাবা মাকে বলেছিলেন ওদের জব্দ করার জন্যই তো আমি যাই। বাবা আমাদের দেখেশুনে, গল্পগুজব করে বলেছিলেন, তোমরা সব দেবদূত, আমার যদি অনেক পয়সা থাকত তাহলে তোমাদের কাজ করতে দিতাম না। পয়সার খোঁজে তোমাদের বেরোতে দিতাম না, যা খুশি করতে। আগেকার দিনে পারিষদের মত। রাজাদের আমলে পারিষদদের নিয়ে-ও তো আড্ডাই হত। যাইহোক, আমাদের নানারকম আলোচনা হত। সবই তো নিয়ম মেনে নিয়ন্ত্রণে হত না, নিয়ন্ত্রণ ডিঙিয়ে আর একটা নিয়ন্ত্রণ তৈরি হত। সেইজন্য প্লেটোর কথা বলেছিলাম। সব আড্ডার ঢঙেই হত।

তাছাড়া মজলিশি ঢঙে যে আড্ডা মারা কিংবা বিভিন্ন জায়গায় নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে যে ধরনের আড্ডা হত, সে সব তো অসাধারণ আড্ডা। তাই মনে হয়, এটা এত সনাতনী ব্যাপার, অথচ এটা নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না।

সেন্ট্রাল কফিহাউসে লর্ডসে শেষের দিকে যখন ছবিটবি করছি তখন যেতাম। সেখানেও একটা সময়মতো সব গিয়ে জড়ো হত। সামান্যতম কেরানি থেকে শুরু করে অতি বিখ্যাত লোকও যেত। জঁ বেনোয়াকেও নিয়ে গেছি। এইধরনের প্রচুর আড্ডাখানা আছে। মানিকবাবু ওই সেন্ট্রাল কফিহাউসের আড্ডায় খুব যেতেন। যখন চাকরি করতেন, তখন রবিবারে আসতেন। ওখানে কেউ কবিতা পড়ছে, কেউ গান লিখছে, কেউ সুর করছে, কেউ মেয়েমানুষের গল্প করছে, কেউ গল্প করছে কার বউ কার সঙ্গে পালিয়ে গেছে---সব রকমই হত। আমিও যখন লর্ডসে বসতাম সেই সময়ও একই জিনিস দেখতাম। আবার ব্যবসার কাজও হচ্ছে। আড্ডার যে কত রং কত ঢং! রকের আড্ডা থেকে শুরু করে জুয়ার আড্ডা, তেলেভাজার আড্ডা, কত কী!

আমি একসঙ্গে থাকায় বিশ্বাস করি। একসঙ্গে থাকার যেন একটা মজা আছে, সেটা বাইরে শুটিং করতে গেলে টের পাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে দৌড়ঝাঁপ করে চানটান করে সব সেরে এসে বসলাম আড্ডা মারতে। কেউ কারোর ঘরে চলে যায় না, আড্ডাই মারে। সেদিন কি হল না-হল ছাড়াও অন্য নানা কথা আলোচনা হত। তার মধ্যে প্রেমালাপও হত। বাইরে শুটিং করতে গিয়ে আমি

দেখেছি, ছবি করতে করতে ফাইনাল স্ক্রিপ্ট হয়তো আমার এডিটিং টেবিলে, সেখানে তো অনেক কিছু হয়। এটা হবে না কেন, ওটা কেন বাদ পড়বে, এসবও কেমন কথার ছলে হত। আড্ডার যে কত রকমফের আছে, আর মহত্ত্ব আছে তা বলার নয়।

আড্ডাটা আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে একেবারে মিশে আছে। আমরা সকলেই আড্ডার খামতি পড়লেই বুঝতে পারি অবস্থা কীরকম হয়। আর খাবারও পয়সা থাকে না যখন, মনে হয় এবার কিছু অর্থ জোগাড় করতে হবে, রোজগার করতে হবে, তখনই আড্ডাটা ভাঙতে থাকে। এমনও দেখেছি। কখনও বলে দেওয়া যায় না আড্ডার গতি প্রকৃতি কী হতে পারে না হতে পারে। সকলেরই তো প্রফেশন্যাল এফিসিয়েন্সি দরকার। ছবি আঁকতে গেলে, ছবি করতে গেলে, লিখতে গেলে সবসময় একটা প্রফেশনালিজম অ্যাফেয়ার করতে হয়। আড্ডাটা আর তখন সেভাবে চলে না। নিরবচ্ছিন্ন আড্ডাটা তখন আর হয় না। আমি মনে করি আবার যদি আমাদের সেই আড্ডাটা পাই ফের যোগ দিতে পারি। হয়তো বয়স হয়ে গেছে, তবুও। বাড়িতে খুব আড্ডা মারি। কোথাও গেলে আড্ডা মারি। মেজাজ থাকলেই যে কত রকমের গল্প হয় তার শেষ নেই।

আমি যখন পুণাতে যেতাম, সেখানে কিন্তু আড্ডার মেজাজেই ক্লাস নিতাম। বলা হত যে, আমি ক্লাস নিচ্ছি, কিন্তু আমি ওই ধরনের ক্লাস নেওয়ায় বিশ্বাস পেতাম না। পিছনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে— আমার অসুবিধা হয়। চেয়ারটাকে নামিয়ে নিয়ে ওদের সামনে বসতাম। প্রথমেই যেটা করতাম, সেটা হল, বলতাম, একটা সিগারেট দাও। বা, দেশলাই আছে? অ্যাশট্রের মতো করে গ্লাস নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে কথা চলছে, বললাম, ছবি দেখবে? ছবি দেখছি। আবার কথা বলছি। আমার মনে হয় এতে টু ওয়ে ট্রাফিক তৈরি হয়। আমি মনে করি আমার টলারেন্স, আমার ডিসিপ্লিন আছে, সেগুলোর কথা বলি। ওরা ওদের পয়েন্টগুলো বলে। এভাবেই পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলেও ক্লাস চলে। সকাল থেকেই শুরু হত এভাবে। যখন আমি ওখানে চেয়ারম্যান ছিলাম তখনও আমি কোনও হোটেলে বা গেস্টহাউসে থাকতাম না। আমি ছাত্রদের সঙ্গে ক্যাম্পাসে থাকতাম, খেতাম। বরাবর, যতবার গিয়েছি এটা করেছি। মিনিস্টার একদিন টেলিফোন করে বললেন, তুমি নাকি এরকম করছো? বললাম, আমার তো কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। বেশ ভাল লাগে। ছাত্রদের সঙ্গে ক্যান্টিনে বসে গল্প করা, ঝগড়া মিটমাট করা-— সব কেমন সংসারের মতো।

এতদিন বাদে যে একটা ছবি করলাম, 'আমার ভুবন', সেখানেও শুটিং-এ নন্দিতা দাশ আমাকে বলত, মৃণালদা আপনি আমাদের দলে একেবারে ইয়ংগেস্ট। আমি রাত বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মারতাম। পরদিন আবার ভোরে ওঠা। কোনও অসুবিধা হত না। এই যে আমরা কুড়িজন-পঁচিশজন একটা দলে একমাস-দেড়মাস থাকতাম, তাতে আমাদের সমস্ত জীবনটা ওলটপালট হয়ে যেত। এটাই সারা বছর ধরে হলেও শরীর খারাপ হয় না। কাজের মধ্যে আড্ডার একটা মাদকতা আছে। সেটা একটা থেরাপি। আড্ডা সব সময়ই ওষুধের কাজ করে।

মায়েদের দেখেছি দুপুরবেলা সমস্ত কাজ সেরে পান চিবুতে চিবুতে গল্প করতেন। সমর সেনের একটা কবিতায় আছে, 'রবিবারের পান চিবানো মধ্যবিত্ততা।' এই পান চিবানো মধ্যবিত্ততা আমি আমার মা, পিসিমা, পাশের বাড়ির পিসিমার মধ্যে দেখেছি। একজায়গায় বসে তাঁদের বোধ দিয়ে, তাঁদের চিন্তাভাবনা দিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন হয়তো। তাঁদের সেন্স অফ হিউমার, কথা বলার ধাঁচ, সবকিছুর মধ্যে একটা যুগকে ধরা যেত।

সেইজন্য আমি মনে করি একটা অসম্ভব সুযোগ আছে আড্ডামেলা করার। বুকফেয়ার হচ্ছে, হোয়াই নট আড্ডাফেয়ার? আড্ডা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অন্তত আমি মনে করি আড্ডা মানুষকে বাঁচার ইন্ধন জোগায়।



আড্ডা জীবনভর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের আড্ডা শুরু হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে। আমার মনে আছে একেবারে যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই, তখনই বোধহয় প্রথম কলেজস্ট্রিট কফিহাউসে গিয়েছিলাম। সেখানে যা হয়, আস্তে আস্তে একটা দল গড়ে ওঠে। সেই দলটা হল তরুণদের নিয়ে একটা দল। আবার একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে যারা বসে, যেমন কফিহাউসে সিনেমার লোকদের দু'তিনটে টেবিল ছিল। যারা নতুন থিয়েটার আরম্ভ করেছিল, যেমন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— এদের একটা দল ছিল। আর আমাদের লিটল ম্যাগাজিনের দল। এ-রকম বেশ কিছু টেবিলে লিটল ম্যাগাজিনের দল বসত। আমাদের তখন কৃত্তিবাসের দল। যারা টেবিলে এসে নিত্যনতুন যোগ দিত তারাই সেই আড্ডায় প্রধান হয়ে উঠত। যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটা অন্য দলে ছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা ছাত্রদের দলে ও আড্ডা দিত। তখন ওর দাড়ি ছিল আর বিড়ি খেত, কী করে যেন আমাদের টেবিলে ও আস্তে আস্তে এসে যোগ দিয়ে বসল।

কবিদের দলে জুটে গেল আর কী। শক্তি তার আগে কবিতা লিখত না। সে-রকম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সে-ও আস্তে আস্তে এসে ঢুকে পড়ল। সন্দীপনের ব্যাপারটা বেশ মজার। কারণ সন্দীপন তো কবিতা লিখত না, আর কৃত্তিবাস কবিতার কাগজ, কিন্তু সন্দীপন কৃত্তিবাসের দলে রয়ে গেল।

পরে আমাদের মনে হয়েছিল সন্দীপনের তো লেখা বেরোবে না, কিন্তু আমরা গল্পও ছাপতে পারি না। সেইজন্য আমরা ঠিক করেছিলাম যে, কবিতার কৃত্তিবাস-এর পাশাপাশি একটা গল্পেরও কৃত্তিবাস বেরোবে। একটা কবিতার, আর একটা গল্পের। অভিনব পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হল। একই দিনে দুটো কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস বেরোলেও গল্প ছিল দুটি মাত্র, একটি সন্দীপনের আর একটি কমলকুমার মজুমদারের। ততদিনে আমরা কমলকুমার মজুমদারের খুব ভক্ত হয়ে গেছি। তিনি অবশ্য কফিহাউসে বেশি আসতেন না। তাঁর আড্ডাটা ছিল খালাসিটোলা নামে এক মদের দোকানে। আমরাও তখন অল্পবয়সী বালক, কফি ছেড়ে আস্তে আস্তে কমল মজুমদারের দীক্ষায় বাংলা মদের আসরে ঢুকে পড়লাম। ওই খালাসিটোলাতে কমলবাবুকে ঘিরে একটা বেশ বড় দল গড়ে ওঠে। কমলবাবুর বহু বিষয়ে অধ্যয়ন ছিল। যেমন বাউলদের কথা উঠল, কমলবাবু বহু বাউলের কথা বললেন। যেমন থিয়েটারের কথা হচ্ছে, কমলবাবু গিরীশবাবুর আমল থেকে অনেক গল্প বলতেন। ফরাসি সাহিত্য নিয়ে কথা হলেও তাই। ফরাসি সাহিত্য তিনি খুব ভাল জানতেন। এইরকম যে কোনও বিষয়ে— যেমন ডোকরার কাজ বাংলায় কোথায় কোথায় ভাল হয়, তার শিল্পীদের কথা অনেক জানতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম, আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ত। বিশেষ করে ফরাসি সাহিত্যের অনেক কিছু আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম। এটা অনেকটা সক্রেটিসের আড্ডার সময়কার কথা মনে করিয়ে দেয়। সক্রেটিস একটা বাজারের ধারে দাঁড়িয়ে গল্প করতেন, আর তাঁর চেলারা তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনত। কমলদার বৈশিষ্ট্য ছিল , উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, বসতেন না। খালাসিটোলায় অনেক বেঞ্চি ছিল, কিন্তু উনি বসতেন না, দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হত। আমরাও শুনতাম। সেই পেরিপ্যাথেটিক ফিলসফার এদেরই বলে, যারা ঘুরে ঘুরে কথা বলে। এক জায়গায় বসে না আর কী। কমল মজুমদার সেরকমই একজন ছিলেন।

কমল মজুমদারের সূত্র ধরেই আড্ডাটা আর একটা জায়গায় চলে গেল। তখনকার দিনে সিগনেট প্রেস নামে একটা দারুণ নামকরা প্রকাশক ছিল। আমাদের

প্রকাশনার জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেয় সিগনেট প্রেস। এখন যে এত ভাল ভাল বাংলা বই ছাপা হচ্ছে, এর মূলে আছে সিগনেট প্রেস। তার আগে বাংলা বই ছাপায় যত্নের কথা কেউ ভাবেইনি।

সিগনেট প্রেসের প্রাণপুরুষ ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত, মানে ডি কে গুপ্ত। তাঁকে ডি কে-ই বলত সবাই। তিনি আবার খুব বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। ভীষণ আড্ডাবাজ লোক ছিলেন। ওঁদের বাড়ি ছিল এলগিন রোডে। সেখানে আমরা থিয়েটারের ক্লাব করলাম। নাম 'হরবোলা'। সেই থিয়েটারের ক্লাবে কমলদা হলেন মধ্যমণি। তিনি হলেন আমাদের, যাত্রায় যাকে বলে মোশানমাস্টার, সেই রকম। তিনি শেখাবেন, সব কিছুর পরিচালক। আমাদের কতকগুলো অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়েও বাড়তি সংগ্রহ হয়েছিল। কারণ সব থিয়েটার তো মেয়ে ছাড়া চলে না। বন্ধুর বোনদের নেওয়া হয়েছিল। সেখানে থিয়েটারের রিহার্সাল যত না হত, তার থেকে বেশি হত তুমুল আড্ডা। কারণ আমাদের একটা থিয়েটার মঞ্চস্থ করতে লাগত এক বছরের বেশি। কোনও দল বোধহয় এক বছর ধরে রিহার্সাল দেয় না। আমাদের রিহার্সালটাই ছিল আসল, মঞ্চস্থ করাটা ছিল গৌণ। আর ওখানে কমল মজুমদার তো ছিলেনই— গল্পের খনি যাকে বলে।

দিলীপকুমার গুপ্ত নিজে প্রকাশক, অসাধারণ পড়াশুনো ছিল। বিশ্বসাহিত্য অনেক পড়েছিলেন তিনি। আরও দু'জন ছিলেন— চরিত্র হিসাবে অসাধারণ। একজন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র— নামকরা কবি, গায়ক এবং সুরকার। তখনকার দিনে আই পি টি-এর অনেক গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। মানুষটাও খুব মজার ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্টকে ছিল প্রচুর গল্প। আর একজন ছিলেন— সন্তোষ রায়। তাঁর নাম কেউ জানে না। কারণ বরাবরই তিনি নিজেকে আড়ালে রেখেছিলেন। কিন্তু খুব গুণী মানুষ ছিলেন। উনি ছিলেন ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ-র শিষ্য। খুব ভাল গান গাইতেন। ফৈয়জ খাঁ ওঁকে বলেছিলেন প্রকাশ্যে গান গাইবার আগে দশ বছর শিখতে হবে। দশ বছর না শিখে উনি গাইতে পারবেন না। মানে গুরুর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ্যে গাইতে পারবেন না। দুঃখের বিষয় গুরু ন'বছরের মাথায় মারা গেলেন। গুরুর অনুমতি আর নেওয়া হল না। তাই সারা জীবনই উনি মঞ্চে গান করেননি। আগেকার দিনে এইরকম একটা মূল্যবোধ ছিল। ওঁর কাছে আমরা শুনতাম সব ওস্তাদদের গল্প, দারুণ সব কাহিনি। আড্ডাতে একজন ক্ল্যাসিক্যাল গানের জগতের গল্প বলছেন, দিলীপকুমার বলছেন বিশ্বসাহিত্যের কাহিনি। তাই আড্ডার মধ্যে কখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতের দিকপালদের নানা রকম কাহিনি,

কখনও হত বিশ্বসাহিত্যের নানা উদাহরণ ও কাহিনি। কখনও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলতেন বাঙালি কবিদের কথা, বা রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-সব মজার দিক সেগুলো নিয়ে। আর কমল মজুমদারের ছিল সব বিষয়ে কিছু না কিছু গল্প। আড্ডাতে কিন্তু গুরুগম্ভীর কথা কিছু হত না। সবই হাসিঠাট্টার ছলে হত। কিন্তু আমরা গোগ্রাসে গিলতাম। কারণ আমাদের কাছে তখন অনেক কিছু নতুন ছিল।

এর মধ্যেই কখনও কখনও এসে বসতেন সত্যজিৎ রায়। তখন তাঁর অত নাম হয়নি। তিনি তখন দিলীপ গুপ্তের অধীনে চাকরি করতেন। সিগনেট প্রেসের বইয়ের মলাট আঁকতেন। তখন পথের পাঁচালী-র নির্দেশনা করেছেন। বেশ নামডাক হয়েছে। বিদেশে নাম হয়নি তখনও। পরেও উনি আসতেন। আগেকার কথাই আমার বেশি মনে আছে।

পরে আমাদের ওখানে কখনও কখনও সৈয়দ মুজতবা আলী আসতেন। আরেক বিরাট আড্ডাবাজ লোক। কিন্তু তখন খুব বেশি মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়নি, আড্ডাটা আমার সঙ্গে পরে হয়েছে। এরকম অনেকেই আসতেন সিগনেট প্রেসে। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ দু'একবার এসেছেন, দূর থেকে দেখেছি। অনেক লেখকই তখন ওখানে যেতেন।

আমাদের হরবোলা-র আড্ডাটা বেশ কয়েক বছর চলেছিল। তারপর হঠাৎ ভেঙে যায়। আসলে বেশিরভাগ আড্ডাই খুব বেশিদিন চলে না। কোনও-না কোনও উপলক্ষে সেটা আবার শিফ্‌ট হয়ে কোনও না কোনও জায়গায় চলে যায়। আমাদের হরবোলা-র আড্ডাটাও সেভাবেই উঠে যায়। তারপর কিছুদিন আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে সেখানে বসতাম। সেইজন্য আবার কৃত্তিবাস-এর অফিস খোলা হল মধ্য কলকাতায় বাঞ্ছারাম অক্রূর দত্ত লেনে। পুরো একটা অফিসঘর ছিল। বলতে গেলে, একটা বাড়ির পুরো দোতলাটাই আমাদের ছিল। সেখানে একটা বিরাট আড্ডা হত। তরুণ, ততটা তরুণ নয় এমন লোকেদের আড্ডা।

বিদেশেও আমি অনেক আড্ডায় বসেছি। সেখানে অবশ্য আড্ডার কথাটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হত। যেমন বিদেশে সাংবাদিকরা আড্ডার কথাটা শুনেছে কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক জানত না। বলতো আমরাও অনেকের সঙ্গে দেখা হলে গল্প করি, কিন্তু তোমাদের স্পেশাল বাঙালি আড্ডা কেমন জানি না।

সত্যি কথা বলতে কী এটা বোঝানো শক্ত। আমাদের আড্ডাটা হচ্ছে কেউ কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসে না। কোনও একটা জায়গাতে এসে জড়ো

হয়। যেমন কফিহাউসে। তারপর যে কোন কথা হবে তার ঠিক নেই। বিষয়বস্তু ঠিক থাকবে না। এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে চলে যায়। এটাই তো আড্ডার বৈশিষ্ট্য। অন্য দেশে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসে। বিশেষ একটা বিষয় নিয়ে তারা কথা বলে, সাধারণত তাই হয়। এটাই তফাত আর কী। তবে আলস্যবোধ বাঙালিদের জীবনে একটা অঙ্গ। বাঙালি তো কাজ ভালোবাসে না, কথা বেশি ভালোবাসে। আড্ডা তার একটা অঙ্গ।

আড্ডাতে দুটো জিনিস আমার পছন্দ হয়। একটা প্রাণ খুলে বিশুদ্ধ কথা বলা, যার মধ্যে একটু কৌতুকবোধ থাকে। গুরুগম্ভীর কথা আমার ভাল লাগে না। প্রাণ খুলে কথা বললে তখন ভাল লাগে। আর একটা, একটু সাহিত্যঘেঁষা কথা। আমাদের তো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই অসাহিত্যিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারি না। মানে, আড্ডাধারীরা এমন হবে, যেমন, 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' শুনলেই বুঝবে এটা কোথা থেকে বলছি। যে বুঝবে না তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। সাহিত্যঘেঁষা কথা যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গেই আড্ডা বেশি জমে।

তবে অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে আছেন যাঁরা লেখেন না, কিন্তু পড়েন, অবশ্যই পড়েন। কিংবা লেখার জগতের সঙ্গে জড়িত নন কিন্তু তাঁদের কথার মধ্যে এমন একটা হিউমার থাকে যেটা ভাল লাগে। এমন অনেক মানুষ আছেন।

আমাদের এখন যেমন বুধসন্ধ্যার আড্ডা। বুধসন্ধ্যার আড্ডার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামটা। বুধবার বুধবার দেখা হয় বলেই বুধসন্ধ্যা। কোনও এক বুধবার ঠিক করেছিলাম একটা ক্লাব করলে কেমন হয়। আমার স্ত্রী স্বাতীই উদ্যোগ নিয়েছিল, তারপর আরও অনেকেই যোগ দেয়। ওখানে লেখক, সঙ্গীতশিল্পী, বা সে-রকম কিছুই করেন না সাহিত্য ভালবাসেন, গান ভালবাসেন, তাঁরা আসেন। বেশ কয়েকজন ডাক্তার আছেন, তাঁরা গান ভালবাসেন, সাহিত্য ভালবাসেন। আবার পেশাদার গায়ক সুবিনয় রায় আমাদের সহ-সভাপতি ছিলেন। সমরেশ বসুও ছিলেন সহ-সভাপতি। এখন দিব্যেন্দু পালিত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এরকম অনেকেই আছেন। সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, তরুণ তরুণীরা অনেকেই সদস্য আছেন। বুধসন্ধ্যার আড্ডাতেই আমি বলেছিলাম আড্ডার জন্য একটা ক্লাব করা দরকার। অনেকে অবাক হয়েছিল। কারণ যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে সারাদিন, ঠিক আছে, কিন্তু একটা সময় হয় কী, আমরা ক্রমশ দূরে দূরে সরে যাই। বিয়েবাড়িটাড়ি ছাড়া দেখা হয় না। কিন্তু একটা যদি কেন্দ্র থাকে যেখানে আসব কিন্তু কে কবে আসব ঠিক নেই, কিন্তু আড্ডার জন্য মন পড়ে থাকবে সেখানে।

দিন তো ঠিক করতেই হয় জায়গার জন্য। ঠিক কে আসবে কে আসবে না তার ঠিক নেই, কোনও সাবজেক্টের দরকার নেই। এসে আস্তে আস্তে বসে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলা আর মনটাকে পরিষ্কার করা।

এটার সঙ্গে আমরা অবশ্য একটা উদ্দেশ্য যোগ করেছিলাম, যে, একেবারে আড্ডা দিলে তো হবে না, একটা কিছু করতে হবে। আমরা এমন কিছু করব যাতে সমাজসেবা করা যায়। দাঁতে দাঁত চেপে নয়, হাসতে হাসতে আর কী। যেমন আমরা কিছু নাটকে অভিনয় করেছি। বিভিন্ন নাটক নিয়ে নিজেরাই অভিনয় করেছি। সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব গুহ, সাগরময় ঘোষও অভিনয় করেছেন। এই নাটকের অভিনয়গুলো যখন আমরা করেছি তখন লোকের খুব আগ্রহ হত, টিকিটের ভীষণ চাহিদা ছিল। এমনকি একবার 'মুক্তধারা' নাটক চারদিন করতে হয়েছিল। তাতে টিকিট বিক্রি করে যে টাকাটা উঠতো সে টাকাটা আমরা সেবাপ্রতিষ্ঠানকে দিতাম। তাতে খানিকটা সমাজসেবাও হল, নাটক করার আনন্দটাও হল। এভাবেই টাকা তুলে বেহালার ঠাকুরপুকুর ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে আমরা ফ্রি বেড করে দিয়েছি। লেখক, শিল্পীদের বা তাঁদের সুপারিশে ফ্রি বেডে থেকে কেউ চিকিৎসা করাতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশনকেও দিয়েছি। "পথের পাঁচালী সেবা সমিতি" নামে বনগাঁয় একটা সংস্থা আছে, যেটা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করে তাদের আমরা মাসে মাসে টাকা তুলে দিয়েছি। যেমন এটাও করেছি, নাটক করেও মজা হয়েছে। মাঝে-মাঝে গানবাজনা হয়, কবিতা পাঠ হয়, পরনিন্দা পরচর্চা হয়, তবে ঝগড়াঝাঁটি হয় না।

এই বুধসন্ধ্যার বৈশিষ্ট্য হল, ক্লাবগুলো ভেঙে যায়, যেমন নাটকের দলগুলি ভীষণ ভাঙে, কিন্তু আমাদের বুধসন্ধ্যা ভাঙেনি। বরং কুড়ি বছর ধরে চলছে। সেখানে অতিথি হয়ে হঠাৎ কেউ যেতেই পারে। প্রথমে টুকটাক টুকটাক কথা হয়, শেষের দিকে প্রবল আড্ডা জমে যায় হাসি ঠাট্টা মজায়। এতে, আমি বলব যে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন আমাদের আড্ডার জায়গা হচ্ছে বুধসন্ধ্যা।

বিদেশে আমার এক বন্ধু আছে, ভাস্কর দত্ত। সে তিরিশ বছরের বেশি লন্ডন শহরে ছিল। কিন্তু সে উত্তর কলকাতার ছেলে। লন্ডনে গেলে কী হয় উত্তর কলকাতার আড্ডার স্বভাবটা যায়নি। হয়তো আমি কোনও কারণে ফ্রান্সে গেলাম, ও তাড়াতাড়ি চলে এল। কোনও কাজই নেই, কয়েক দিন আড্ডা মেরে চলে গেল।

একবার জার্মানিতে ইন্ডিয়া ফেস্টিভাল হচ্ছে, সেখানে একটা লেখকের দল গিয়েছিল। তবে আমি অবশ্য সেই দলের সদস্য ছিলাম না। জার্মানিতেও ওইরকম।

বার্লিন শহরে কিছু বাঙালি আছে, তারা খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখাটেখা করতে চলে এসেছিলেন। এমনকী যখন কনফারেন্স হত, সেমিনার হত, তখন আমার বন্ধু ভাস্কর গিয়ে সেমিনারে পাশে বসে থাকত। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেল। ভাস্কর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কথায় তুখোড়, নিজে থেকেই আলাপ করতে পারে। তারা জিজ্ঞেস করছে, তুমি কীভাবে এসেছ? মানে, তোমাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তুমি কবি হিসাবে নাকি প্রাবন্ধিক হিসাবে, না কি ঔপন্যাসিক হিসাবে— কী হিসাবে তুমি এসেছ? ও বলল, "না, না, আমি কিচ্ছু লেখালেখি করি না। আমি স্রেফ আড্ডা দিতে এসেছি।" সবাই তো অবাক। লন্ডন থেকে বার্লিনে একটা লোক নিজের পয়সা খরচ করে এসেছে স্রেফ আড্ডা দিতে! এরকম আড্ডাধারীও আছে।

আর একজন আড্ডাধারীর কথা বলি। তাঁর নাম কান্তি হোড়। ইনি থাকেন কানাডার টোরেন্টো শহরে। কান্তিবাবু বিদেশে আছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। তার আগে জার্মানিতে ছিলেন, কানাডায় এখন আছেন। এক সময় ইকুয়েডর বলে একটা জায়গায় ছিলেন সাত আট বছর। সেখানে একজনও বাঙালি ছিল না। কোনও বাঙালির মুখ দেখার কোনও উপায়ই ছিল না। ভারতীয়ই প্রায় নেই বললে চলে। কিন্তু উনি এত বাংলা ভালবাসেন, এখনও উনি বাংলায় চিঠি লেখেন। আজকাল তো সবাই টেলিফোন করে বা ই-মেল করে, কিন্তু এখনও উনি হাতের লেখায় বাংলায় চিঠি লেখেন। নির্ভুল বানান এবং মুক্তোর মতো হাতের লেখা। পঞ্চাশ বছর ধরে যে লোক বিদেশে আছেন, তিনি এখনও বাংলাকে ধরে রেখেছেন। মানে ইচ্ছা করলেই পারা যায়। উনি আমাকে বলেছিলেন ইকুয়েডরেও যখন ছিলেন তখন বাংলায় কথা বলতে না পারলে মনটা ছটফট করত। উনি করতেন কী রোজ সকালবেলায় ধর্মপ্রাণ মানুষেরা যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন, সে রকম রোজ সকালে রবীন্দ্রনাথের বই থেকে পাতার পর পাতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে যেতেন। নিজের কানে বাংলাটা শোনা হত। নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই শুনতেন আর কী। বলতেন. এইভাবে আমার বাংলার প্রতি আগ্রহটা বজায় রেখেছি। ইনিও ওইরকম আড্ডাবাজ। ভদ্রলোক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, খুবই শিক্ষিত। অফিসে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন।

আমরা আমেরিকাতে গিয়েছিলাম কতকগুলো নাটক করার জন্যে। বস্টনে আমার ছেলে থাকে। সেখানে আড্ডা দেবার জন্য প্যারিস থেকে চলে এল আমার বন্ধু অসীম রায়, কান্তি হোড় চলে এলেন কানাডা থেকে, নিত্যেন্দু চক্রবর্তী বলে

আর একটি ছেলে কানাডা থেকে এল। তারা যে যার নিজের পয়সা খরচ করে চলে এল স্রেফ কয়েকটা দিন আড্ডা দেবার জন্যে।

ভাস্করের ওখানে লন্ডনে যখন যেতাম, ও-ই প্রথম যে হঠাৎ অফিস গেল না। ওদেশে নিয়ম ধরে সবাইকে কাজ করতে যেতে হয়, হঠাৎ ফট করে ছুটি নেওয়া যায় না। ভাস্করই প্রথম, যে একদিন হয়তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বলল, "বৃষ্টি পড়ছে? যাক্ আজ আর অফিস যাব না।" এটা যেমন আমাদের দেশে হয়, ও ঠিক সেই জিনিসটা ধরে রেখেছে, সাহেবদের দেশে গিয়েও। গৌতম দত্ত বলে একটি ছেলে সে আমেরিকায় থাকে, সে এতই আড্ডাবাজ যে মাঝে মাঝেই অফিসে যায় না। কাজেই ওখানেও বাঙালিদের আড্ডা আছে।

আড্ডা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। বিশেষ করে যারা সব সময় কাজের চিন্তা করে, জীবনটাকে তারা ঠিক উপভোগ করতে পারে না।

৫২

কলেজীয় আড্ডা

সুধীর চক্রবর্তী

আড্ডার খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের বোধহয় খেয়াল থাকে না যে শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত জীবনে আড্ডা এবং তার অনুষঙ্গে অ্যানেকডোটের খুব উজ্জ্বল এক পরিসর থাকে। যেমন ধরা যাক, আমার দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে স্টাফরুমে প্রচুর আড্ডা দিয়েছি তার দশআনা ছিল নানা অধ্যাপকের বিচিত্র কাহিনি। কারোর বাতিকগ্রস্ততা, কারোর কবিতারোগ, কারোর প্রেমঘটিত বৃত্তান্ত। কোন এক অধ্যাপক নাকি কলেজে আসার সময় তাঁর পত্নীকে তালাবন্ধ করে রাখতেন। এধরনের বহু গল্প যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাসে। হয়তো বহুকাল আগে গতায়ু হয়েছেন কোনও অধ্যাপক, তাকে চোখেই দেখিনি কিন্তু, তাঁর কাণ্ডকারখানার ব্যাপার ডালপালা মেলে এখনও সজীব।

সেইরকম একজন ছিলেন আমাদের কৃষ্ণনগরের সরকারি কলেজের সংস্কৃতের বঙ্কু পণ্ডিত। পুরো নাম নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি নাকি খুব সকালে বাজারে গিয়ে সিঙ্গি মাগুর জাতীয় জিওলা মাছ কিনে কাছাকাছি এক পুকুরে ছেড়ে দিতেন। অঙ্কের রাখালরাজ বিশ্বাস মশায়ের গোরুর প্রতি অতি গভীর প্রণয়। বাড়িতে

আট-দশটা গোরু ছিল। তাদের দুধ দোওয়া ছিল বারণ। সকালে দুগ্ধবতী গাভীদের সামনে গিয়ে টুল পেতে বসতেন, গো-বৎসদের খোঁটা খুলে ছেড়ে দেওয়া হত। তারা হামলে পড়ে মাতৃদুগ্ধ পান করত, কষ বেয়ে দুধ গড়াত— আর সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে রাখালরাজবাবুর দু'চোখ জলে ভেসে যেত। সন্ধের পরে গোয়ালে সাঁজালের ধোঁওয়া দিতেন স্বহস্তে, চাকররা বসে-থাকা গোরুদের জন্য মশারি টাঙিয়ে দিত, যাতে সারারাত তাদের মশা না কামড়ায়। এসব দৃশ্য কিশোরকালে আমি নিজে দেখেছি। তবে যেটা দেখিনি সেটা শুনেছি কলেজের পুরোনো বেয়ারা শ্রীপদদার মুখে। রাখালরাজবাবুর নাকি একটা এঁড়ে গোরু খুব প্রিয় ছিল। সেটাকে দড়া দিয়ে বেঁধে রাস্তা দিয়ে নিয়ে কলেজে আসতেন। স্টাফরুমের সামনের তৃণসবুজ মাঠে তাকে খোঁটায় বেঁধে রাখতেন, সে ঘাস খেত, জাবর কাটত, আরামে শুয়ে থাকত। তারপরে ছুটি হলে প্রিয় গোরুর দড়ি ধরে তিনি বাড়ি ফিরতেন, যেন পোষা কুকুর। সেটা ছিল ঘোর সাহেবদের আমল। লালমুখোরা স্যুট-বুট পরে পেট ডগের চেন ধরে হাঁটতেন। তাই দেখে রাখালবাবুর স্বাদেশিকতা চাগাড় দেয়। তিনি ধুতি পাঞ্জাবি আর বিদ্যাসাগরী চটি পরে গোরু হাতে গর্বিত চালে কলেজে আসতেন।

এই রাখালরাজ বিশ্বাস যেন প্রাচীন ব্যক্তি। কারণ আমার বাবা তাঁর কাছে ১৯০৪ সালে এম এ ক্লাসে অঙ্ক পড়েছেন। আমি তাঁকে অশীতিপর বয়সে দেখেছি। বাবাদের কালে তিনি ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইগার্টন স্মিথ সাহেব। বাবার কাছে শুনেছি রাখালরাজ মহাপণ্ডিত ছিলেন, খুব ভালো ইংরাজি জানতেন কিন্তু ইচ্ছা করে বিচিত্র ইংরাজি বলতেন। যেমন বাবাদের ক্লাসে একজন ছাত্রকে একদিন বললেন, "হ্যাভ ইউ ব্রট ইয়োর হোমটাস্ক?"

—"নো স্যার।"

—"ওয়েল, দেন ব্রট ইট টুমরো।"

কৃষ্ণনগর কলেজে আমি যখন ১৯৬০ সালে অধ্যাপনা করতে ঢুকি তখনও রাখালরাজ একজন, যাকে বলে লিভিং লিজেন্ড। স্টাফরুমে তাঁর গল্প শুনতাম। তবে মোক্ষম গল্পটা বলেছিলেন লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিগোপাল মোদক। সে গল্পটা বেশ জমাটি।

রাখালরাজ ছিলেন খ্যাপাটে স্বভাবের স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজে যা বুঝবেন তাই করবেন। বাড়ির লোকের তাঁর বিষয়ে কোনও কথা বলার কোনও সাহস ছিল না। তাঁর আশপাশের লোক তাঁর সম্পর্কে কী ভাবছেন তা গ্রাহ্য করতেন

থোড়াই। তার ফলে গোরু হাতে কলেজে যাওয়া কিংবা গোরু পুষে তার দুধ একবিন্দুও না খাওয়া, তাতে সমালোচনা হত কিন্তু সামনাসামনি কেউ তাঁকে কিছু বলতে সাহস পেত না। রাশভারী গুরুগম্ভীর মানুষ। কিন্তু ক্রমে জানা গেল তিনি সকালে দাঁত মাজেন না। শুনে অনেকে শিউরে উঠলেন, সে কী? এতবড় বিদ্বান পণ্ডিত মানুষ, স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক জ্ঞান নেই কেই বা বিশ্বাস করবে? কিন্তু ঘটনা সত্যি। ফলে সহকর্মী অধ্যাপকেরা ঠিক করলেন সবাই মিলে একদিন তাঁকে চেপে ধরবেন। জানতে হবে অন্তত তাঁর দাঁত না-মাজার পেছনে লজিকটা কী।

সেইমতো একদিন টিফিন পিরিয়ডে অধ্যাপকের মুখপাত্র হয়ে নরেশ দাশগুপ্ত তাঁকে বললেন, ''আচ্ছা, রাখালরাজবাবু আপনি নাকি দাঁত মাজেন না?''

—''হ্যাঁ। তাতে কী? তা ধরুন দশ-পনেরো বছর তো মাজিনি। একবার একটা সার্কাস দেখে কথাটা মনে এল।''

—''দশ-পনেরো বছর? এটা কি ঠিক করেছেন মশাই? আপনি জ্ঞানী শিক্ষিত মানুষ। দাঁত একটা ইম্পর্ট্যান্ট অর্গান মানেন তো? দাঁত খারাপ হলে শরীরে নানা বিপত্তি হয় জানেন না? হ্যাঁ, ভালো কথা সার্কাসের কথা কী যেন বললেন?''

—'হুম' রাখালরাজ ব্যগ্রস্বরে বললেন, ''সার্কাসে দেখলাম বাঘরা প্রচণ্ড বলশালী। চোখের সামনে দেখলাম কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। ভাবুন, দাঁতের কী স্ট্রেংথ!''

—''তার সঙ্গে আপনার দাঁত না-মাজার কী সম্পর্ক?''

ঢং করে টিফিন পিরিয়ডের শেষের ঘণ্টা পড়ল। রাখালবাবু উঠে পড়ে হাতে নিলেন চক-ডাস্টার আর ক্লাস রেজিস্টার। স্টাফরুম থেকে বেরোবার মুখে মুখটা একবার সহকর্মীদের দিকে ফিরিয়ে বললেন,''বলুন তো বাঘের দাঁত কে মেজে দেয়?''

অধ্যাপকরা হতবাক! কী অমোঘ যুক্তি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল আমাদের সময়কার অঙ্কের স্যার দেবকুমার বসুর কথা, যা বহুদিন স্টাফরুমে বলা হত। নিজেকে 'অঙ্কের অধ্যাপক' এমন ক্ষুদ্র পরিচয়ে আবদ্ধ রাখতে চাইতেন না দেববাবু—বলতেন,''অ্যাই অ্যাম এ ম্যাথামেটিশিয়ান'' অর্থাৎ কিনা অঙ্কতত্ত্ববিদ। সবসময় তিনি কোনও না কোনও অঙ্ক সমাধান করতে ভালবাসতেন। দেশবিদেশের নানা অঙ্কভাবনার পত্রপত্রিকা আনাতেন। তো তিনি শেষ জীবনের সঞ্চয় থেকে বানালেন এক দোতলা বাড়ি, তাতে ওপরে নীচে চারখানা ঘর। পাশের বাড়ির থেকে এমন এক কৌণিক অবস্থানে

বাড়িটা করলেন অঙ্ক কষে, যাতে সেই বাড়ির ছাদ থেকে চোর লাফিয়ে ঢুকতে না পারে তাঁর ছাদে। যদি ক্যালকুলেশন না করে লাফ দেয় তবে নিশ্চিত পতন। দেববাবু স্টাফরুমে গর্ব করে বলতেন, ''যদি না জেনে লাফ মারে তাহলে পপাত চ মমার চ। হুঁ হুঁ, বুঝলেন?''

কিন্তু সত্যি সত্যি এক রাতে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটা চোর মরিয়া লাফ মেরে দেববাবুর ছাদে পড়েছে। ধুপ করে আওয়াজে বাড়ির লোকজন জেগে উঠে ছাদের দরজা খুলে তাকে ধরে ফেললে। চোর বেচারি ধরা পড়ে বেকুব। থরথর করে কাঁপছে। সেই নিশিরাতে তাকে নিয়ে কী করা হবে তাই নিয়ে বাড়িব লোক আর হিতৈষী সব প্রতিবেশীদের তর্ক তখন তুঙ্গে, তাকে পুলিশে দেওয়া হবে, না প্রহারেণ সেই নিয়ে তুমুল কলহের মধ্যে দেবকুমারবাবু চোখ কচলে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ঘুম ভাঙুক কেউ তা চায়নি, কিন্তু হই-হট্টগোলে তিনি জেগে গেছেন। কম্পমান চোরের দুটি হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, ''চোর, তুমি কি করে অমন ক্যালকুলেটিভ লাফ মারলে? তুমি কি ম্যাথমেটিশিয়ান?''

বলাবাহুল্য চোর সসম্মান মুক্তি পেয়ে গেল। অধ্যাপকের সন্তানরা ভাবল কী আশ্চর্য তাদের এই পিতৃদেব!

কলেজের স্টাফরুমে সদাসর্বদাই চলে এমন আড্ডার বাতাস। যেমন ধরা যাক, অধ্যাপক ধীমান সান্যাল (আসল নাম নয়) পড়াতেন আমাদের কলেজে। রিটায়ারমেন্টের পরে মাঝে মাঝে এসে পড়াতেন পুরোনো টানে। সবাই তাকে খুব পছন্দ করতেন বাচনের বৈদগ্ধ্যের কারণে, এসে একদিন বললেন, 'আমরা সব সাহেবি আমলের 'গবমেন্ট সারভেন্ট'। তখন তেলদান চলত না। সাহেবরা শুধু কাজ বুঝত আর নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু এখন স্বাধীন দেশে কী চাই জানেন?''

''কী?'' সবাই জিজ্ঞাসু হলেন।

---চাটপটা আর গদগদা। মানে বুঝলেন? চটপটে স্বভাব আর গদগদে বাচন। তাতেই বাজিমাত।

ধীমানবাবু আসলে সকলে তাঁকে কাছাকাছি চেয়ারে বসাতে ব্যস্ত হত। তিনি কিন্তু বসবেন ঘরের কোণের একটা হাতলছাড়া কাঠের চেয়ারে, যার বেতের সিট মাঝখানে ছিঁড়ে গেছে। সরকারি ঔদাসীন্যেই চেয়ারটা আর সারানোই হয়ে ওঠেনি। সেই সিটছেঁড়া বেতের মাঝখানে মস্ত এক ফাঁক। দেখেশুনে একদিন একজন সহকর্মী বলে বসলেন ''বেছে বেছে ওই ফুটো চেয়ারে বসার কারণ কী বলুন তো ধীমানবাবু?''

"চেয়ারটা বেশ কমোডিয়াস" বলে তিনি স্টাফরুমে হাসির সোরগোল তুলে দিলেন। তাঁর কাছে সাহেবি ঘরানার একটা গপ্পো শুনেছিলাম। বলেছিলেন."আমার কাকা চাকরি করতেন সরকারি অফিসে। তাঁদের সেকশ্যান অফিসার ছিলেন এমবুরি সাহেব। ঘড়ি ধরে দশটায় অফিস বসত। সেই সময়নিষ্ঠ সাহেব ঠিক দশ মিনিট আগে এসে টেবিলে বসে পড়তেন। কাকারা রোজই প্রাণপণ চেষ্টা করতেন সাহেবের আগে আসতে, কিছুতেই হত না। বাড়িতে এন্ডাবাচ্চা, গিন্নির বাত, বাসের দেরি, সব সামলে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসেও দশটা বা দশটা পাঁচ। এমবুরি সাহেব একবার রক্তচক্ষুতে চেয়ে ঘড়ি দেখতে বলতেন, 'বাবু, দশটায় আপোনার অ্যাটেনডেন্স হচ্ছে— নাউ ইট ইজ টেন প্লাস ফাইভ মিনিটস।' কাকারা দাঁত কিড়মিড় করে টেবিলে মুখ লুকোতেন।"

"ইত্যবসরে একদিন হল কি জানেন?" ধীমান উজিয়ে বলেন."সেদিন সবাই এসে গেছে দশটার মধ্যে কিন্তু এমবুরি সাহেবকে তার সিটে দেখা গেল না। বাব্বাঃ, যাক বাঁচা গেল। একজন আয়েস করে পানের ডিবে খুললেন. একজন মৌজ করে নস্যি নিলেন সশব্দ। আমার কাকা বললেন.'যাক, শালা সাহেব আজ আসেনি।' হঠাৎ একটা আলমারির পাশ থেকে বেরিয়ে এসে এমবুরি সাহেব বললেন, "না, না, শালা অনেকক্ষণ আগেই আসিয়া গেছে।"

"আসলে সাহেব আগে এসে আলমারির পেছনে লুকিয়ে থেকে শুনতে চেষ্টা করছিলেন তাকে নিয়ে কেরানিবাবুরা কী আলোচনা করেন। সাহেব বাংলা ভালই বুঝত। শালা কথাটা যে গালাগাল সেটা বুঝত কিনা জানা যায়নি।" ধীমান থামলেন।

এই গল্প শুনে গোমড়ামুখো ইতিহাসের অধ্যাপক পরিতোষবাবুর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন."সাহেবদের বাংলা জ্ঞান নিয়ে বেশ মজার গপ্পো আছে আমার স্টকে।"

ধীমান বললেন."অ্যাঁ, আপনিও স্টকে গল্প রাখেন? বাঃ, বাঃ! বলুন, বলুন, বলে ফেলুন টাটকা টাটকা।"

পরিতোষ বললেন."আমাদের শহরে মানে শ্রীরামপুরে, অনেক মিশনারি সাহেব ছিল এককালে। এখন আর প্রায় নেই। তো তারা আসত ইটালি বা ডেনমার্ক থেকে, কেউ কেউ স্কচ বা আইরিশ। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলত। কেউ কেউ ভালো বা না জানত, লিখতেও পারত। সব পাদ্রি, প্রচারক। সেইরকম এক পাদ্রি ফ্রান্সিস সাহেব ধর্মপ্রচারের জন্য ঘুরছে গ্রামে গ্রামে সাইকেল চড়ে। একটা হাটমতো জায়গায় প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গুলতানি করছে। গেঁয়ো মানুষ সব। পাদ্রিবাবা ভাবলেন

ওইখানে সদাপ্রভু যিশুর বাণী ও সুসমাচারের প্যামপ্লেট তিনি বিলি করবেন। সাইকেল থেকে নামতেই একজন বলে বসল,' এ আবার কোথা থেকে উদয় হল? মোনাকাটা?'

পাদ্রিবাবা বেজায় মোটা। তার স্বভাব ছিল নতুন কোনও বাংলা শব্দ শুনলেই সঙ্গের ছোট খাতায় তা নোট করা। এগিয়ে এসে খাতা কলম খুলে বললেন,'কী বলিলেন? মোনাকাটা? ইহার অর্থ কী?'

লোকগুলো পড়ল মহা বিপদে। আলগা রসিকতার যে এমন পরিণতি হবে বোঝেনি। মোনাকাটা একটা গ্রাম্য শব্দ, তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখন উপায়? উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন স্বল্পশিক্ষিত একজন গ্রামবাসী চট করে অবস্থা বুঝে বলল,''ক্যাটি মানে আপনার মতো মোটাসোটা লোককে আমরা মোনাকাটা বলি, বুঝলেন পাদ্রিবাবা?'

'বুঝিয়াছি, বিলক্ষণ বুঝিয়াছি'' সাহেব বললেন। নোট খুলে রোমান হরফে লিখে নিলেন Monakata - motasota— তারপর হেসে বললেন, ''আমি আর কি মোটাসোটা, আমার কাকা, আমার আঙ্কল আমার চেয়েও মোনাকাটা। হা হা হা... মোনাকাটা means fatty। একটি নূতন শব্দ যোগ হইল। ধন্যবাদ বাবুগণ।'

মানুষগুলি তো হতভম্ব। হাসতেও পারছে না। শুধু দন্তমানিক হয়ে আছে'' বলে পরিতোষ থামলেন।

তাই শুনে ভূগোলের অনুতোষ চক্রবর্তী বললেন,''খাতায় নতুন শব্দ নোট করা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, ফার্স্টইয়ারে যখন পড়তাম হুগলি মহসিন কলেজে, তখন ইংরাজি পড়াতেন K K G মানে কমলকৃষ্ণ ঘোষ। দশাসই চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, হিটলারি গোঁফ, গলার স্বর একেবারে বাজখাঁই। প্রথম ক্লাসেই বললেন,''বয়েজ, একটা একসারসাইজ বুক কিনবে। তাতে লিখবে My own Dictionary। সেই খাতায় প্রত্যেকদিন ক্লাসে যে নতুন ইংরাজি শব্দ শিখবে তা লিখে রাখবে উইথ প্রপার মিনিং— কেমন? পরে আমাকে দেখিয়ে নেবে, সিনোনিম লিখে দেব।''

নতুন শব্দ শনাক্ত করার কথা শুনে আমি বললাম,''এম এ ক্লাসে আমাদের প্রাকৃত ভাষা আর সাহিত্য পড়াতেন অধ্যাপক মহেশ্বর দাশ। উনি উচ্চারণ করতেন,'মহে ssরো দাsso পশ্চিম মেদিনীপুর সীমান্তের মানুষ, আধা ওড়িয়া। তাঁর বক্তব্য ছিল,'saকল saব্দ প্রাকৃত ভাssa থেকে উৎপন্ন।''

"পৃথিবীর সব ভাষার সব শব্দ?" আমাদের বিস্ময়াপন্ন জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি এক উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলতেন, "saব saব saব্দ। জিজ্ঞা...sa করো।"

সকলে বেশ মজা পেয়ে গেল। যার যেমন খুশি তেমন শব্দ বলতে লাগল— সংস্কৃত পালি ফরাসি ফারসি উর্দু— আর মহেশ্বরবাবু অবলীলাক্রমে তাঁর প্রাকৃত উৎস বলে দিচ্ছেন। ব্যাপার দেখে আমাদের বিচ্ছুমার্কা সহপাঠী একজন চুপিচুপি আমাদের বলল, 'এবারে একটা দুটো খিস্তির শব্দ বলে দেখব?' আমরা তাকে উজিয়ে দিলেই সে বলে বসল, 'স্যার, খচ্চর কথাটা কোন প্রাকৃত শব্দজাত?'

—'কেন, খেচর। বুঝলে তো?'"

অনুতোষবাবু সবে তাঁদের স্যার সম্পর্কে বলতে চাইছিলেন, তারমধ্যে আমি মহেশ্বর দাশ আমদানি করে বসেছি। আড্ডার তো কোনও নিয়ম নেই ধরাবাঁধা— ঢেউয়ের পরে ঢেউ যেমন আসে। এতক্ষণে অনুতোষবাবু সুযোগ পেয়ে বললেন, "K K G -র আসল গল্পটাই তো বলা হল না। উনি ইংরাজি পড়াতেন আর ইংরাজি কবিতার অনুবাদ করতেন আশ্চর্যরকম। শুনবেন?"

অনুবাদের আবার আশ্চর্যরকম ব্যাপারটা কী যখন ভাবছি ততক্ষণে অনুতোষবাবু বলতে শুরু করে দিয়েছেন, "K K G ভালবাসতেন চার্লস ল্যাম্বের কবিতা। বলতেন 'ইংলন্ডের সর্বমান্য সুবিখ্যাত কবিবর চার্লস ল্যাম্ব বড় পশুপ্রীতিমূলক লিখতেন। তার থেকে একটি কবিতা অনুবাদে শোনাচ্ছি তোমাদের।' বলেই তিনি আমাদের ক্লাসের সকল ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বারবার নাটকীয়ভাবে বাঁদিকে ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, "মেষ রে।",

সে কি? সে কি? ছোটবেলা থেকেই অবশ্য ক্লাসে স্যারেরা 'গাধা' বলতেন, বিশেষত অঙ্ক ক্লাসে 'গাধা' সম্বোধন জুটত অবিরত। পণ্ডিতমশাই বলতেন, 'গর্ভস্রাব', তার মানে বুঝতাম না, তবে শুনে খুব মজা লাগত। কিন্তু ক্লাসে সবাইকে পাইকিরি হারে মেষ বলা? আমরা সবাই অনুতোষবাবুকে চেপে ধরলাম। "তারপর আপনারা প্রোটেস্ট করলেন না? সবাইকে ভেড়া বানিয়ে দিলেন উনি আর আপনারা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন?"

"আরে না, না", অনুতোষবাবু বলেন, "উনি কবিতা বলছিলেন, শুনুন:

মেষ রে!
তোরে কে সৃজিলা রে!
কে দিলা রে
তোর গায়ে
লোম রে!"

স্টাফরুমে একেবারে হইচই পড়ে গেল।'এনকোর, এনকোর', সবাই টেবিল চাপড়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল সশব্দে। "ছাড়ুন অনুতোষবাবু আপনার কে কে জি-র আরও কিছু মালমশলা।" সবাইকে সম্পূর্ণ বেকুব বানিয়ে ঘরের কোণ থেকে রাইমোহন সেন বলে উঠলেন,"আপনারা হাসছেন কেন অত? ব্যাপারটা কী?"

ব্যাপারটা হল, রাইমোহনবাবু ছিলেন বদ্ধকালা, তাই কিছুই বুঝতে পারেননি। আড্ডাচ্ছলে জানানো ভালো যে কানে শুনতে পেতেন না বলে রাইমোহন স্টাফরুমে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতেন যা আমাদের বিব্রত করে তুলত। যেমন একবার ইলেভেন ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় মল্লিকা সেন নামে একটি ছাত্রীকে কিছুতেই প্রমোশন দেওয়া গেল না— তিন সাবজেক্টে ফেল। হঠাৎ রাইমোহন একজন সহকর্মীর কাছ থেকে ঘটনাটা জেনে উঠে দাঁড়ালেন; "প্রথমেই বলি, মেয়েটি যখন সেন তখন কোনও না কোনওভাবে লতায়-পাতায় আমাদের আত্মীয়। ওকে যাতে প্রমোশন দেওয়া হয় তার জন্যে আমার তো লড়াই করা উচিত। তারপরে দেখুন ওর নামটা— মল্লিকা, আঃ,কী সুন্দর নাম! ফুলের নামে নাম। ওকে পাশ করিয়ে দিন আপনারা।"

এমন বিচিত্র যুক্তিজাল কেউ কখনও শোনেনি। প্রিন্সিপাল খানিকটা বিমূঢ় হয়ে বললেন,"কি আশ্চর্য, ফুলের নামে নাম তাতে কী হল? সেন বলেই পাশ করে যাবে? আপনারা কী বলেন?"

আমার কী যে বলি! রাইমোহন সেন ছিলেন নিঃস্বার্থ ভালোমানুষ, পরোপকারী। চিরকুমার স্বদেশব্রতী— পরতেন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি। মাইনের দশআনা দান করতেন গরিব ছাত্রদের হিতার্থে। কেউ ফেল করলে যেন তেন প্রকারেণ তার জন্যে লড়ে যেতেন। একবার একজন ফেল করা ছাত্রের জন্যে সওয়াল করে বললেন,"ও আমার মতোই কানে শোনে কম। ক্লাসলেকচার ফলো করতে পারে না— তাই ফেল করেছে। ওকে সেন্ট আপ করিয়ে দেন, আমি নিজে ওকে পড়াব। দেখবেন ঠিক পাশ করে যাবে।"

আশ্চর্য যে, সে পাশ করে গেল। উনি বললেন,"দেখলেন তো? ভেবে দেখুন ফেল করানোর মধ্যে আমাদের কোন্ কৃতিত্ব আছে? ছাত্র ফেল করবে কেন? দেশ সমাজ তাদের কী দিতে পেরেছে?"

ব্যাপার দেখে আস্তে আস্তে একে একে স্টাফরুম থেকে সবাই কেটে পড়লেন। সে না হয় হল, উপস্থিত কী হবে। কঠিন সমস্যা— একে পদবি সেন তায় নাম মল্লিকা। অতএব রাইমোহন বলে ওঠেন,"স্যার ওকে ওপরের ক্লাসে... she goes,

কেমন? আহা, কী নরম সরম মেয়ে, ফুলের নামে নাম! দেখুন, একে মেয়ে, তাতে কাঠের বেঞ্চিতে বসে তিন ঘণ্টা করে পরীক্ষা দিয়েছে, আহা! দেখতে শুনতে যদি ভালো হত, বাপের টাকা থাকত তবে কবেই ওর বিয়ে হয়ে যেত, তাই না? প্লিজ স্যার, আমি রিকোয়েস্ট করছি। আর তো বেশিদিন চাকরি করব না। তিন মাস পরেই রিটায়ার করব। মাই লাস্ট রিকোয়েস্ট স্যার।"

প্রিন্সিপাল তাকে পাশ করালেন কিন্তু প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন। ফলে তিন মাস পরে যখন রাইমোহন সেন অবসর নিলেন তখন স্টাফ কাউন্সিলে আলোচনা হল তাঁকে ফেয়ারওয়েল কী দেওয়া যায়? বই না দামি শাল, ভালো টেবিলল্যাম্প না বুককেস? প্রিন্সিপাল ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন,"কী দেবেন বুঝতে পারছেন না? কানের যন্ত্র কিনে দিন।"

সকলে হেসে উঠলেন এবং ধার্য হল সেটাই দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট দিনে রাইমোহনবাবু সেজেগুজে এলেন। তাঁর পাগলামি, উদ্ভট স্বভাব, অবুঝ আবদার সবই আমরা ভুলে গেলাম। প্রিন্সিপাল তাঁর হাতে তুলে দিলেন ফুলের স্তবক। তারপরে বাক্স থেকে হিয়ারিং এড যন্ত্র বার করে তার ব্যবহারবিধি বোঝানো হল। হাসলেন।

রাইমোহনবাবুর সঙ্গে আমার আলাদা খাতির ছিল, উনি ওঁর সব প্রাণের কথা অকপটে বলতেন আমাকে। তার কারণ, উনি আগে যে স্কুলে পড়াতেন সেখানে আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম। পরে উনি কলেজে কাজ পান। মুখচোখ উদ্ভাসিত করে কথা বলার একটা ঢং ছিল ওঁর, মানে যদি সেটা হত ভালো কোনও কথা। যেমন বললেন,"এবারে ডালিয়া খুব ভালো সাইজের হয়েছে, যেও দেখবে।" কিংবা বললেন, কামারপাড়ায় একটা ছেলেকে বৃত্তি পাশ করাতে পেরেছি, বুঝলে।" একইভাবে উনি উদ্ভাসিত মুখে সেদিন স্টাফরুমে এসে হাতছানি দিয়ে ঘরের কোণে ডাকলেন। রিটায়ারমেন্টের পর মাঝে মাঝে আসতেন। কানে তাঁর শ্রবণযন্ত্র লাগাচ্ছেন নিয়মিত, বিশেষত পথে বেরোলে। স্টাফরুমের কোণে ডেকে আমার কাঁধে হাত রেখে মুখটা কাছে এনে ফিসফিস করে বললেন,"তোমাকে ভালো খবরটা না দিয়ে পারলাম না।"

—"কী? পোষা মাদি কুকুর চারটে বাচ্চা দিয়েছে?"

'না,না, রাইমোহন কানের যন্ত্র দেখিয়ে বললেন,"বিজ্ঞানের কী অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার দ্যাখো।" উচ্ছ্বসিত মুখে বললেন,"পাখির ডাক শুনছি, বুঝলে?"

—"আগে শুনতে পেতেন না?"

—কই? সেই শিশুকালে কবে শুনেছি। আর এখন রোজ ভোরে বাগানে বসে শুনি। ভগবানের কী অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি এই পাখির ডাক বলো তো?"

রাইমোহন সেন নিষ্ক্রান্ত হতে পাখির ডাকের গল্পটা বললাম সকলকে। সকলে খুশি। ভাবটা যেন, যাক একটা কাজের কাজ হয়েছে, বধিরকে শোনানো গেছে বিহঙ্গকূজন। বাংলার বাবুরামবাবু বললেন,"অধ্যাপকদের মধ্যে কালা দু'-একজনকে দেখেছি। তবে চরম কালা ছিলেন অঙ্কের সুভাষবাবু— সুভাষ সেন। চন্দননগরে পেয়েছিলাম তাঁকে, শুনবেন তাঁর কথা?"

আমাদের আগ্রহী মুখের দিকে চেয়ে বাবুরামবাবু শুরু করলেন, সুভাষ সেন আর গোপাল পাল ছিলেন গলায় গলায় বন্ধু। একজন অঙ্কের আরেকজন বটানির। ওঁরা একসময় একসঙ্গে পোস্টেড ছিলেন দার্জিলিঙের কলেজে— প্রায় চার বছর। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নিজেরাই রান্নাবান্না করে খেতেন। গোপালবাবু ছিলেন রান্নায় ওস্তাদ। পরে বদলি হয়ে গেলেও দুজনের মধ্যে ভালো যোগাযোগ ছিল, সেটা ফ্যামিলি লেভেলেও। পুজোর ছুটিতে দুই বন্ধু দুই পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতেন। দু'জনের পরিবারও এক প্যাটার্নের— এক ছেলে এক মেয়ে। তবে দু'জনে থাকতেন দু'জায়গায়। গোপালবাবু কোন্নগরে আর সুভাষবাবু বারাসতে— দু'জনেই ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন— কোনওদিন প্যান্ট-কোট দেখিনি।"

—"দার্জিলিংয়ে?"

—"হ্যাঁ, দার্জিলিংয়েও। শীতে ইন্টারলক গেঞ্জি আর ড্রয়ার পরতেন। সোয়েটার লং কোট, কিন্তু ভেতরে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। পায়ে মোকাসিন। কত যে মিল দু'বন্ধুতে। দু'জনেই ঘটি দু'জনেই মোহনবাগান। দু'জনেই প্রেসিডেন্সির ব্যাচমেট, দু'জনেরই গভর্নমেন্ট এডুকেশন সার্ভিস।"

সুব্রত গুপ্ত ফুট কাটলেন,"দু'জনের মধ্যে অমিলও ছিল। যেমন একজন কানে শুনতেন আর একজন বদ্ধ কালা।"

—"না না সেটা পরের দিকে। বছর পঞ্চাশে এসে কী একটা মেজর ইনফেকশন থেকে। ওঁদের আমি যখন চন্দননগর কলেজে পাই অ্যাজ কোলিগ, তখন ওঁদের পঞ্চান্ন চলছে। তখন ওঁরা দুজনেই পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে সল্টলেক 'লাবণি'-তে একটা কো-অপারেটিভ আবাসনে একই ফার্স্ট ফ্লোরে পাশাপাশি ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন। ওঁদের দু'জনকে আমরা ঠাট্টা করে লাবণ্যবাবু বলতাম। গোপালবাবু শুনে মজা পেতেন, সুভাষবাবু বেকুবের মতো হাসতেন অর্থাৎ শুনতে পাননি।"

সুব্রত গুপ্ত ফুট কাটলেন আবার,"বাবুরামবাবু, আপনি লক্ষ করেছেন যে বদ্ধ কালারা ফিসফিস করে কথা বলে?"

—"তাই তো, ঠিক বলেছেন। অত খেয়াল করিনি। আরে সত্যি সত্যি সুভাষবাবু একেবারে ফিসফিস করে কথা বলতেন। তো যাই হোক, যা বলছিলাম। দুজনে 'লাবণি' থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে একই অটোতে আসতেন উল্টোডাঙা স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে করে শ্যামনগর হয়ে জগদ্দল ঘাট পেরিয়ে যেতেন চন্দননগর কলেজে। দেখেছেন তো একেবারে পুবমুখী গঙ্গার ধারে কলেজ। ওখানে টানা পাঁচ বছর কাজ করার পরে জুটি ভেঙে গেল।"

—"কেন, ঝগড়া না পঞ্চত্বপ্রাপ্তি?"

—"বালাই ষাট", বাবুরামবাবু বললেন,"দুজনেই বহাল তবিয়তে এখনও সরকারি পেনশন খাচ্ছেন— জুটি ভাঙল ট্রান্সফারের কোপে।"

—"কে কোন্ কলেজে?"

—"গোপালবাবু চন্দননগরে থেকে গেলেন, সুভাষবাবু বদলি হলেন মৌলানা আজাদ কলেজে। ওঁদের জুটি ভাঙায় সকলে দুঃখ করলেন। কালা মানুষটিকে কে-বা সামলাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করলেন কেউ কেউ। তবে ঠিক হল, সুভাষবাবুকে একটা যথোপযুক্ত ফেয়ারওয়েল দিতে হবে।"

—"সে তো সরকারি কলেজে একটা গোঁজামিল রিচুয়াল, তার আবার যথোপযুক্ত আয়োজন কী বা হতে পারে?"

—"চন্দননগর কলেজে সেটা হত। শুধু ফুলের তোকে নয়, দেওয়া হত দামি কোনও উপহার। সকলকে জলভরা সন্দেশ খাওয়াত স্টাফ ক্লাব। গানবাজনা হত।"

সুব্রত বললেন, "একখানা গান তো এই ঘটনার পারস্পেকটিভে খুবই জমাটি হত।"

—"কী সেই গান?"

—"আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে— কি, ঠিক গান বেছেছি?"

বাবুদা বললেন,"কাছাকাছি গেছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টের সুচন্দনা মিত্র গেয়ে দিল, 'আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো/দুটি দিকে গেছে বেঁকে।' সকলেই হাততালি দিয়ে তারিফ করলেন। সুভাষ হাসিহাসি মুখে বসে থাকলেন।"

—"তারপর?"

—''তারপরই হল আসল কাণ্ড। শুরু হল স্তুতিমূলক ভাষণ, যেমন হয় আর কি। বিদায়োন্মুখ অধ্যাপক সম্পর্কে সব ভালো ভালো কথা। ঠিক ছিল সব শেষ বক্তা হবেন গোপালবাবু। সুভাষ কিছু বলতে রাজি হননি। বলেছিলেন 'এ তো রুটিন ট্রান্সফার— পার্ট অব দি সার্ভিস কন্ডিশন। এ পর্যন্ত পাঁচবার হয়ে গেল—জলভাত।'''

''আমিই ছিলাম বিদায় পর্বের সভাপতি'' বাবুরামবাবু বললেন, ''ঘোষণা করলাম, সভার শেষে আমিই দেব সমাপ্তিভাষণ। এখন শেষ বক্তা অধ্যাপক গোপাল পাল। একদিক থেকে এই কর্মান্তর বা স্থানান্তর সবচেয়ে যাঁকে ব্যথিত করবে তিনি হলেন গোপালবাবু। একসঙ্গে একই রুটে পাঁচ বছর যাওয়ার, একই পরিবহণে, সেই যাত্রায় কাল থেকে ছেদ পড়ে যাবে। তাঁর দুঃখ সবচেয়ে গভীর। এবারে তাঁর কাছে আমরা শুনব বন্ধুর বিদায়কালীন প্রতিক্রিয়া। শুনব আরও নানা অকথিত কাহিনি। সুভাষবাবুর সঙ্গে বহু দিন ধরে থেকে পারিবারিক স্তরেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা। এবারে তাই বলবেন গোপালবাবু।

গোপালবাবু স্বভাবে গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, স্বল্পভাষী। উঠে বললেন, 'মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র সেন এবং সমবেত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, আজ থেকে প্রকৃতই আমি খানিকটা একা হয়ে যাব। সরকারি নিয়মেই সুভাষ বদলি হচ্ছে,তাতে দুঃখের বা বিস্ময়ের কী বা আছে? হ্যাঁ, তাকে নিয়ে অনেক কথা বলার আছে বা বলা যায়, কিন্তু বলে কোনও লাভ নেই। কারণ সুভাষ তো কিছুই শুনতে পাবে না। তাই এখানেই থামাই। নমস্কার।''

সভাপতির ভাষণ আর দেওয়ার অবকাশ রইল না। সবাই চুপচাপ। স্তব্ধ। সুভাষ সেন ফিসফিস করে বললেন আমাকে,''ব্যাটা গোপাল কী বলল, অ্যাঁ?''



কফির কাপে সময়ের ছবি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় একবার একটা মজাদার বই লিখেছিলেন। বইটির নাম ছিল 'আড্ডা'। সে বইটির চিত্রকরণের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। গোপালদা একজন বিশ্বস্ত আড্ডাধারী বিবেচনা করে আমায় এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমিও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে গোপালদার চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে ছবিগুলি উতরে দিয়েছিলাম। কথাটা আমার নয় স্বয়ং গোপালদার স্বীকৃতি।

নিঃসন্দেহে এটা আমার বিশ্বস্ত আড্ডাধারী হওয়ার একটা সংশাপত্র। আড্ডা আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই শুরু করেছি। কিন্তু আজকের এই ষাট-ঊর্ধ্বেও সমানভাবে আড্ডা দিয়ে চলেছি। শুধু স্থান-কাল-পাত্র পাল্টে গেছে।

আমার আলোচনা চল্লিশের দশকের থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কফিহাউস এই আড্ডার চৌহদ্দি। কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস পত্তনের পর অর্থাৎ ঐতিহাসিক অ্যালবার্ট হল ভারতীয় কফিবোর্ডের হাতে পড়ে কফিখানায় পরিণত

হওয়ায় আমরা ওয়েলিংটনের সাঙ্গুভেলি (পাখির দোকান) এবং মির্জাপুরের ফেবারিট কেবিনের (নতুনবাবুর দোকান) পাট চুকিয়ে কফি হাউসে এসে খুঁটি গাড়লাম। এর মধ্যে হয়তো কিছুটা আঁতলেমি ছিল। শুনেছি, ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা মমার্তের পাবগুলিকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন তাঁদের রচনাপ্রবাহের দ্বারা। আমরা তখন ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই আমরাও ফরাসি অনুকরণে ঠিক পাব না পেলেও কফিখানাতে এসে জুটলাম সবাই। সেদিন আমাদের সঙ্গী ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন মিত্র, শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, শান্তি রায়, সীতাংশু মৈত্র প্রমুখ। মাঝে মাঝে শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য পেতাম। ভোলাদা ছিলেন গভীর দার্শনিকতার জ্বলন্ত নিদর্শন। নানা রূপে নানা দিক থেকে বিচিত্র আলোচনা করে চমকে দিতেন। একটা কথা আমার এখনও অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে, ভোলাদা একদিন বললেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়লেই নাকি গোটা ভারতবর্ষের দর্শন ও সংস্কৃতি বুঝে ফেলা সম্ভব। আমরা তো সবাই হতবাক। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। ভোলাদার অভ্যাস ছিল এরকম একটা প্রশ্ন তুলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা। অবশ্য পরক্ষণেই ব্যাখ্যা করতেন। যথারীতি কিছুক্ষণ পরে ভোলাদা মুখ খুললেন, "ভালো করে দ্বিতীয় ভাগটা পড়েছ? প্রথম পাঠটা মনে কর তো! প্রথমে ঐক্য— মানবজাতি জন্মলগ্নের মুহূর্তে একতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ফলে এল ঐক্য— তাকে অনুসরণ করে এল বাক্য। এইরকম ভাবেই এল মাণিক্য। কেননা মানুষের ঐশ্বর্য বাড়ল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরপর ভাষা ও সমাজের বিবর্তনের পরিপূর্ণ ধারা রয়েছে এর মধ্যে।" শুধু এইভাবে ভোলাদা আমাদের দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করলেন। আমরা দেখলাম এ এক নতুন দ্বিতীয় ভাগ। এটি শিল্পাচার্যের মস্তিষ্কপ্রসূত না ঈশ্বরচন্দ্রের মস্তিষ্কজাত, এটা আজ আর বোঝা সম্ভব নয়।

অবশ্য আমাদের আড্ডায় এইরকম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি হাস্যরসেরও আমদানি ঘটত। নারায়ণ যতই চালু হোক, ওর সমাজভীতি ছিল। বিশেষ করে মাস্টার বলে ছাত্রসমাজকে ও ভয় করত নৈতিক কারণে— যদিও ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় অধ্যাপক ছিল সে।

একদিন সন্ধ্যায় আমি কফিহাউসের বৈঠকে চৌকো টেবিলকে প্রায় গোল টেবিলে পরিণত করে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি ছাত্রদল নিয়ে, এমন সময়ে নারায়ণের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে আলোড়ন— ছাত্রদের প্রিয় মাস্টারমহাশয়কে কে

আগে প্রণাম করবে— এ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। নারায়ণ এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, আমি শিং ভেঙে বাছুরের দলে কেন! আমি বললাম, এটাই তো আমার স্বভাব। তোমাদের মতো অকালপক্কদের সঙ্গ দিতে গিয়ে অকালে বুড়ো হয়ে গেলাম। তাই মাঝে মাঝে ফিরে যাই আমার আসল বয়সে। ছাত্ররা অবাক বিস্ময়ে দুজনের কথা গিলছে। কেননা তারা বুঝতেই পারছে না তাদের বন্ধু দেবুদার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কী করে সম্ভব! একজন তো জিজ্ঞাসা করেই বসল, "দেবুদা আপনি স্যারকে এত ভালোভাবে চেনেন কখনও বলেননি তো?" আমি বললাম, "নারায়ণ তোমাদের মাস্টার মহাশয় হলেও আমার এক গ্লাসের ইয়ার।" নারায়ণের চোখমুখ লাল হওয়ার উপক্রম। কেননা সবাই জানে আমি একজন মদ্যপায়ী। নারায়ণ ভাবল তার ছাত্ররা এই কথাটা আক্ষরিক অর্থে মেনে নেবে। ও চেঁচিয়ে উঠল, "দেবু শিগগির বল ওদের বুঝিয়ে— যে আমি তোমার এক গ্লাসের নই, এক কাপের ইয়ার।" আমার মনে হল, এই কথাটাই ঠিক। তাই শুধরে বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার এখানে কফির আড্ডা মারি, গ্লাসটাস নয় বাবা।"

আমাদের কফিহাউসের আড্ডায় জ্ঞানপ্রবাহ বা কৌতুকরসের বন্যা ছাড়াও বীরবলের প্রকাশও ঘটত মাঝে মাঝে। আড্ডার আকর্ষণও যেত বেড়ে। একসময় কফিবোর্ড ঠিক করলে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস বন্ধ করে দিয়ে ওরা সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউস নিয়ে খুশি থাকবে। আমরা আড্ডার আশ্রয় হারাবার ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আড্ডাধারীদের নিয়ে একটা কমিটি করলাম। কফিহাউসকে সমবায় প্রতিষ্ঠান করার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম। কিছুতেই একে বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। সাহিত্যিক বন্ধুদের দল তখন পালটে গেছে। এসেছে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেশ বসু, মণিশঙ্কর, বিমল মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেক নতুন নতুন সাহিত্যগোষ্ঠী। গৌরী ঠিক করল যে কফিহাউসের উপর একটি রম্যরচনা লিখবে এবং তা প্রকাশ করবে ওর নিজস্ব প্রকাশনী সংস্থা 'মিত্রালয়' থেকে। সঙ্গে থাকবে আমার আঁকা স্কেচ। এতে জনগণ কফিহাউসের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং শামিল হবে আমাদের আন্দোলনে— এই আশায়।

তখন কফিহাউস দুপুরবেলা প্রেসিডেন্সি কলেজের কমন-রুম হয়ে উঠেছে! প্রেসিডেন্সি কলেজ তখন কো-এড হয়ে গেছে। সবে মেয়েরা আসতে শুরু করেছে

দুপুরের আড্ডায়। অবশ্য তাদের সংখ্যা তখন সীমিত। এমনই সময়ে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে একদল ছেলে নিয়মিত কফি হাউসে আড্ডা জমাতো। আমরা যারা মহিলা-বর্জিত আড্ডাধারী ছিলাম তারা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হলাম। আমরা মেয়েটির নামকরণ করলাম মক্ষিরাণী হিসেবে। একদিন আমার স্কেচে ধরা পড়লেন তিনি। তারপর গৌরীর বই প্রকাশের সময় প্রকাশক সেই ছবিটাও নির্বাচন করল অন্য অনেক ছবির সঙ্গে। বই ছাপা হয়ে গেল।

বইটির যথাযথ প্রয়োজনে আমি একটা স্টান্ট পাবলিসিটির কথা ভাবলাম। গৌরীর দোকানের পাশেই ছিল আমার বন্ধু প্রিয়দর্শী ও গিরিনের দোকান— 'বিবলিওথেক।' সেখানে একটি সুন্দর শো-কেস ছিল। আমি সেই শো-কেসে গৌরীর বই 'অ্যালবার্ট হল'টিকে সাজিয়ে দিলাম কফি হাউসের পরিবেশে। সামনে কফির খালি পেয়ালা, চারমিনারের আধ খাওয়া টুকরো, খালি প্যাকেট, দেশলাই, পকোড়ার প্লেট, খোলা চশমা, খোলা কলম, লেখার খাতা— এমন খুঁটিনাটি অনেক কিছুই। বইটি আধখোলা অবস্থায়। আর পিছনে রইল— মক্ষিরাণীর মূল ছবিটি। গৌরী এবং গিরিন এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ঘাবড়ে গেল। আমাকে বলল, দোকানের উপর আক্রমণ হবে। আমি বললাম, আমি তো কফিহাউসেই থাকব, বীরপুরুষদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। দিন যায়, দিন আসে— কিছুই ঘটে না। তারপর একদিন এল সেই দিন। গৌরীকে দেখি গুটিকয়েক ছেলের সঙ্গে কফিহাউসে ঢুকছে। সঙ্গের ছেলেগুলি উত্তেজিত। বেচারীদের দুর্ভাগ্য আমার টেবিলে আমি তো সদর্পেই আবির্ভূত, সঙ্গে রয়েছে এ বিষয়ে আমার ডানহাত ভূতপূর্ব কুস্তিগীর আমাদের দেবু বোস। গৌরী তো দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই দেবুদা। আমি সোজা উঠে দাঁড়ালাম, আক্রমণের অপেক্ষায়। আস্তে আস্তে দেবুও। কিন্তু আমার খাড়াই চেহারা ও সঙ্গী দেবুর পালোয়ান চেহারা দেখে ওরা আমতা আমতা করে শুরু করল। আমি ওদের কাছে ডেকে বললাম, কি হয়েছে ভাই। ওরা বলল,দাদা ওই দোকান থেকে ওই ছবিটা মানে মক্ষিরাণীর ছবিটা খুলে ফেলতে হবে। আমি বললাম,নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু জায়গাটা তো খালি থাকতে পারে না। একটা কিছু টাঙাতে হবে। তো এবার বল, তোমাদের মধ্যে প্রবলতম আপত্তি কার, তার চামড়াটি খুলে নিয়ে ওখানে টাঙিয়ে দেব। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই ঘটল। কে আগে স্থান ত্যাগ করিবেক— হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমি ও দেবু হাসতে হাসতে বসে পড়লাম। গৌরী বেচারীর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল।

কফিহাউসের আড্ডার কথা বলে শেষ করা যায় না। কারণ এখানেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েক বছর কেটেছে। সেই সব অবিস্মরণীয় লোকের কথা মনে মনে ভাবি। মনে পড়ে সুভাষকে (মুখোপাধ্যায়), মনে পড়ে মণীন্দ্র (রায়), সিদ্ধেশ্বর (সেন), মৃগাঙ্ক, এমনকী 'ক্ষুধার্ত' শক্তি (চট্টোপাধ্যায়) পর্যন্ত। দুই অমিতাভকেও মনে পড়ে। অত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে দীপেন (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। তখনও শক্তি পাদপ্রদীপের সামনে আসেনি। কিন্তু সেজন্য তার ছটফটানির অন্ত নেই। শক্তি প্রতিষ্ঠা করল 'হাংরি জেনারেশন' বলে একটা শালীনতাহীন কবিগোষ্ঠী। তখন রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় নতুন কবিবৃন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য। শক্তি বার করল 'কবিতা সাপ্তাহিক'—কে যেন বার করেছিল কবিপক্ষে 'কবিতা দৈনিক'। তারপর বেরুল 'কবিতা ঘণ্টিকা'— অর্থাৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবিতাপত্র। যাই হোক আমার যোগাযোগ ছিল শক্তির 'কবিতা সাপ্তাহিক'-এর সঙ্গে। শক্তি ধরল আমার ছবির ব্যবহৃত ব্লকগুলো আবার ছাপার জন্য। আমি বললাম, বিভিন্ন কার্যকারণ উপলক্ষে ওগুলি আঁকা, সেগুলি তোমার কাগজে ব্যবহার করতে গেলে তোমার কাগজের উপযোগী এক-একটি টীকা সংযোজন করতে হবে, সেটা কি তুমি পারবে? শক্তি রাজি হল। প্রথম ব্লক দিলাম— কাগজ বেরুল। যে কোন কারণেই হোক ছবির সঙ্গে টীকাটি শক্তি কবিতায় না লিখে দু'লাইন গদ্যে লিখল— সেটির মানে যেমন দুর্বোধ্য তেমনই ছবির সঙ্গে সম্পর্কহীন। আমি বললাম, পরবর্তী সংখ্যা থেকে ছবির টীকা আমি লিখব এবং তা কবিতায়। আমার শিল্পীখ্যাতি থাকলেও কবিখ্যাতি কোনওকালেই ছিল না। তাই আমি কবিতা লিখব শুনে শক্তির চোখ ছানাবড়া। বেচারীর কোনও উপায় নেই। কারণ পড়েছে যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। ছবি ছাপলে আমার কবিতা ছাপতে হবে— তাও আবার প্রথম পাতায়— ব্যাপারটা ভাবুন! শক্তির মতো শক্তিমন্ত কবির কবিতার কাগজে প্রথম কবিতা থাকল কিনা এক খ্যাতনামা গুন্ডার! যাই হোক, ঠ্যালায় পড়ে শক্তি বাধ্য হল এমন বিস্বাদ প্রস্তাবকে গলাধঃকরণ করতে। তবু আমি বলব আমার সব ক'টি কবিতাই ফেলে দেওয়ার যোগ্য নয়। একটা নমুনা দিচ্ছি—

প্রতিদিনের পরাজয়, দিনান্তের ক্ষুধা
দৈনন্দিন লজ্জানম্র বিমর্ষ সর্বদা
স্বপ্নভাঙা জীবনের প্রাত্যহিক ভয়
মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু আজ আর নয়।

তারপর এল সত্তরের দশক, মুক্তির দশক। কফি হাউস গমগম করে উঠল প্রেসিডেন্সির বিপ্লব-বিহ্বল যৌবনের উত্তেজনায়। এল দীপাঞ্জন, অসীম, শৈলেশ, অচিন্ত্য, অপু, নিশীথ, বিপ্লব, হালিম আরো কতজন। এরা সব আমার অনুজপ্রতিম। মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে লাগল সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী বা এদের সংবাদবাহক। প্রায়ই প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকে পুলিশের সঙ্গে ওদের খণ্ডযুদ্ধ চলত। অ্যালবার্ট হলের ছাদে উঠে ওরা পটকা (ওদের ভাষায় বোমা) ছুড়ত পুলিশকে লক্ষ করে। পুলিশ ওপরে তাড়া করলে ওরা ভিড়ে যেত কফি হাউসের হট্টগোলে বা গা ঢাকা দিত পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে। তারপরই শুরু হল ব্যক্তিগত আক্রমণ। আমি এই ব্যক্তিগত আক্রমণের সমালোচনায় মুখর ছিলাম। এবং শ্রেণিশত্রু নির্বাচনে ত্রুটি থাকায় আমি অনেক বিরূপ উক্তি করতাম। তাতে তখনকার নবীন বিপ্লবীরা উত্তেজিত হয়ে উঠত।

এই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল। শুনলাম একটি মজার গল্প। সরোজ দত্ত তখন এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অতি গোপনে বিচরণ ছিল তার তখনকার সময়। এমনই একদিন, খুদে বিপ্লবীরা তাদের আগামী শত্রু হত্যার একটা তালিকা সরোজের হাতে তুলে দেয় সম্মতির জন্য। সরোজ নাকি প্রথম সারিতে খুঁজে পায় আমার নাম এবং সে তার স্বাভাবিক রসিকতায় বলে, হ্যাঁ রে, চেয়ারম্যানের মুখ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরাবি কী করে। ওটা তো ওরই আঁকা। ঘটনাচক্রে সুশীতল মাওয়ের ছবিটা (যেটা গোটা ভারতের দেওয়াল ছেয়ে ফেলেছিল) আমাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছিল বিপ্লবের শুরুতে।

তারপর এল পূর্ব পাকিস্তানের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দিনের স্মরণ দিবস। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কফিহাউসে জমাট আড্ডা চলছে। হঠাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক কবি সমীর দাশগুপ্ত উত্তেজিতভাবে এসে হাজির হল। বলল,"পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। শেখ মুজিবর রহমান ডাক দিয়েছেন, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আজ ভোর থেকে মিলিটারি ক্র্যাক ডাউন করছে সেখানে। একদিকে পাঠান মিলিটারী ও বিহারী রাজাকারের দল, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রবৃন্দ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের আধা মিলিটারি বাহিনী। শুনেই আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম একটা কিছু করবার জন্য।

পরের দিনই সীমান্তে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য একটি ছোট দল ঠিক করা হল। সেই দলে ছিলাম আমি, শিল্পী

সাংবাদিক শিপ্রা আদিত্য, ...ঋত্বিক মিহির সেন, চলচ্চিত্র পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র এবং আরও দু'একজন। বিকেলের গাড়িতে বসিরহাট অভিমুখে রওনা হলাম আমরা সবাই। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় এক বন্ধু যার বাড়িকে আমাদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা। স্থানীয় বন্ধুটির দৌলতে ভূরিভোজসহ প্রচণ্ড মশার কামড়ে রাত কাটল। তার পরের দিন ভোরে ইছামতী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে সাইকেল রিকশা চড়ে রওনা হলাম। সীমান্তে পৌঁছলাম রাত দশটার সময়। চেকপোস্টকে ফাঁকি দিয়ে আট মাইলতক্ এগিয়ে গ্রামের মধ্যে ছোট খাল পেরিয়ে পৌঁছলাম বাংলাদেশের গ্রামে। আমাদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাল মুক্তিযোদ্ধারা। সরকারি চাকুরি যাওয়ার ভয়ে মিহির ও তার বন্ধু উমাপ্রসাদ সীমান্ত পেরোতে রাজি হল না। ফলে ওরা রয়ে গেল এপারে, ওপারে রইলাম আমি, শিপ্রা ও কমিউনিস্ট বন্ধুটি। শিপ্রাই প্রথম ভারতের মহিলা সাংবাদিক যে সরেজমিন সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রথম বাংলাদেশ গিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা সংগ্রহ করে আমি ও শিপ্রা ছবি আঁকতে আঁকতে ও তথ্য সংগ্রহ করতে করতে ভেতরের দিকে এগোতে লাগলাম। দু'দিন হাঁটাহাঁটির পর পৌঁছলাম চাঁচড়া মোড় পর্যন্ত। অল্প দূরেই খুলনা শহর— সেখানে তখন যুদ্ধ চলছে। মুক্তিবাহিনী আমাদের আর এগোতে দিল না। আমরা অগত্যা ফেরা শুরু করলাম, এই পরিক্রমার সংবাদ 'অমৃত' সাপ্তাহিকে শিপ্রার রচনা ও আমার ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

তারপর কফিহাউস ক্রমে ক্রমে মুক্তিযুদ্ধের শিবির হয়ে উঠল। ওপার থেকে একে একে অনেক ছেলে এসে পৌঁছল। বন্ধু ইসমাইল মোহাম্মদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, আল মাহমুদ, আহমদ ছফা, বেলাল তো ছিল অনেকদিন থেকেই। বরং এই সময় সে চট্টগ্রামে ফিরে গেল। কফিহাউস থেকে আমরা সংগ্রহ শুরু করলাম ওপারে পাঠাবার জন্য আহতদের চিকিৎসার ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। গোপনে বোমা, বন্দুক পর্যন্ত সংগ্রহ করতাম ওখানে পাঠাবার জন্য।

এই সময় শিপ্রা আরেকটি কাজ করল। জয়বাংলার বন্ধুদের কাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে শুরু করল। কিছু আগেই সংগ্রহ করেছিল। এইসব সংগ্রহ থেকে বাছাই করে তখনকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে রেডিয়েন্ট প্রসেস থেকে ছাপা শুরু হল বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতার আলোকচিত্রের বিখ্যাত অ্যালবাম। নাম হল Bleeding Bangladesh। সম্পাদনা করল শিপ্রা। তাকে সাহায্য করল কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ত্রাণসমিতির অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী। ছাপা ব্লক, কাগজ, বাঁধাইয়ের খরচ বহন করল রেডিয়েন্ট প্রসেস-এর মালিক নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়।

কফিহাউসে বসেই জহির রায়জান পরিকল্পনা করেন তাঁর বাংলাদেশের উপর ডকুমেন্টারি ও কাহিনি চিত্র'র। তাতে আমাদের পরোক্ষ সহযোগিতাও ছিল। বেচারী জহির সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে ভাইকে খুঁজতে গিয়ে রাজাকারদের হাতে প্রাণ হারায়।

কফিহাউসের আড্ডাতেই সিকান্দার আবু জাফর, আহমদ ছফা, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ রচনা করেছে তাঁদের কত কবিতা— অনুপ্রাণিতও হয়েছে অনেকে। ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত হন শওকত ওসমান।

ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের কবি ও লেখক ধরবার জন্য দালাল পাঠাতে শুরু করলেন কফিহাউসের সান্ধ্য আড্ডায়। এখানে বসে প্রথমে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের অনুরোধে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ত্রাণ সমিতির উপরোধে আমি আঁকি বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর আমার বিখ্যাত প্রাচীর চিত্রমালা। যেটি পরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শিপ্রার অ্যালবামসহ সারা বিশ্বে প্রদর্শন করেন তাদের আন্দোলনে দেশবিদেশের সহানুভূতি আদায়ের জন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কফিহাউসের অবদান কম নয়।

কফিহাউসের আড্ডার কথা বলতে গেলে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের কথাই না মনে পড়ে। এইখানে বসেই আড্ডা দিয়েছি বটুকদার (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর ক'দিন আগে রাত ৯টা পর্যন্ত। কত নতুন দল ও সংগঠন গড়ার প্রবল ইচ্ছাই না তাঁর ছিল তখন পর্যন্ত। তাঁর গাওয়া শেষ গানের কলিগুলি আজও কানে বাজছে। এখানেই বিজন ভট্টাচার্য এসে আড্ডার সঙ্গে তাঁর কত আগামী নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন দিনের পর দিন। এখানে বসেই কেয়া চক্রবর্তী আমার সবরকম পানদোষের বিপক্ষে কত না প্রতিবাদ ও প্রলোভন দেখিয়ে গেছে কত সন্ধ্যায়। ও প্রায়ই বলত, দেবুদা, আপনি যদি মদ খাওয়া ছেড়ে দেন তবে আমি আপনাকে বিয়ে করব। তবে আমার কথাটা আগে মানতে হবে। আমি হাসতাম আর বলতাম, তুই কি আমাকে বোকা পেয়েছিস? আগে বিয়ে কর তারপর মদ খাওয়া ছাড়ব— নইলে মদও ছাড়ব আর তুই কলা দেখাবি— দুই-ই একসঙ্গে যাক! অবশ্য এসব কেয়ার বিয়ের অনেক আগে, আর ও আমার ছোট বোনের মতো ছিল।

মনে পড়ে তুষার রায়কে। শুনেছি ছেলেটি 'নড়াল' অঞ্চলের জমিদারপুত্র। অপরিচ্ছন্ন বেশভূষায় এবং প্রায় সর্বদাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকলেও তার দেহে সবসময় ছিল আভিজাত্যের ছাপ। বেচারি নেশার ঘোরে উল্টোপাল্টা কথা বলত প্রায়ই। একদিন বলল যে দারুণ একটা প্রতিকৃতি আঁকার কাজ পেয়েছে। শুনে তো অবাক, জীবনে শুনিনি ও ছবি আঁকে। ক'দিন বাদে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাজ কতদূর এগুলো? ও বলল, দেবুদা ওটা আপনি এঁকে দিন, টাকাটা ভাগাভাগি করে নেব। আমি তো শুনে হাসব না কাঁদব ঠিক করে উঠতে পারলাম না। ও ছড়া লিখত চমৎকার। প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিল। ওর খুব ইচ্ছে, ওর বইয়ের ছবিগুলি আমি যেন আঁকি। যে কোনও কারণেই হোক ওর 'ব্যান্ডমাস্টার' বইটিতে আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাবার কথা বলেও প্রকাশককে রাজি করাতে পারেনি। বেচারির শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারিনি। তুষারের তখন অর্থকষ্ট চলছিল খুবই। প্রায়ই ওকে না খেয়ে থাকতে হত। অবশ্য ওর গুণগ্রাহীরা কফি হাউসে তাকে ঘিরে ধরে প্রায়ই ছড়া শুনতো, পরিবর্তে ওকে পেটপুরে খাওয়াত। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। একদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। বন্ধুরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিছুটা সুস্থ করে তুলল। কিন্তু শুরু হল আবার নেশাভাঙ। ফলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে অবস্থায়ও নিয়মিত কফিহাউসে আসত। আসত পেটের খিদের তাড়নায়, আসত স্নেহের ক্ষুধায়, আসত আড্ডার লোভে । তখন তার মুখে একটাই কথা যে তার বাংলাদেশের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা পাবে। এই আশা নিয়েই সে সমস্ত দুঃখ ভুলে যেত। তারপর শুনেছি যেদিন সে নিঃস্ব অবস্থায় চলে গেল তার ক'দিন বাদেই নাকি সেই ক্ষতিপূরণের টাকা এসে পৌঁছেছিল— বেশ কয়েক লাখ টাকা। সত্যিই কী নির্মম পরিহাস।

এ তো গেল দুঃখের কাহিনি। এবার একটা মজার কথা বলি। আমরা তখন কফি হাউসের আড্ডাকে এমন প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছি যে এর একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন বিদেশি বন্ধুরা। ভারতীয় ভাষাবিদ চেক পণ্ডিত দুশান জাভিতেল আসতেন, আসতেন প্রখ্যাত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ ডঃ হাইনৎস মোদে। ডঃ মোদের চেষ্টাতেই আমার ছবি জার্মানিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। মোদের শোওয়ার ঘরে 'ইন্ডিয়ান কর্ণার' বলে যে অংশ রয়েছে তাতে এখনও শোভা পাচ্ছে আমার ক'টি ছবি।

কলকাতায় যখন প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল, তখন প্রধান জুরি হিসেবে কলকাতায় এলেন বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক জর্জ

শাদুল। প্রচলিত আছে যে, ইনিই ইউরোপে সত্যজিৎ রায়কে প্রথম পরিচিত হতে সাহায্য করেন। শাদুল ছিলেন ফরাসি ফিল্ম ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক। এদেশে তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিল প্রখ্যাত পরিচালক ও আলোকচিত্রী বারীন সাহা। কলকাতায় সে দোভাষীর কাজ করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডা জমজমাট। হঠাৎ দেখি বারীন ও ঋত্বিক একজন বুড়ো সাহেবকে সঙ্গে করে আমাদের টেবিলের দিকে আসছে। আমরা সচকিত হলাম। কে বাবা এই সাহেব! বারীন বাংলায় বলল, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এখানকার ফিল্ম উৎসবের প্রধান বিচারক। ওঁকে নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমরা সাহেবকে নিয়ে আড্ডা শুরু করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এই কি প্রথম কলকাতাদর্শন? সাহেব ফরাসিতে বললেন, না না আমি মানিক রায়ের চোখ দিয়ে ইতিমধ্যে অনেকবার কলকাতা দেখেছি— 'মহানগর' মারফত। আমি বারীনকে ঠাট্টা করে বললাম, সাহেবকে বুঝিয়ে দাও মানিকবাবু লম্বা লোক, তাঁর দৃষ্টি সবসময় উঁচুতে। তাই, যে কলকাতা তিনি দেখিয়েছেন তা উঁচুতলার কলকাতা। অবশ্য মধ্যবিত্তের আনাগোনা তাতে রয়েছে। সাহেবের কি সময় হবে সর্বজনীন কলকাতার অন্য রূপ দেখার। শাদুল বললেন, এক ঘণ্টা সময় দিতে পারেন। রাত আটটার সময় হোটেলে সত্যজিৎবাবু দেখা করতে আসবেন। আমি বললাম, যথেষ্ট, তাতেই হবে। বেরিয়ে পড়লাম। আমি, বারীন, ঋত্বিক ও সাহেব। ট্যাক্সি ডাকলাম, যখন বললাম, ওয়েলিংটন— তখন বারীন ও ঋত্বিক চমকে উঠল। বলল, কি দেবুদা, খালাসীটোলা নিয়ে যাবে নাকি সাহেবকে। আমি বললাম, তোদের বুঝতে এত দেরি হয় কেন। ওরকম রেডিমেড সর্বজনীন কলকাতা আর কোথায় আছে।

সেদিন ছিল রবিবার। স্বাভাবিক নিয়মেই খালাসিটোলার অঙ্গনে হাই বেঞ্চ আর লো বেঞ্চ পরিপূর্ণ। তিলধারণের ঠাঁই নেই। দেখি সেখানে বসে আসর জমিয়েছেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, মাস্টার, অধ্যাপক, শিল্পী, লেখক, কবিদের সঙ্গে শ্রমিক, জাহাজি, রিকশাওয়ালা প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ। গায়কেরা মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছেন। বিদেশি বন্ধুকে দেখিয়ে সবাইকে অনুরোধ করে ওরই মাঝে একটু জায়গা করে দিলাম শাদুলকে। ওদের বসিয়ে পানীয়ের সন্ধানে গেলাম ভেতরে। দেখি গ্লাস বাড়ন্ত। অগত্যা মাটির ভাঁড় এবং বোতল নিয়ে রাখলাম সাহেবের সামনে। সাহেব তো পরিবেশ দেখে বিস্মিত। বললেন, বাড়িতে এমন সর্বজনীন পাট নেই এবং এত বড়। তিনি আরও মোহিত হয়েছেন কমলদার

(কমলকুমার মজুমদার) সঙ্গে কথা বলে। যাই হোক শাদুল এখানে জমে গেলেন। আটটার জায়গায় ন'টা বাজল— দোকান বন্ধ হওয়ার সময় হল। সবাই উঠলাম একে একে। আমরা ট্যাক্সিতে উঠে দেখি সাহেব দু'হাত ভর্তি খালি ভাঁড় নিয়ে চলেছেন হোটেলে। বারীন অনেক বোঝাল তাঁকে ওগুলি ফেলে দেবার জন্য, সাহেব ততই আগলে ধরেন এই বিচিত্র 'কিউরিও'গুলিকে। মুখে বললেন, রায় এমন অপূর্ব পরিবেশকে ভুলে গেল তার ছবিতে ঢোকাতে— এদিক থেকে মহানগরে একটা অপূর্ণতা রয়ে গেল।

হোটেল গ্রেট ইস্টার্নে ফিরে দেখি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ফিল্মের দুই দিকপাল— সত্যজিৎ রায় ও 'সিনে অ্যাডভান্স' পত্রিকার সম্পাদক সরোজ সেনগুপ্ত। ঋত্বিক ও বারীন ট্যাক্সির অন্ধকারে গা ঢাকা দিল— ওদের ঘাড়ে পাছে দোষ চাপে সাহেবকে 'বাংলা মদ' খাওয়ানোর জন্য। টলায়মান সাহেবকে নিয়ে আমি নামলাম গাড়ি থেকে। সরোজ চেঁচিয়ে উঠল, এ কী দেবুদা, সাহেবকে খালাসিটোলা ঘুরিয়ে আনলে না কি— হায় হায় বুড়ো এবার প্রাণে বাঁচলে হয়। আমি বললাম, ফরাসি পেটে মদ বদহজম হয় না— ওকে একটু সর্বজনীন কলকাতার রূপটি দেখালাম।

তারপর এল জরুরি অবস্থার সময়। হঠাৎ শ্রীমতী গান্ধী দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বসলেন কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। কলকাতায় এর প্রকোপ ততটা প্রকট না হলেও সব ঝড় গিয়ে পড়ল লেখক, সাংবাদিক, শিল্পীদের উপর। ধরাও পড়লেন ক'জন। কফিহাউস আলোড়িত হয়ে উঠল প্রতিবাদে। ব্যবসায়িক সংবাদপত্রগুলি এ অবস্থাকে মেনে নিলেও রাজনৈতিক দলের পত্রপত্রিকা আর ছোট ছোট পত্রিকাগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সাধ্যমতো।

তখন সি পি আই-কংগ্রেস (ই) শামিল হয়েছিল কয়েকটি রাজনৈতিক সমঝোতায়। দুনিয়াব্যাপী 'ফ্যাসি বিরোধী বর্ষ' উদ্‌যাপনের সময় এল। সি পি আই আমাকে ওই বিষয়ে প্রাচীর চিত্রমালা আঁকতে অনুরোধ করল। আমি বললাম, এই চিত্রমালায় ভারতের নব্যফ্যাসিবাদের ছবিও থাকবে কিন্তু। ওরা গররাজি হল। বলল, এতে সমঝোতা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি রাজি নই, বললাম,— একেই তো বলে ফ্যাসিবাদ— শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। শেষে এরা রাজি হল, বলল, একটু নরম সুরে আঁকবেন দেশের ব্যাপারটা। আমার সে চিত্রমালা ইউনির্ভসিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রদর্শিত হয়। দেশি ফ্যাসিবাদের ছবিটা এঁকেছিলাম এইরকম— জোড়া বলদ সিং উঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট'

বইটিকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করছে, আর তাকে বাধা দিচ্ছে বলবান এক পুরুষ দু'হাতে ষাঁড়ের শিংদুটি চেপে ধরে। লোকটির মুখ নাকি ইন্দিরার আদলে আঁকা বলে কংগ্রেসি মহলে গুঞ্জন উঠেছিল— আবদার উঠেছিল প্রদর্শনী বন্ধ করে দেবার জন্য। সি পি আই শেষপর্যন্ত স্থানীয় এক কংগ্রেসি দাদাকে ছবিটি বুঝিয়ে দিয়ে প্রদর্শনী রক্ষা করে।

কফিহাউসের সঙ্গে আমার সখ্য যে কত নিবিড় ছিল সেটা আবার ভালো করে অনুভব করলাম যেদিন ছয়-সাত বছর পর ডাঃ অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে চড়ে একবার কফিহাউসের সান্ধ্য আড্ডায় যোগ দিতে গেলাম। টেবিল ছেড়ে উঠে এলেন পুরনো বন্ধু অপু, অচিন্ত্যরা; ছুটে এল কবি শঙ্কর; ছুটে এল কফিহাউসের পরিবেশনকর্মীরা। ছুটে এল ওদের সম্পাদক কাশেম। বাবা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ও আমাকে বাবা বলেই ডাকত। এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আড্ডার পরিবেশে আবার মশগুল হয়ে গেলাম। সেদিন যত কাপ কফি, চিজ, স্যান্ডউইচ আমরা খেয়েছিলাম, তার এক পয়সাও দাম নিল না কাশেম। বলল, আবার কবে আসবেন বাবা? উঠে আসতে আসতে আমি বললাম, বাঁ দিকটা চলে গেলেও ডান দিকটা এখনও আছে। আমি আসব, আবার আসব তোমাদের উষ্ণ আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায়।



আড্ডাধারী ও 'পরিমলকুমার'

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিমল এক নয়, দুই। একজন পরিমল গোস্বামী, অপরজন কবি, অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষ। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'উপাসনা', 'প্রতিভা' 'ভারতবর্ষ' পত্রের নিয়মিত লেখক, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দীপিকা' ও 'প্রাচী' পত্রের সম্পাদক পরিমলকুমার ঘোষ কাব্যসংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র, গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, নাটোর-রাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ সাহিত্যসেবকদের প্রীতি ও স্নেহ অর্জন করেছিলেন পরিমলকুমার।

জীবনের শেষ পর্বে (১৯৪১-৬০) তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বাস করতেন। এই সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাবন্দি হয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। রোগযন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তই তাঁকে লড়াই করতে

হত। শয্যাবন্দি হয়ে বাইরের চলমান সংসার থেকে নির্বাসনের দুঃখ ভোগ করতে হত। তথাপি একদিনের জন্যও তাঁর মুখে দয়াহীন সংসারের প্রতি ক্ষোভ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিনি।

শুয়ে শুয়েই তিনি লেখাপড়া করতেন। সংসারের সঙ্গে যোগ রাখতেন আর আড্ডা দিতেন। বর্তমান সাহিত্যস্রোত থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পুরনো দিনের শত সহস্র সাহিত্যস্মৃতি তিনি বলে যেতেন, পুরনো সাহিত্য-সতীর্থদের দেখতে চাইতেন, আর বাইরে উদাসীন পৃথিবী তাঁকে ভুলে গিয়েছিল।

আজো মনে পড়ে তাঁর প্রসন্ন আনন, অভ্যর্থনার কোমল দুটি চোখ, তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর। নরম গলায় নিভৃত আলাপের ঢঙে তিনি পুরনো দিনের কথা বলতেন— ঢাকা থেকে কলকাতা, মুন্সীগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য স্নেহাশ্রয় ছিল, সে-সব কথাই বলতেন।

"জানো সেবার ভারী মজা হয়েছিল। মুন্সীগঞ্জে সে বছর ষোড়শ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ থেকে সকল সাহিত্যিকের কাছে আমন্ত্রণলিপি আমরা পাঠিয়েছি। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন নাটোরের কবি-মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, আর সাহিত্যশাখার অধিনায়ক ছিলেন শরৎচন্দ্র। জলধর-দা'কে তো চেন?"

ঘাড় নেড়ে জানাই, হাঁ।

কবি পুনরায় বলতে থাকেন, "কি কারণে জলধরদার কাছে সম্মিলনের আমন্ত্রণ সময় মত পৌঁছয়নি। অধিবেশনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ খবর এলো, দাদা আসবেন না। সর্বনাশ। বাংলাদেশে বা বাংলার বাইরে বোধ হয় এমন কোনো বাংলা সাহিত্যের সভা হয়নি যাতে জলধরদা উপস্থিত ছিলেন না। সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, চিঠিতে, লোক মারফৎ অনুরোধ চলল, কিন্তু 'দাদা'র এক কথা, 'বুড়ো হয়ে গেছি, না পারি লিখতে, না পারি বলতে, তাই সবাই ভুলে যাচ্ছে। এই অকেজো অথর্বকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া কেন?"

পরিমলকুমার আলগোছে মুখে একটু জর্দা ফেলে দেন। কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলে চলেন, "বুঝলাম ব্যাপার সঙ্গীন— মুন্সীগঞ্জের অজ্ঞানকৃত উপেক্ষা 'দাদা'র কোমল প্রাণে কতখানি বেজেছে। জানো তো, জলধরদা বড়ো অভিমানী ও স্নেহাসক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের উপরোধে তখন আমি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলাম, এবার আমন্ত্রণ, ক্ষমা প্রার্থনা, অনুরোধ নয়— একেবারে নিছক আবদার— আসতেই হবে, নয় তো সব ফেলে ছড়িয়ে চলে যাব, যা হয় হোক্।

অবিলম্বে জবাব এলো, "যা লিখেছ, এরপর আর কি করে না গিয়ে পারি ভাই? কিন্তু কেন আর এই বুড়োকে নিয়ে টানাটানি? যাচ্ছি বটে, তবে কারো অনুরোধে নয়,—শুধু তোমার আবদার ঠেলতে পারলুম না, তাই— জানি, শেষ পর্যন্ত আসতেন তিনি নিশ্চয়, সাহিত্য সম্মেলনে না এসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। আমার মত সামান্য অভাজনকেও জলধরদা কত ভালবাসতেন সেকথা মনে করে আজো আনন্দ পাই।"

উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি,— "তারপর কী হ'ল?"

বক্তা একটু হেসে বললেন,"শেষ পর্যন্ত চাদর ও চুরুট শোভিত নবজলধরকান্তি জলধরদা এলেন মুন্সীগঞ্জে। 'নাটোর', শরৎচন্দ্র আর জলধরদা— তিন চন্দ্রে আসর জমে উঠল। এক সন্ধ্যায় অধিবেশনের ফাঁকে রসালাপ হচ্ছে। তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ। আমরা কয়েকজন উপভোক্তা। সুরসিক মহারাজ (জগদিন্দ্রনাথ) বলছেন," দু পাশে সাহিত্যের দুই দিকপাল। মাঝখানে বসে সভাপতি একেবারে 'বকো যথা'।"

জলধরদা সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দিকে ইশারা করে উত্তর দিলেন, 'দিকপাল ওই একপাশেই। আমি তো আছি পঙ্গপাল নিয়ে। শরৎ যেদিন থেকে কলম ধরেছে, সেদিন থেকে আমার সব মিইয়ে গেছি। ওর মনে যে এই ছিল, তা কে জানতো।'

একটু হেসে শরৎচন্দ্র সকৌতুকে বলেন, 'দাদা, লেখা কি আর অম্‌নি হয়?'— তারপর 'কি করলে' লেখা আসে, তার এক তালিকা!— এই— করেছেন? এই— খেয়েছেন? এই— এই— অভিজ্ঞতা আছে? এই— জায়গায় গিয়েছেন? এই— জিনিস নেড়েচেড়ে দেখেছেন?" দাদা ভারী কুণ্ঠিত হয়ে ক্রমাগত ঘাড় নাড়ছেন— না! না! — শরৎচন্দ্র তখন শেষ অস্ত্র ছাড়লেন, 'তবে কি করে লিখবেন বলুন।' আমরা সবাই অট্টহাস্য করে উঠি। দাদা শুধু বললেন, তা বটে।"

আর একদিনের আড্ডা। সকালের রোদ ঘরে এসে পড়েছে। শয্যাশায়ী কবি অতীত-রোমন্থন করছেন। মাঝে মাঝে জর্দা পান খাচ্ছেন, আর গল্প বলছেন।

"শরৎচন্দ্রের কথা অনেক বলতে পারি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। জানো আমাকে তিনি তাঁর অপ্রকাশিত গল্পের পাণ্ডুলিপি দান করেছিলেন, বলেছিলেন, পরিমল, এটা তোমার।"

শুনে আফসোস হয়, বললাম, "সে পাণ্ডুলিপি কোথায়?"

মৃদুহাস্যে কথক বলেন, " বহু মূল্যবান দ্রব্য নষ্ট হয়েছে। সেটিও গেছে। ঢাকা থেকে চলে এলাম। সব-কিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের দু' একখানি চিঠি মাত্র আছে।" ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাজেশিবপুর থেকে লেখা একটি চিঠি দেখালেন। বললেন, "জানো, প্রথম যেদিন বাজে-শিবপুরের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন কী কাণ্ড!"

পত্রালাপে দিন ঠিক করে এক সকালে গিয়েছি। অনেক খুঁজে খুঁজে একটা সরু গলি পেলাম।

সেদিকেই শরৎচন্দ্রের বাড়ি। একটু এগিয়েই দেখি, এক অপূর্ব দৃশ্য। সরু রাস্তায় লুঙ্গি-ফতুয়া পরে শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ফর্‌সির নল। পেছনে চাকর ফর্‌সি হাতে। শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে তামাক টানছেন, আর ধূমপানের অবসরে সামনে-দাঁড়ানো এক কুণ্ঠিত ব্যক্তিকে যা-নয় তাই করে ধমক দিচ্ছেন। সে ধমকের অনর্গল স্রোতের বেগে শ্রাব্য-অশ্রাব্য প্রাকৃত বাংলা 'বুলি' বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখেই হঠাৎ স্বরগ্রাম খাদে নামিয়ে এনে বললেন,'এই যে পরিমল, তুমি এসে গেছ, ঘরে গিয়ে বসো। আমি এখুনি আসছি।' বলেই আগের মতো অগ্নিশর্মা হয়ে আবার সেই অনর্গল প্রাকৃত 'বুলি' ছাড়তে আরম্ভ করলেন। হতবাক হয়ে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে বসলাম। খানিক বাদে শরৎচন্দ্র এলেন।

বললাম, "দাদা, কী?' উত্তর দিলেন,—'আরে, ও কিছু না। ব্যাটাকে একটু শাসিত করে এলাম।' শুনলাম উক্ত প্রতিবেশীর অপরাধ তিনি শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর ভেলীকে তাড়না করেছিলেন। সেদিন সারা দুপুর শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ছিলাম। দুপুরে বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে দুজনে অনেক গল্প করলাম। দিনের শেষে যখন ফিরে এলাম তখন শরৎ-স্নেহে স্নাত ও স্নিগ্ধ হয়েছি।"

উৎসাহিত হয়ে বলি,"শরৎচন্দ্রের কথা আরো কিছু বলুন।"

কথক পুনরায় বলতে থাকে,"যে চিঠিটি সেদিন তোমাকে দেখিয়েছি, ওটি শরৎচন্দ্র আমা'কে ১৩৩২ সালে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রিয়তম কুকুর ভেলীর মৃত্যুর পর লেখা এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন— শোনো— 'তোমাদের ওখান থেকে এসে পর্যন্ত বড় দুঃখ পেলাম। আমার পুত্রাধিক প্রিয় কুকুরটি গেল মরে, মৃত্যুর আগের দিন ওষুধ খাওয়াবার জবরদস্তির চোটে সে দিল আমাকে কামড়ে— যত বন্ধুবান্ধব মিলে টেনে নিয়ে গেল কুকুর-কামড়ানোর (injection) দিতে, সমস্ত পেটময় ২৮টি (injection)— সে এক বীভৎস ব্যাপার!' এই ভেলীকে দেখেছি। শরৎচন্দ্রের মতে ভেলী খুব ভদ্র, শান্ত কুকুর, আর আমাদের মতে অতি

অভদ্র অশিষ্ট কুকুর। অথচ শরৎচন্দ্রকে এ' কথা বললে তিনি ভবিষ্যতে আর মুখদর্শন করবেন না।"

হাস্যরোলে সেদিনের আসর শেষ হ'ল।

আর একদিনও শরৎচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। কবি বললেন, "জানো, শরৎচন্দ্রকে একটি শাঁখ আর ঝিনুক উপহার দিয়েছিলাম। ঝিনুকের ওপরে শরৎচন্দ্রের নাম খোদাই করে দিয়েছিলাম। উনি খুশী হয়েছিলেন খুব। শাঁখটি তাঁর লেখার জলচৌকির ওপরে রেখে ছিলেন। জানো তো, শরৎচন্দ্র খুব শৌখীন ছিলেন। লেখার সরঞ্জাম পরিপাটি হওয়া চাই, দশ-বারোটা কলম তৈরি থাকা চাই, মসৃণ কাগজ চাই,— তবে লিখতে বসবেন। আবার যদি মেজাজ না আসে, তবে লিখবেন না। পাশে বসে রচনারত শরৎচন্দ্রকে দেখেছি। হাতের লেখা মুক্তোর মতো, ধীরে ধীরে লিখতেন। বলতেন,'পরিমল, রচনা ভাল হওয়াই যথেষ্ট নয়, হাতের লেখাটাও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।"

পরিমলকুমার শরৎচন্দ্রের অনুরক্ত ছিলেন। তার পরিচয় বহু গল্পে পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের রসিকতা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কত গল্পই না তাঁর কাছে শুনেছি।

এক দিনের কথা। শায়িত অবস্থায় পরিমলকুমার কথা বলছেন। একটু হেসে বললেন,"শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের সেই অংশগুলি নিশ্চয়ই মনে আছে, যেখানে রাসবিহারী-চরিত্রর নির্মম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল বলে শুনেছি। এবিষয়ে শরৎচন্দ্র একটি গল্প বলতেন। সেটি আজ তোমাকে বলি।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'একবার কলকাতায় এক উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মবাড়িতে নিমন্ত্রণ পেলাম। যাব কিনা সেটা সমস্যা। যদি যাই অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে; আর যদি না যাই, বলবে, ভয়ে এলো না। শেষ পর্যন্ত চলেই গেলাম। তারপর গিয়ে দেখি এলাহী ব্যাপার। বিরাট ডিনার-টেবিল, প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য, প্রচুর আপ্যায়ন। টেবিলের মাথায় একটি অতি-মূল্যবান সুদৃশ্য চেয়ার। মহিলারা সেটাতেই আমাকে নিয়ে গিয়ে মহাসমাদরে বসালেন। তারপর ভাল ভাল কথা, সুন্দর সুন্দর বিশেষণ আমার ওপর বর্ষিত হলো। তারপর সেই বিরাট আহার-পর্ব শুরু হ'ল।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার তাকিয়ে দেখি বাঁ দিকে একটি রুপোর থালায় আমারই একখানি বই খোলা অবস্থায়। একটি পাতায় কয়েকটি বাক্য লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া। একটু উঁকি মেরে দেখি, বইটি 'দত্তা'— যেখানে রাসবিহারী

তার প্ল্যান মাটি হয়ে যায় দেখে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ, ছেলেকে তাড়না করছে, বিজয়াকে অভিসম্পাত দিচ্ছে, সেই জায়গাটি। বুঝতেই পারছ! আমি যেন ওটা দেখতেই পাইনি, এমন ভাব নিয়ে খেলাম, গল্প করলাম, চলে এলাম। ওই বেম্ম মহিলারা ভেবেছিলেন, ওইভাবে আমাকে জব্দ করবেন। হুঁ!'''

কথক থামলেন। শরৎচন্দ্রের সেই বেকায়দা-অবস্থা কল্পনা করে বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েই হাসলেন।

কবি পরিমলকুমার রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম। কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-কালিদাসের সতীর্থ পরিমলকুমার বন্ধুবৎসল ছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, "অনেকদিন ওদের দেখি না, দেখতে ইচ্ছে করে।" নবীনদের তিনি বন্ধু-সহায়ক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্র, তাঁদের প্রথম কবিতা পরিমলকুমারের উৎসাহে মুকুলিত হয়। তবে কবি বেশি গল্প করতেন 'মানসী ও মর্মবাণী'---'ভারতী'-গোষ্ঠী সম্পর্কেই। এমনি এক গল্পের আসরে নাটোর-রাজ জগদিন্দ্রনাথ ও গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলেন।

কবি বলতেন,"নাটোরের মতো উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল রসিক খুব কম দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। নাটোর পাখোয়াজ বাজাতেন খুব ভালো, মিষ্টি কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জমিদারের দম্ভ তাঁর মধ্যে ছিল না, সত্যিকারের বিদগ্ধ রসিক বন্ধু বলে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।"

একটু থেমে কবি চোখ বুজে বুঝি-বা সেই পুরনো সুখের স্রোতে অবগাহন করলেন, এক পলকের মধ্যে তিরিশ বছর ঘুরে এলেন, তারপর স্বগতোক্তির ঢঙে বলতে থাকেন,"আমি তখন ঢাকায়। সেখানে পড়াই। বছরে পাঁচ-ছ'বার কাজে-অকাজে কলকাতায় আসি। একবার এসে উঠেছি গ্রে স্ট্রিটের কাছাকাছি। নানা জরুরী কাজের চাপে পড়ে আর মহারাজের কাছে যেতে পারি নি। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় দেখি আমাদের সরু গলির মধ্যে এক বিশাল মোটর এসে ঢুকল। ঠিক, যা ভেবেছিলাম, তা'ই। নাটোর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। আমারই আগে গিয়ে দেখা করা উচিত ছিল। শশব্যস্ত হয়ে ছুটলাম।

ল্যান্সডাউন রোডে নাটোর-প্রাসাদে পৌঁছে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই দেখি, মহারাজ একা বসে আছেন প্রশস্ত বারান্দায়। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই হেসে বললেন,' তুমি কলকাতা এসেছ খবর পেয়েছি, মনে করেছিলোম এখানেই আসবে। এলে না, তাই লোক পাঠিয়ে ডাকতে হল। বোস। প্রভাতকে খবর দিয়েছি সে এখুনি আসবে। তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক বোঝাপড়া আছে।

তুমি তো জানো, আমি 'মানসী ও মর্মবাণী'র নিজস্ব লেখক দল গড়তে চাই। তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

আমি খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলাম। তারপর খানিকক্ষণ একথা-সেকথার পর সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ শব্দ শুনে সাগ্রহে তাকিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক বিপুলকায় বাঙালি ভদ্রলাক উপরে উঠে আসছেন। এই কি সেই ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার! মনে পড়ল কবির কথা--'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো।'

মহারাজ পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর প্রভাতকুমারের অতি গম্ভীর মুখে অতি-মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন,'এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছেন, দেখি কেমন করে এড়িয়ে থাকবেন।' অবাক হয়ে ভাবলাম, এঁর ভিতরেই এত অজস্র হাসি, উদার সহানুভূতি। 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল, 'বলবান জামাতা'র নলিনী, 'নিষিদ্ধ ফলে'র রায়বাহাদুর, 'রসময়ীর রসিকতা' যে এঁরই লেখনী-সৃষ্ট, সেই মুহূর্তে একথা ধারণা করা কঠিন হয়েছিল।

তারপর আরম্ভ হল বিশুদ্ধ আড্ডা। মহারাজের সরস বাক্যালাপে প্রভাতকুমারের বাহ্যিক গাম্ভীর্য যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, আর ভিতরকার মানুষটির সত্যিকারের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল অজস্র রসমধুর রহস্যে ও নানা বিষয়ের বিচিত্র আলোচনায়। আমার সমস্ত কুণ্ঠা মুহূর্তে বিদূরিত হল। দু'জনে বাক-প্রতিযোগিতায় নামলেন--- রঙ্গরসে, শ্লেষে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণে মুখরিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে মহারাজের ইঙ্গিতে আমার জন্য চা আর নানারকমের খাবার এলো। মহারাজ নিজে কিছুই খেলেন না।"

এই পর্যন্ত বলে পরিমলকুমার একটু থামলেন, দুটি ছোট পান একটু জর্দা দিয়ে খেলেন। জর্দা ও ধূপের গন্ধে পরিবেশ বিচিত্র সুরভিতে ভরে উঠল।

থাকতে না পেরে বললাম,"সে কি, কেবল আপনার জন্য চা খাবার। আর প্রভাতকুমারের জন্য?"

পিকদানিতে পিক ফেলে একটু হেসে কথক শুরু করলেন,"আহা, সে কথাতেই তো আসছি।

প্রভাতকুমারের জন্য বন্ধুবৎসল মহারাজ আনিয়েছিলেন বিলেতি সোমরস। সেই সুধাপানে প্রভাতকুমারের হৃদয় আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, মনের দুয়ার খুলে গেল, শুরু হল নানা গল্প, যার শেষ নেই। ওদিকে সন্ধ্যা বিদায় নিয়েছে রাত এগিয়ে চলেছে। নানা কথার মধ্যে প্রভাতকুমার একটা কথা বলেছিলেন। শুনে

রাখো। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে কাশ্মীরের পথঘাট নিসর্গের চমৎকার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রভাতকুমার কবুল করলেন তিনি নিজে কখনো কাশ্মীর যাননি।

একটা প্রসঙ্গ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা হচ্ছিল। চরিত্র-চিত্রণে বাস্তব ও কল্পনা কতটা করে থাকবে। আমরা তিনজনেই আপন মত প্রকাশ করছিলাম। প্রভাতকুমার শেষ পর্যন্ত বললেন,'দেখুন, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা মনের ওপর যে ছায়াপাত করে, তারই উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে গল্পের চরিত্র এঁকে যাই। সব নির্ভর করে মনের ভিতরকার ছবিটার ওপর। 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল যে নিছক কল্পনা নয়, এ অনায়াসে অনুমান করতে পারেন।'

মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন,''বলবান জামাতা'র নলিনীর চিত্র যে আত্মজীবনীমূলক নয়, এ-কথাটি অতি সহজেই অনুমান করা যায়।'

প্রভাতকুমারের দেহায়তন লক্ষ করেই এই সরস মন্তব্য। আমরা তিনজনেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরে তুললাম।''

বক্তা একবার চোখ বুজে সেই আনন্দ-দৃশ্যটি মনে মনে দেখলেন। তারপর বললেন,''এদিকে রাত দশটা বেজে গেছে। এগারোটার কাছাকাছি ঘড়ির কাঁটা। প্রভাতকুমারের কথা মন্থর, তন্দ্রাজড়িত; মহারাজও যেন পরিশ্রান্ত। বিদায়ের জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। মহারাজ বাধা দিলেন,'এত তাড়া কিসের? Night is young yet, চল, গাড়িতে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক্। কাজের কথাই যে এখনো হয় নি। গাড়িতে হবে 'খন।'

করজোড়ে সেদিনকার মত বিদায় চাইলাম, প্রভাতকুমার অনুকূল হয়ে বললেন, 'আজ থাক্, আর একদিন হবে।' মহারাজ সম্মতি দিলেন। প্রণাম করতেই সকৌতুক গাম্ভীর্যে বললেন,'আমি শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর বংশধর। আমার গা ছুঁয়ে বলো, কোনো লেখা আমাকে না বলে কোনো কাগজে পাঠাবে না, আর ভাল লেখা পেলেই 'মানসী ও মর্মবাণী'র জন্য সংগ্রহ করবে।'

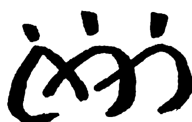
নতমস্তকে বললাম, গা ছুঁয়ে নয়, পা ছুঁয়েই বলছি, আপনার এ স্নেহের আদেশ মনে থাকবে।''

এতক্ষণে কবি থামলেন। তিরিশ বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যের সামাজিক জীবনের চলচ্ছবি এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। এবার চমক ভাঙল।

পরিমলকুমার কলকাতা ও ঢাকায় সাহিত্যস্রোতে একদিন ভেবেছিলেন ঢাকা থেকে সাহিত্যপত্র বার করবেন। প্রথম সংখ্যায় কবিতা চাই; শুধু তাই নয়, কাগজের একটা ভালো নামও চাই,—এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্নেহের দাবি পাঠালেন।

দিন কয়েকের মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে ঢাকায় আশীর্বাদ এসে গেল। 'কাগজের নাম দাও—'দীপিকা' সেই সঙ্গে 'দীপিকা' নামে একটি কবিতা। সেই কবিতা ব্লক করে প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপালেন। সে আনন্দের দিন চলে গেছে। কবির মনে হয়েছে, সাহিত্যসংসারে সেই প্রীতি ও দাক্ষিণ্য অপরিমেয় উদারতা ও স্বাভাবিক সারল্য, ভক্তের প্রণতি ও তপস্বীর ধ্যান আজ আর নেই। এ' কথার উত্তর নেই বলেই চুপ করে থেকেছি। পুরনো দিন অবসিত, পুরনো বন্ধুরা অন্তর্হিত। এখন নবীন যুবা কাশীনাথের দল গান গাইছেন। বুড়ো বরজলাল অপসৃত হয়েছেন। কিন্তু সেদিনের সেই প্রীতিসুধাবস কি আজ উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে?

কবি পরিমলকুমারকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি।



আমার আড্ডার কোলাজ

চণ্ডী লাহিড়ী

কলকাতার আড্ডার সঙ্গে মফস্‌সলের আড্ডার চরিত্রগত পার্থক্য খুব। আমি নবদ্বীপ শহরের ছেলে। শৈশব থেকেই প্রবল পরিমাণে রাজনীতি-আসক্ত। যারা সেসময় পথে-ঘাটে বিড়ি ফুঁকে আড্ডা দিত, তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখায় অভ্যস্ত ছিলাম। একালে কেবল বখে যাওয়া বেকাররা রাজনীতিতে আসে। আমার শৈশবে রাজনীতিতে যাঁরা আসতেন তাঁরা জীবন সম্পর্কে সিরিয়াস। আড্ডা দেওয়ার ফুরসত কোথায়? কলকাতায় এলাম বাহান্ন সালের শেষে। ১৯৫৩ সালে লোকসেবকে ১৮ টাকা বেতনে সাব-এডিটর হলাম। ওই ১৮ টাকা কোনওদিন ১৯ টাকা হয়নি। উত্তর কলকাতায় তখন সাংবাদিকদের একটি বড় আড্ডা বসত ফড়েপুকুরের দু'চারটে বাড়ির আগে, নগেন্দ্র কেবিনে। নগেন্দ্র কেবিন অনেকদিন হল অন্য দোকানে রূপান্তরিত হয়েছে। নগেন্দ্র কেবিনে আনন্দবাজার-যুগান্তর দুই পত্রিকার সাংবাদিকরাই আসতেন এবং যে সব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক সরবে চলত সেসব আমার গ্রাম্যকর্ণে যথেষ্ট সুখশ্রাব্য মনে হত না। অনেককিছু ঠিক

ধরতে পারতাম না। আমার গুরু, দৈনিক লোকসেবকে যিনি সর্বদাই আমায় গাইড করতেন তিনি মাঝে মাঝেই আড্ডা অর্থাৎ পরনিন্দা পরচর্চার সূত্র বা নিহিত অর্থটা বুঝিয়ে দিতেন। নিহিত অর্থ বলতে অনেক গোপন গুহ্য তথ্য বরিষ্ঠ সাংবাদিকরা জানতেন, যা আমার গ্রাম্য মাথায় সহসা প্রবেশ করত না। তাছাড়া কলকাতায় খবরের কাগজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলাম। যে রাজনীতিবিদদের খবর কাগজের পাতায় নবদ্বীপ শহরে পড়তাম, এখন কাগজে কাজ করার দরুন তাদের সামনাসামনি দেখতে ও তাদের স্বরূপ বুঝতে হচ্ছিল। সেটাও বিলক্ষণ কৌতূহল উদ্রেক করত। শিবদাস ভট্টাচার্য মোহনবাগান রোডে থাকতেন, তিনি আনন্দবাজারের চিফ রিপোর্টার। পত্রিকা এবং পত্রিকা মালিকের ইমেজ রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব তাঁর। যুগান্তর থেকে হাজির থাকতেন প্রফুল্ল গাঙ্গুলি---তিনি ইউনিয়ন নেতা। তাঁর অবশ্য মালিকদের প্রতি কোনও দুর্বলতা ছিল না। বিখ্যাত বার্তাসম্পাদক অমূল্য সেনগুপ্তের পুত্র নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন যুগান্তরে। নিয়মিত আসতেন। নিরঞ্জনবাবু আড্ডা দেওয়ার সময় ভাষা ব্যবহারে খুব সংযত থাকতেন। শেষবার যখন যুগান্তর বের হল, তখন এই নিরঞ্জন সেনগুপ্তই সম্পাদক হয়েছিলেন। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত লোকসেবকে থাকার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুরোহিতপুত্রকে পরীক্ষায় পাস করাবার একটা কেলেঙ্কারি ফাঁস করে খুব নাম করেন।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের তারা রায় থাকতেন বাগবাজারে। হার্টের রোগী এই বেঁটেখাটো ভদ্রলোকটি গুটি গুটি পায়ে নগেন্দ্র কেবিনে এসে আড্ডা উসকে দিতেন। হঠাৎ এসে পড়তেন আনন্দবাজারের শিবদাস। প্রফুল্ল গাঙ্গুলি (যুগান্তর) চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘‘আসুন শিবদা, গোরু তাড়াতে গায়ে কোথাও লাগেনি তো?’’

শিবদাস পাল্টা জবাবে অমায়িক কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘‘ব্যথা একটু লেগেছে। তরুণী গাইগুলোকে বাগবাজারে পাঠাতে হল, কিছুতেই যাবে না তারা।’’

একালের পাঠক শিবদাস, প্রফুল্ল গাঙ্গুলির এই কথোপকথনের অভ্যন্তরীণ বিষয়মুখটা ধরতে পারবেন না। ব্যাখ্যা দিই।

আনন্দবাজারের মালিক অশোককুমার সরকারের নতুন বাড়ি মদনমোহনতলায়, কুমারটুলির কাছে। সেই বাড়ির চারপাশে খাটাল। দিনরাত মশামাছির উপদ্রব। কলকাতা কর্পোরেশনকে বারবার বলে, লেখালেখি করেও সেসব খাটাল অপসারণ করা যাচ্ছে না। শিবদাস ভট্টাচার্য পত্রিকামালিককে ‘খুশি’

করার জন্য সপ্তাহে একটি করে খাটালবিরোধী সংবাদ তৈরি করতেন। পুরসভার লোকেরাও জানত সারা কলকাতায় খাটাল আছে, কেবল মদনমোহনতলার খাটাল উচ্ছেদ করতে গেলে কথা উঠবে।

শিবদাস বলেছিলেন— তরুণী গাইগুলোকে বাগবাজারে পাঠাতে হল। বাগবাজারস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক তরুণকান্তি ঘোষের বিখ্যাত বাগানবাড়ি বারাসতের রাস্তায়। বাগানবাড়িতে 'তরুণী' পাঠাবার খোঁচাটি সবচেয়ে গবেট মানুষও বিলক্ষণ বুঝবেন। এসব নিছক আড্ডার অসংযমী, অপ্রমাণিত বাক্যালাপ। সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় আদালতে মামলা উঠলে। আড্ডায় কে করে 'যাহা বলিব যত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না' শপথবাক্য পাঠ করে! আর এই যে সত্য মিথ্যার কুহেলিকা মাখা বাক্যালাপ, এটাই তো রসিকেরা জানেন আড্ডার প্রাণভ্রমর।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত জাত-সাংবাদিক এবং সত্যযুগসন্ধানী। যুগান্তরে কাজ করলেও কারও প্রতি অন্ধ আনুগত্য ছিল না। একদিন নগেন্দ্র কেবিনের আড্ডায় এসে বললেন,"সকালে উঠেই বুড়োর কাছে গিয়েছিলাম। বুড়ো একটা মোক্ষম যন্ত্র দেখাল।"

সবাই না হোক, আমরা কয়েকজন সাগ্রহে নিরঞ্জনকে চেপে ধরলাম। সকালবেলায় নিরঞ্জন গিয়েছিলেন বুড়ো অর্থাৎ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি। তাঁর একটা গুহ্য তথ্য জানা খুব দরকার। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে অমৃতবাজার, যুগান্তরের মালিক তুষারকান্তি ঘোষ প্রতি মাসে একহাজার টাকা দিতেন। এটা হাড়কেপ্পন মানুষের দান। সাহায্য, না ঘুষ? টাকাটা যে দেওয়া হয় এটা নিরঞ্জনবাবু প্রমাণসহ জানতে পেরেছেন। নিছক সাহায্য! সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজারের মালিক) প্রতি মাসে কয়েকজন প্রাক্তন রাজবন্দিকে অর্থ সাহায্য করতেন। যাঁরা টাকা পেতেন তাঁরা সুরেশ মজুমদারের জেলবাসের সহকর্মী। তুষারবাবু কোনওদিন জেলে যাননি। হেমেন্দ্রবাবুও নন। তবে কেন প্রতি মাসে হাজার টাকার সাহায্য! হেমেন্দ্রবাবু যখন দেখলেন সংবাদটি একজন সাংবাদিক স্কুপ করেছেন তখন বেশি জানাজানি বন্ধ করতে নিরঞ্জনকে সত্য কথাটা বলে দিলেন।

তুষারবাবু তখন খুবই বালক। বালগঙ্গাধর তিলক কলকাতায় এসেছিলেন মতিলাল ঘোষকে সাক্ষাৎ করতে। ফেরার সময় দেখলেন একটি বালক নর্দমার ধারে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে 'অ্যা' করছে। বালকটির নাম তুষারকান্তি। ব্যাপারটি তিলকের (কট্টর ব্রাহ্মণ তিলক) আদৌ পছন্দ হয়নি। তিলক একটি চিঠি দিয়েছিলেন

হেমেন্দ্রপ্রসাদকে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ চতুর এবং পাটোয়ারি বুদ্ধির মানুষ। সেই চিঠির কপি তুষারকান্তিকে দেখান। এবং ব্যাপারটি ধামাচাপা দিতে মাসিক একহাজার টাকার ঘুষ মঞ্জুর হয়।

আবার বলি, এটা বিশুদ্ধ আড্ডার গল্প। নর্দমার ধারে এক খ্যাতকীর্তি সাংবাদিকের 'অ্যা' করার গল্প নিরঞ্জন আড্ডাতেই বলেছেন, কোথাও লেখেননি। কারণ আড্ডায় বলা কথায় বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। It is a license for licentiousness.

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক। নিজের বেতন প্রতি মাসে ঠিকমতো পেলেও কর্মরত সাংবাদিকরা ছ'মাস বেতন পাননি। স্মরণযোগ্য, শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর 'বাঁকা চোখে' বন্ধ করে দেন বারোহাজার টাকা বাকি পড়ার পর। অগত্যা বসুমতী ছেড়ে তিনি আনন্দবাজারে এসে 'অল্পবিস্তর' লিখতে শুরু করেন।

একবার বসুমতীর সাংবাদিকরা ধর্মঘট করবেন ঠিক করলেন। যুগান্তরের প্রফুল্লরতন গাঙ্গুলি তখন সাংবাদিকদের ইউনিয়ন নেতা। তিনি বসুমতীর ইউনিয়ন নেতা ভোলাকে ডেকে (অবশ্যই আড্ডায়) বললেন,—আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বুড়োর (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) জয়ন্তী উৎসব কর। জয়ন্তী উৎসব করলে লোকটা এক/দুই বছরের মধ্যে মারা যাবে। মরলে নতুন সম্পাদক আসবে। নতুন সম্পাদক এলে বকেয়া বেতন মিলবে।

না, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের জয়ন্তী উৎসব করা হয়নি শেষপর্যন্ত। বসুমতীর অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুধাংশু ঘোষ ভালো হোমিওপ্যাথি জানত। সুধাংশু শেষ দিকে নিজ উদ্যোগে ভালো প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেলে। সুধাংশুও একসময়ে নগেন্দ্র কেবিনের আড্ডায় এসেছে। সাংবাদিকদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ বলে দিত নির্ভুলভাবে। প্রফুল্লরতন যুগান্তরে রিপোর্টারি ও সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা ছাড়াও শখের জ্যোতিষী চর্চা করত। সেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কারও মিলত, কারও মিলত না। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের তারা রায় নগেন্দ্র কেবিনে এসেই প্রফুল্লরতনের কাছে হাত মেলে ধরতেন। তারাদার তখন একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। প্রফুল্ল তারাদাকে প্রচুর সান্ত্বনা দিয়ে উৎসাহিত করেছে সেই দুঃসময়ে।

সাংবাদিকদের আড্ডা, অনেকেরই ধারণা ছিল এই আড্ডায় ভিড়ে যদি সাংবাদিকদের আপ্যায়ন করা যায়, হয়তো কাগজে সস্তায় প্রচার পাওয়া যাবে। এক জ্যোতিষী বেশ কিছুদিন আড্ডায় এসে সাংবাদিকদের হাত দেখতে এবং

ভালোভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল। প্রফুল্লরতন তাকে একদিন পাকড়াও করে বলল,— বসুমতীর সম্পাদক কবে চেয়ারমুক্ত হবে বলতে পারো? তোমার সেই উত্তরটা বসুমতীর প্রথম পাতায় ছাপা হবে। পরদিন আর সেই সুযোগসন্ধানী জ্যোতিষীর দেখা মেলেনি।

নগেন্দ্র কেবিনে সাংবাদিকদের আড্ডা ছিল এক্সক্লুসিভ— বাইরের আমজনতার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সাড়ে দশটা বাজলেই সে আড্ডা খতম। যাদের চাকরিতে দশটা-পাঁচটার ব্যাপার ছিল না, তারা সোজা অতঃপর চলে যেতেন বাগবাজারের তেলেভাজার আড্ডায়। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও বাগবাজার স্ট্রিটের জংশনে সেই বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান। দোকানে ঝুলছে প্রোপ্রাইটর যখন যৌবনে যাত্রার হিরো ছিলেন সেই হিরোর ভূমিকারত বুকে মেডেলসহ ছবি। তেলেভাজার এই অনন্য শিল্পী যাত্রাপালায় শিল্পদক্ষতা তেমন দেখাতে না পেরে অতিকায় সাইজের বেগুনি নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই দোকানে তেলেভাজার স্বাদ নিতে অনেক বিখ্যাত অভিনেতা আসতেন। উত্তমকুমার সামান্য কিছুদিন উত্তর কলকাতার থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। তিনিও গাড়ি নিয়ে এখানে এসে তেলেভাজা কিনেছেন দু-একবার। তেলেভাজাশিল্পী সুযোগটা কাজে লাগিয়ে উত্তমকুমারের একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সেটা নিজের ছবির তলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তমকুমারের দেওয়া সার্টিফিকেটের জোরে তেলেভাজার বিক্রি বেড়েছিল কি না জানি না। কিন্তু চতুর সাংবাদিক প্রফুল্লরতন গাঙ্গুলি তাঁকে সম্ভবত ভরসা দিয়েছিলেন উত্তমকুমারের সার্টিফিকেটসহ অতীতের যাত্রাশিল্প এবং অধুনা তেলেভাজার এই শিল্পীকে নিয়ে যুগান্তরে ফিচার লিখবেন। প্রফুল্লরতন সেখানে পৌঁছতেই একটা বেঞ্চ পাতা হত। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের মতো প্রফুল্লর পাশে আমিও বিচারপতি হয়ে বসে তেলেভাজার স্বর্গীয় আস্বাদ গ্রহণ করতাম।

নগেন্দ্র কেবিনের আড্ডার সূত্রপাত কিন্তু নগেন্দ্র কেবিনে নয়। এর ঐতিহ্য খুবই পুরাতন। সাংবাদিকদের এই আড্ডা আগে বসত জয়শ্রী কেবিনে। শ্যামবাজার ট্রামডিপো ছাড়িয়ে দু-কদম এগোলে ডান ফুটপাতে যেখানে এখন অজন্তা কোম্পানি জুতোর শো-রুম বানিয়েছে, সেখানে বিড়লাদের জয়শ্রী চায়ের বিপণনকেন্দ্র ছিল। চা তাঁরা জোগাতেন বিনামূল্যে। সম্ভবত সংবাদপত্রের লোকেরা চা খেয়ে গুণগান করবে এমন গোপন ইচ্ছা সদ্যোজাত চা-কোম্পানির ছিল। সাহিত্যিক-সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ছিলেন যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক। তিনিই আমায়

বলেছিলেন,— যৌবনে জয়শ্রী চায়ের আড্ডায় বহুবার গিয়েছেন। এ আড্ডায় টাউন স্কুলের ছাত্র অশোককুমার সরকার (পরবর্তীকালে আনন্দবাজারের সম্পাদক) নিয়মিত আসতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল 'সবুজপত্র' পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের। জংলি গাঙ্গুলি (প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় নামে খ্যাত, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা ও ব্রাহ্মনেতা) নিয়মিত আসতেন এখানে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং জংলি গাঙ্গুলি, দুজনেই উত্তর কলকাতার অধিবাসী। চা তো খেতেনই, এখানে আরেক ভোজ্য ছিল দ্বারিক ঘোষের লুচি আর ছোলার ডাল। ক্রমশ এ আড্ডার চরিত্র বদল হতে থাকে। এটা পরিণত হয় স্বদেশি করা ছাত্রদের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্র। এ আড্ডার অনেকেই উত্তরকালে জেলে গিয়েছেন। এখানকার আড্ডাধারীদের ওপর পুলিশের বিষনজর পড়ে। ফলে আড্ডার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

নগেন্দ্র কেবিনের আড্ডা আমি দেখেছি এবং অংশীদারও ছিলাম। সারা পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় রোয়াকে বসে পাড়ার যুবকরা আড্ডা দিত। সে সব ছিল প্রবল বেকার সমস্যার দিন। আড্ডাবাজদের হীন অর্থে 'রকবাজ' শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল। রকবাজদের শিস দিয়ে মেয়েদের উত্যক্ত করার পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে। উপানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন পুলিশ কমিশনার। তিনি একটি স্পেশ্যাল বাহিনী তৈরি করলেন রকবাজদের আড্ডা ভেঙে দেওয়ার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। লম্বা চুল ছেলেদের মাথায় দেখলেই পুলিশ দিয়ে তাকে ধরে চুল ছেঁটে দেওয়া হত। বাগবাজারের একটি ছেলেকে সবার সামনে একশোবার ওঠবস করিয়ে তার জুলফি (অবশ্যই একপাশের) ছেঁটে হাঁটিয়েছিলেন। ফলে বাগবাজার তো বটেই, সারা কলকাতার বহু রোয়াকি আড্ডা উঠে যায়। উপানন্দের উদ্যোগেই বহু বাড়ির খোলা বারান্দায় ভাঙা কাঁচ ও দেওয়ালে ধারালো পেরেক পোঁতার ব্যবস্থা হয়। কলকাতার রোয়াকি আড্ডার স্বর্গারোহণ ঘটল উপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে।

কলকাতার সমাজজীবনে রোয়াকি আড্ডার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এরই অকালমৃত্যু তো উদার বেকার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষারও অপমৃত্যু। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা তো রোয়াকি আড্ডারই ফসল। রোয়াকি আড্ডা দেখিয়েই তো বাংলা সিনেমার তিনটে শো জনপ্রিয় হয়েছে। আড্ডা উঠে গেল বলেই বাংলা সিনেমা উঠে গেল। আড্ডা বাদ দিলে 'বরযাত্রী'-র মতো ক্ল্যাসিক ফিল্মের থাকে কী? আড্ডা ছিল বলেই 'দাদার কীর্তি' নামক পুরনো ফিল্ম দেখতে এখনও টিভির গায়ে দর্শক লেপটে থাকে। কুমারেশ ঘোষ বই ছেপেছিলেন, 'আড্ডার অভিধান'।

এখন সব বিশ্ববিদ্যালয়েই সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল সাইকোলজি ইত্যাদি নিয়ে পিএইচ ডি করছেন ছেলেমেয়েরা। অথচ, রোয়াকে বসে তাম্রকূট সেবনরত বাগবাজারি বাবুদের তাস-দাবার আড্ডা দেখেননি সেইসব গবেষক।

কলকাতার আর একটিমাত্র আড্ডায় আমি ভাগীদার ছিলাম। 'যষ্টিমধু'-র সম্পাদক কুমারেশ ঘোষের বাড়িতে রবিবার সকালের আড্ডায়। নিয়মিত যাইনি, তবে বহুবার গিয়েছি। জীবনের শুরুতে বহু কার্টুন ও লেখা বের হয়েছে 'যষ্টিমধু'তে। হাসির কাগজ—সেজন্য আড্ডা দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে তবেই রসের ভাণ্ডটি ছুঁতে পারতাম। আমার হাসির লেখার হাতেখড়ি এখানেই। লেখা চণ্ডী লাহিড়ী, আঁকা চণ্ডী ঠাকুর— এই দুই নামে যষ্টিমধুতে ছাপা হত।

আড্ডায় তরুণরা সংখ্যায় বেশি হলেও দু-একজন বয়স্ককেও মাঝে মাঝে দেখতাম। কুমারেশদার বাঁ-হাত ও ডান-হাত ছিলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অঞ্জন। অঞ্জন অকালপ্রয়াত হওয়ার পর হীরেন ওই পাড়ার ছেলে হওয়ার সুবাদে অঞ্জনের স্থানটি দখল করেন। তেলেভাজা, মুড়ি ও কয়েক কেটলি চা এখানে নিয়মিত বরাদ্দ ছিল। যষ্টিমধুর আড্ডা নিয়ে বিশ্বনাথবাবু বই লিখেছেন। তিনি এখনও জীবিত এবং শারীরিকভাবে সক্ষম থাকায়, তিনি পদে পদে আমার ভুল ধরতে থাকবেন। সেজন্য যষ্টিমধুর আড্ডা নিয়ে আদৌ কিছু লিখব না। যষ্টিমধুর আড্ডা থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। যষ্টিমধুর পুজোসংখ্যায় সর্বপ্রথম অন্যের লেখার অলংকরণ করি এবং প্রথম অলংকরণেই রাজশেখর বসুর লিখিত সার্টিফিকেট পাই।

কুমারেশ ঘোষের গাড়ি চেপেই কোনও এক রবিবার সকালে পাইকপাড়ায় সজনীকান্ত দাসের আড্ডায় একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। মোটে একবার—আর তৃতীয় নেত্র উন্মোচনের জন্য সেই একবারই যথেষ্ট ছিল।

আমি কুলগোত্রহীন তরুণ যুবক। সজনীবাবুদের আভিজাত্য ও প্রতিষ্ঠার জগতে প্রবেশের কোনও যোগ্যতাই ছিল না। সেজন্য চোরের মতো একপাশে বসে অপলক দৃষ্টিতে দু-কান খোলা রেখে সবকিছু দেখে ও শুনে যাচ্ছিলাম।

সেদিনেব 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসেছিলেন। আরও দু'-একজন বিখ্যাত ব্যক্তি একটু পরে আসবেন। সজনীবাবু তাঁর সমবয়স্ক বীরেন ভদ্রের সঙ্গে আলাপচারিতায় যেসব আভিধানবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশের রক্ষণশীল হাওয়ায় প্রতিপালিত আমার সদ্য কৈশোর পেরোনো কানে সেসব বড়ই লজ্জাকর মনে হচ্ছিল। সজনীবাবু

কুমারেশদাকে বললেন,—তোমার ছেলেটিকে পিছনের ঘরে বই দেখতে পাঠাও। আমাদের কথা ওর ভালো লাগবে না। পিছনের ঘরে চালান হলেও নিষিদ্ধ শব্দাবলি শোনার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হয়েছিলাম।

আজকের পরিশীলিত ভদ্রকর্ণে রুচিহীন মনে হলেও বলি, সজনীকান্ত দাশ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দুটি অশালীন শব্দ নিয়ে সিরিয়াস আলোচনায় মত্ত হলেন। 'মাগি' শব্দটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিবর্তনের পথে এগোতে এগোতে নতুন অর্থ পেয়েছে তাই নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতে শুরু করলেন তাঁরা। যতক্ষণ তাঁরা আলোচনা করলেন একবারের জন্যও কোনও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। সজনীবাবুকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পুরনো কলকাতায় 'মাগি' শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের যত উদাহরণ দিয়েছিলেন, লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে।

বাঙালি মননের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তার সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যাচর্চায়। স্বভাবত আড্ডার প্রাণকেন্দ্র সাহিত্যের সূতিকাগার বইপাড়ায় মিত্র ও ঘোষের আড্ডারও আগে এম সি সরকারের বইয়ের দোকানের বৈকালিক আড্ডার কথা আলোচনা না করলে আড্ডার আদিপর্বটা বাদ পড়ে যাবে। এম সি সরকারের আড্ডার কাহিনি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সুধীর সরকারের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে অনেকটাই ধরা পড়েছে। তিনি একেবারে পরিণত বয়সে আত্মজীবনী লিখেছেন—কিন্তু সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে পরোক্ষে তাঁদের দোকানের ঐতিহাসিক আড্ডার বিবরণ। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতো সেই আত্মজীবনী থেকেই অংশবিশেষ আলোচনা করব। ভানুবাবু এ নিয়ে খুব রসালো আলোচনা করেছেন তাঁর 'কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর' বইতে। তাঁর লেখা হল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে এম সি সরকারের বৈকালিক আড্ডা ছিল সবচেয়ে অভিজাত। তারাশঙ্কর এরকম একটি দিনের বর্ণনা করেছেন 'শনিবারের চিঠি'তে।— 'সাহিত্যক্ষেত্রের এই একটি মানুষ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)। জ্যেষ্ঠের উদারতা, জ্যেষ্ঠের স্নেহ দিয়ে বসে আছেন এম সি সরকার এন্ড সন্সের দোকানের সেই কোণের দিকে। মোটা পুরু লেন্সের চশমা পরে, নিবাত নিষ্কম্প একটি গিরিশৃঙ্গের মতো ধ্যানমগ্ন। তাঁর এদিকে পশ্চিমে বসে আছেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ থেকে প্রমথ, গজেন্দ্র বিমল প্রমুখ দুতিনজন, অথবা কয়েকজন। সামনে বসে আছে বিশু (বিশু মুখুজ্জে), তার পাশে কোনও দিন থাকেন তুষারবাবু অথবা অন্য কেউ। আগে থাকতেন শুভ্রকেশ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়— কেদারদা।'

এম সি সরকারের পঞ্চাশ-ষাট বছরের আড্ডায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ সাধকরা আসা-যাওয়া করেছেন। এদের অনেককেই আমি দেখিনি। কিন্তু সুধীরবাবুর আত্মজীবনী রচনার গুণে মনে হয়, আমিও চেয়ারটাকে সরিয়ে পিছনে বসে কৌতূহলী দ্রষ্টা হিসেবে সব কিছু দেখে যাচ্ছি।

সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতা দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন। তাঁর স্নেহলাভ আমার মতো এক গ্রাম্য-কিশোরের জীবনে দুর্লভ ঘটনা। আমার লেখা ছড়া ও ছবি পাঠ্য-অপাঠ্য নির্বিশেষে বিশুদা ছাপতেন। লেখা দেওয়ার নাম করে ভয়ে ভয়ে এম সি সরকারে যেতাম। একটু পরেই বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এসে চেয়ারগুলি দখল করবেন। আসতেন কাশফুলের মতো এক রাশ সাদা চুল উড়িয়ে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং দশাসই সুনীতিবাবু। এঁদের চিনতাম। দূর থেকে প্রণাম করে ধন্য হওয়াই ছিল অখ্যাতজনের বিধিলিপি।

সুধীর সরকারের আত্মজীবনীতে দেখি আরও বহু বিশিষ্টজনের নাম, যাঁরা আমি কলকাতায় আসার আগেই পরলোকগত হয়েছেন কিংবা এতই বৃদ্ধ যে আসতে অক্ষম। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের বাবা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন খুবই লম্বা-চওড়া চেহারার অধিকারী। তাঁর বই 'তিব্বত ফেরৎ তান্ত্রিক' (দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত) তখন আমার মুখস্থ। ভালো ভালো বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ করে ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। 'এ টেল এব টু সিটিজ', 'হাঞ্চব্যাক অব নতরদাম' পড়ে আমার কিশোরমন মুগ্ধ। কিন্তু এম সি সরকারে দূর থেকে নৃপেনবাবুর রোগা খিটখিটে চেহারা দেখে তেমন ভক্তি হল না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত গাঙ্গুলি (জংলিদা), হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, এঁরাও ছিলেন বিভিন্নসময়ে ওই আড্ডার পৃষ্ঠপোষক।

এঁদের মধ্যে একমাত্র জংলিদার সঙ্গে আমার পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যখন শেষ বয়সে তিনি 'দৈনিক জনসেবক' পত্রিকার সম্পাদক হন। খুব ডানপিটে ছিলেন যৌবনে সেটা একটু কথা বললেই বোঝা যেত।

এম সি সরকারের আড্ডার আর একজনের সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল— তিনি অনুবাদজগতের খ্যাতকীর্তি মানুষ ভবানী মুখোপাধ্যায়। শিবরাম চক্রবর্তী কোনওদিন ওখানে আড্ডা দিতেন না, কিন্তু রোজই যেতেন। মৌচাকের জন্য লেখা জমা দিয়ে,সুধীরবাবুর কাছ থেকে টাকা নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা

করতেন। টাকা পকেটস্থ হলেই শিবরাম সেখান থেকে সরে পড়তেন। শিবরামদাকে ধরেই আমি এম সি সরকারে গিয়েছি বহুবার। কিন্তু সব বিখ্যাতজনকেই দেখেছি দূর থেকে।

এম সি সরকারের আড্ডা ছিল দু'পয়সা রোজগারের সংস্থান আছে এমন মানুষদের। দরিদ্র শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রবাসীর মালিক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বা অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক তুষারকান্তি ঘোষের পাশে মানাত না। সেটা আমায় শিবরামদা নিজেই বলেছেন।

আড্ডা দেয় কারা? যারা নিজ হাতে চাষ করে, জমিতে ফসল ফলায়, তারা আড্ডা দেয় না। যাদের হাতে ওড়াবার মতো অঢেল সময়. তারাই আড্ডা দিতে পারে। আড্ডা পরশ্রমজীবীর বিনোদন।

পরিশেষে নিজের কথা বলি। আমি নিজে আড্ডার প্রোডাক্ট নই। আমি বিশ্বাস করি না, আড্ডার মধ্য দিয়ে কোনও বৃহৎ শিল্পী শিল্পকর্ম করেছেন বা কোনও মহৎ কবিতা লিখতে পেরেছেন। সৃষ্টিমাত্রই একক সাধনার ফসল। যখন কার্টুন আঁকি, একলা আঁকি। একলা ভাবি। রেফারেন্স বই একলা ঘাঁটি। আড্ডাধারীদের সাজেশন প্রায়ই আমার চিন্তার স্তর ছুঁতে পারে না। আনন্দবাজারে চাকরি করাকালে আমি ও আমার সহকর্মী হিরন্ময় কার্লেকর, হরি জয় সিং, নিরঞ্জন হালদার কফিহাউসের লর্ডসে প্রচুর কফি খেয়েছি। তিন সহকর্মীই সাংবাদিকতায় শীর্ষ ছুঁয়েছেন। আড্ডা দিয়ে নয়। প্রচুর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। আড্ডা হল জমিদারিপ্রথার হ্যাংওভার। উঠে যাওয়াই ভালো।



সাহিত্যিকদের আড্ডা

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে একটা সময় দুটি আড্ডা ছিল। একটি এম সি সরকার এন্ড সন্স-এর, আর একটি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স-এর। আমি যখন প্রকাশনা জগতের শিক্ষানবিশিতে প্রবেশ করি, ১৯৪৯ সালে, তখন দেখতাম— এম সি সরকার-এ অপেক্ষাকৃত প্রধান ও পক্ককেশদের ভিড়। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মাখনলাল সেন প্রমুখ মানুষের আড্ডা এম সি সরকার এন্ড সরকার-এর কর্ণধার সুধীর সরকার মশাইকে ঘিরে।

প্রথম দিন গিয়ে কাজে বসেছি। আমার সিনিয়র দাদা কাজ বোঝাচ্ছেন আমাকে। কাউন্টারের পাশে ঘরের মধ্যে আমরা। কাউন্টার অর্থে তখন দুটো লম্বাটে টেবিল জোড়া দেওয়া। ১৯৪৯ সালে বইপাড়ার অধিকাংশ দোকানই ছিল এইরকম। কাউন্টারের ওপাশ, অর্থাৎ সামনে ক্রেতারা আসেন। সামনে দুটো দরজা।

কাজ বুঝে নিচ্ছি সহকর্মী দাদার কাছে। এমন সময়ে বাঁদিকের দরজায় এসে দাঁড়ালেন এক রাশভারী প্রৌঢ় ব্যক্তি, গায়ে সুতির লং কোট, সেই গরমের মে মাসেও। ঝোড়া গোঁফ, এক হাতে একটা থলে, আরেক হাতে বেতের ছাতা। গম্ভীরভাবে সহকর্মী দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন,"হ্যাঁরে , সব খালি খালি কেন? গজেনকে দেখছি না।"

দাদা উত্তর দিলেন,"মামা তো হরিদ্বারে গেছেন, মাকে দেখতে।"

ভ্রু কুঞ্চিত করে, ছাতাটা কাউন্টারের দরজার এক পাল্লায় টাঙিয়ে, কাউন্টারের টেবিলে উঠে বসতে বসতে বললেন,"ধুস্, তাহলে আজকের আড্ডাই তো মাটি—

বাজারে নেই খরিদ্দার/ গজেন গেল হরিদ্বার।"

মুখে মুখে তাৎক্ষণিক এইরকম কবিতা, হোক না দু'লাইনের, বানানো হয়ে যায় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,"ছেলেটি নতুন দেখছি।"

সহকর্মী দাদা বললেন,"এই তো ভানু, মামিমার ছাত্র। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। আজই জয়েন করল। ভানু, প্রণাম কর্, ইনি কবিশেখর কালিদাস রায়।"

সেই প্রথম দিনই আমার আড্ডার জগতে ঢুকে পড়া। মিত্র ও ঘোষ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষকে ঘিরে তখনকার দিনের অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লেখকরা আড্ডা দিতেন। প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। বর্ষীয়ান কবিশেখর কালিদাস রায়— এঁদের সকলের কালীদা এলে আড্ডার মধ্যমণি হয়ে উঠতেন। আরও আসতেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ থেকে সুশীলকুমার দে। উত্তর কলকাতার সজনীকান্ত দাসও ক্রমে এসে যোগ দিতেন। দ্বারভাঙা থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও ভাগলপুর থেকে বনফুল তথা ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে পড়লে এই আড্ডাতে আসবেনই, একথা সবাই জানতেন।

একদিকে কাউন্টারের ওপরে খবরের কাগজ পেতে ঢালা হয়েছে মুড়ি, ডালমুট, নারকেলের টুকরো। আড্ডা চলছে, আর সেইসঙ্গে সবাই এক থাবা করে মুড়ি তুলছেন। ফুরিয়ে গেলে আবার লোক দৌড়ত— মুড়ি ডালমুট আনতে। কালিদাসবাবু চেঁচিয়ে বলতেন,"ওরে এবার বলে দিস, ডালমুটে বাদাম যেন predominate করে। ওরা বাদাম বড় কম দেয়।" এর সঙ্গে সোনায় সোহাগা হত যেদিন তেলেভাজা, বেগুনি, আলুর চপ যোগ হত।

এই কাউন্টারের ওপর খবরের কাগজে ঢালা মুড়ি ডালমুট কে না খাচ্ছেন— কালিদাসবাবু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধ সান্যাল, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে গোপদেব শর্মা, তারাশঙ্কর। বনফুল মাঝেমধ্যে এসে পড়লে অংশ নিতেন। নিতেন না বা নিলেও খুব অল্প অংশ নিতেন কবি কৃষ্ণদয়াল বসু। তিনি মিত্র মেন ইন্সটিটিউশনের বাংলার শিক্ষক, কবিশেখর কালিদাস রায়ের ছাত্রও বটে।

সুনীতিবাবু এই আড্ডার নাম দিয়েছিলেন 'মুড়িক্লাব'।

কৃষ্ণদয়ালবাবু ছিলেন পানিং-এ সিদ্ধহস্ত, সিদ্ধজিহ্বাই বলা উচিত। আড্ডার একজন কথায় কথায় বললেন,"ডাক্তাররা নুন খেতে বারণ করেন, আমি তো রোজ ভাতের পাতে নুন খাই।"

কৃষ্ণদয়ালবাবুকে আমরা সবাই মাস্টারমশাই বলতাম, বলে উঠলেন,"আপনি তো মশাই তাহলে ফিরোজ খান নুন!"

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। কারণ তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন।

তখন আমাদের প্রকাশনার একটাই কাউন্টার, সেখানেই অফিস, আবার সেখানেই আড্ডা। বই এসে জমা হয় দপ্তরি বাড়ি থেকে, কখনও বেঞ্চিতে, কখনও মেঝেতে। এক এক সময় তিলধারণের জায়গা নেই মনে হয়, কিন্তু তারই মধ্যে আড্ডা চলে অবলীলায়। কখনও এক চেয়ারে দুজন, কখনও বইয়ের গাদার ওপরেই বসে পড়েন কেউ কেউ। একেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,"গজেনবাবুর তেঁতুলপাতায় ন'জন থেকে আঠারোজন।"

আড্ডায় শুধু যে হাসিঠাট্টা হত তাই নয়, মাঝে মধ্যে জ্ঞানগম্ভীর আলোচনাও হত। ছাত্রদের ওপর পাঠের বোঝা কমানো উচিত না বাড়ানো উচিত, তা নিয়েও বিপুল তর্ক।

সুনীতিবাবু বলতেন, 'ইংরেজি শিখতে হয় মোটা নেসফিল্ডের গ্রামার পড়ে, ব্যাকরণই বা পড়বে না কেন। কালিদাসবাবু, কৃষ্ণদয়ালবাবু ব্যাকরণের চাপ কমানোর পক্ষে ছিলেন। তাঁদের মত ছিল, সাহিত্য পড়তে পড়তেই ভাষা তৈরি হবে। ব্যাকরণ হচ্ছে--- নদীতে দুই পাড় বাঁধানোর মতো।"

এই তর্ক চলতেই থাকত আড্ডার শেষ সময়কাল পর্যন্ত। তখন শনিবারের চিঠির সম্পাদকীয়তে প্রায়ই বিতর্ক উঠত। কোন সাহিত্যিক কোন ইংরেজি সাহিত্য থেকে কোন অংশ অবলীলায় অনুবাদ করে নিজের লেখায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এসব তথ্য থাকত উদাহরণ দিয়ে।

এইসব প্রসঙ্গে একদিন কালিদাসবাবু বললেন,"ওরে তোরা যদি ওসব বলিস তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও পদাবলী থেকে ছন্দ ও ভাব কম নেননি।"

প্রমথবাবু বললেন,"কীরকম কালিদা?"

কালিদাসবাবু বললেন,"তুইই ভালো বুঝবি। অবশ্য একে ঠিক কুম্ভীলক কাজ বলে না। ইংরেজিতে অ্যাসিমিলেশন কথাটা আছে না, সেইরকম অনেকটা— দ্যাখ না—

চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী।

কবিগুরু লিখছেন,

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী

আবার দ্যাখ---

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী

তেমনি—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী

এইসব আলোচনায় রাত গড়ায়। উঠতে গিয়ে কালিদাসবাবুর দেখেন দরজার মাথায় রাখা তাঁর ছাতাটা উধাও। কেউ চক্ষুদান করেছে।

কালিদাসবাবু সক্ষোভ বললেন,"এইজন্য গুরুনিন্দা পাপ। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের গুরুই। সেই পাপে ছাতাটা গেল। কতদিনের ছাতাটা আমার।"

আড্ডায় সেদিন বিমল ঘোষও ছিলেন, তখনকার আনন্দমেলা পত্রিকার পরিচালক— মৌমাছি। মৌমাছি বললেন,"কালিদা আপনি এরই ওপর একটা কবিতা লিখে দিন। সে টাকায় নতুন ছাতা হয়ে যাবে।"

কালিদাসবাবু বললেন,"তুই টাকা বড় কম দিস, তাতে নতুন ছাতা হবে না।"

বিমলবাবু বললেন,"না, না, এটাতে বেশি দেব। আপনি লিখে দিন।"

কিছুদিন পরেই আনন্দমেলায় কালিদাসবাবুর কবিতা বেরোল— ছত্রবিয়োগ। কবিতাটি পরে বিভিন্ন পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়েছে। কালিদাসবাবুর নতুন ছাতার দাম উঠে গেল।

এম সি সরকারের আড্ডায় সেখানকার কর্ণধার সুধীর সরকার মশাই মধ্যমণি হয়ে চুপচাপ কাজ করে যেতেন, আর তাঁকে ঘিরে চলত আড্ডা। সে আড্ডায় থাকতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, কেদার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মাখনলাল সেন। মাঝেমধ্যে মিত্র ও ঘোষের আড্ডাধারীরাও ওখানে যেতেন কেউ কেউ, প্রমথনাথ বিশী, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ। ওখান থেকে এখানে আসতেন কেউ কেউ।

প্রমথবাবু দুটো আড্ডার নামকরণ করেছিলেন। এম সি সরকারে যেহেতু প্রবীণদের আড্ডা সেজন্য ওই আড্ডার নাম দিয়েছিলেন— হাউস অব্ লর্ডস। কমবয়সিদের আড্ডা বলে মিত্র-ঘোষের আড্ডার নাম হল— হাউস অব্ কমন্স।

একদিন আমি কোন কাজে এম সি সরকারে গেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি প্রমথ বিশী মাখনলাল সেনকে জিজ্ঞেস করলেন,"মাখনবাবু, আপনাকে যদি কেউ একটি পিস্তল আর দশটি গুলি দেন, তাহলে আপনি কাকে কাকে মারবেন?"

সকলেই উদগ্রীব উত্তর শোনার জন্য। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দাঙ্গা-দুর্নীতিতে দেশ তখন উত্তাল। আমিও কৌতূহলী হয়ে কাজ ভুলে দাঁড়িয়ে গেছি, কী উত্তর দেন মাখনবাবু। অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে মাখনবাবু উত্তর দিলেন,"দশটায় কুলোবে না, কুড়িটা চাই, তবেই তালিকা দেব।"

গোটা আড্ডা হো হো করে হেসে উঠল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গুণগ্রাহীদের অটোগ্রাফে প্রায়ই লিখতেন— গতিই জীবন, গতির দৈন্যেই মৃত্যু। একদিন কবিশেখর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিভূতিবাবুর লেখা দেখে বললেন,"তুই এত পাকামো করিস কেন রে? গতিই জীবন কেন? বসে থাকলে কত চিন্তা করা যায়, বল তো!"

বিভূতিভূষণ হেসে বললেন,"কালিদা, আপনি একবার বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন কী আনন্দ। বসে বসে আপনি একেবারে গৃহকীট হয়ে গেছেন।"

কবিশেখর বললেন,"দূর, একবার বেরিয়ে কী বিপত্তি। মধুপুরে সবাই মিলে গেছি। গামছা পরে বাথরুম ইত্যাদিতে গেছি। সেইসময় কয়েকজন এসেছে অটোগ্রাফ নিতে। তা বিশু মানে বিশ্বপতি চৌধুরী ওই ছেলেমেয়েগুলিকে বলে, 'কালিদা ওই পুজোর ঘরে আছে, বলে বাথরুম দেখিয়ে দিলে। বলে দিলে, ওখানে দাঁড়ান, উনি পুজো করে বেরিয়ে এলেই অটোগ্রাফ চাইবেন।' বোঝ গেরো। আমি গামছা পরে বেরোতেই— চোখে চশমা নেই, অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। কী অবস্থা আমার!"

আড্ডার সবাই আমোদ পাচ্ছেন। কালিদা বলে চললেন,"বিশু কি কম জ্বালিয়েছে। এক সভায় যেতে দেরি হচ্ছে, ঘোষণা করে দিল, কালিদার আসতে দেরি হচ্ছে, কারণ পড়ে গিয়ে তাঁর হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙেছে।

সভায় পৌঁছতে সবাই আমায় জিজ্ঞেস করে— হাঁটু কেমন?

অসমঞ্জবাবুকে মানপত্র দেওয়া হবে, বিশু অসমঞ্জর পিছনে একটা বড় মানকচুর পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বলল,"এত ভালো মানপত্র কেউ পেয়েছে?"

আড্ডার জীবন ছিল এমনই আনন্দ, উচ্ছ্বাসে ভরা।

কালিদাসবাবু শরৎসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল করতলে আমলকীবৎ। তিনি বলতেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শুধু প্রেমতত্ত্ব নয়, গভীর তন্ত্রশাস্ত্রের কথাও আছে। 'বলিবি উত্তরে, যাইবি দক্ষিণে, বাঁধিবি পশ্চিমে বাসা'— এসব গভীর তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— এ মানুষ সাধারণ মানুষ নয়, প্রতি মানুষের মধ্যে স্থিত ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের পাঠক মন জয়ের জাদু কোথায় লেখকদের বুঝিয়ে বলতেন। এইভাবেই একদিন কথায় কথায় একটি মাসিক পত্রিকা বার করার কথা বলা হল— সাহিত্য পত্রিকা। তাইতেই 'মাসিক কথাসাহিত্য' পত্রিকার জন্ম।

আড্ডার টান এমন ছিল, অনেক সময় লেখকরা ভুলেই যেতেন সেদিন বইপাড়া বন্ধ না খোলা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খোলা ভেবেই চলে এসেছেন, ভাইকেও বলেছেন আসতে। কাউন্টার বন্ধ। সামনের রকে বসে অপেক্ষা করছেন ভাইয়ের জন্য। সজনীকান্ত দাস কী দরকারে এসেছিলেন সংস্কৃত কলেজে। তিনি বিভূতিবাবুকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার?" না, ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনিও বসে গেলেন বিভূতিবাবুর পাশে। কিছুক্ষণ পর সরোজ রায়চৌধুরী এলেন, তিনিও জিজ্ঞাসাবাদ করে বসে গেলেন পাশে। বিভূতিবাবু লিখছেন পরে তাঁর ভাইকে—তুমি এলে না, এলে দেখতে পেতে, ওই রকে বাংলাসাহিত্যের কয়েকজন নামী মানুষ বসে অপেক্ষা করছিলেন তুমি আসবে বলে।

এই আড্ডা কিছুদিন পরে বড় ধাক্কা খেল বিভূতিভূষণের হঠাৎ তিরোধানে। তাঁর তিরোধানে সাহিত্যিকরা খুব আঘাত পান। বিভূতিভূষণ সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর স্মরণসভা হয়েছিল সিনেট হলে। সেদিন সিনেট হল লোকে ভরে গিয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন অতুল গুপ্ত। স্মরণসভায় এত লোক একটা বিস্ময়ের ঘটনা ছিল সেকালে। বিভূতিভূষণের একমাত্র পুত্র তারাদাসের বয়স তখন মাত্র তিন বছর।

আড্ডায় বর্ষার দিন হলে দেখা যেত কাউন্টারের বাইরে ক্রেতা নেই, ভিতরে সাহিত্যিকদের ভিড়। দশ ফুট বাই দশফুট ঘরে ঘেঁষাঘেষি করে বারো-তেরোজন কবি সাহিত্যিক। কবিশেখর যথারীতি কাউন্টারের ওপরে। ছাতা দরজার পাশে রেখে গল্প করছেন। প্রবোধবাবুর হঠাৎই ইচ্ছে হল কবিতা আবৃত্তি করবেন। উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলেন— এবার ফিরাও মোরে। যে সামান্য দু-একজন থাকতেন,

তাঁরাও আর নড়েন না। বিভূতিভূষণ এই দেখেই বলেছিলেন,"গজেনবাবুর তেঁতুলপাতায় নয়জন তো নয়, তেরোজন।"

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত আড্ডায় এলে এটা-সেটা কথার পর প্রায়ই গান ধরতেন— 'কলকাতা ভুলে ভরা' এবং আরও সব হাসির গান। ওঁর শিষ্য নলিনীকান্ত সরকার আসতেন পণ্ডিচেরি থেকে। আড্ডায় কোনও এক লেখককে বলছেন,"তোমাকে বললাম এত করে, তুমি তো আর পণ্ডিচেরি গেলে না।"

তার কিছুদিন আগে শ্রীঅরবিন্দ দেহ রেখেছেন।

লেখকটি বলেন,"আর অরবিন্দ নেই, মেন অ্যাট্রাকশনই তো ফুরিয়ে গেল নলিনীদা।"

নলিনীদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,"ভাই মেন অ্যাট্রাকশন নেই তো কি হয়েছে, উইমেন অ্যাট্রাকশন তো আছে।"

আড্ডার হো হো হাসির মধ্যে একজন বললেন,"নলিনীদা আপনাকে শ্রীঅরবিন্দ কিছুই পালটাতে পারেননি তো দেখছি।"

নলিনীদা বললেন," শ্রীঅরবিন্দর তো ওইটাই বাহাদুরি। আমার স্বভাব ইনট্যাকট রেখেই আমাকে পালটে দিয়েছেন।"

এই দ্রুত চট্‌দলদি উত্তর বা কুইক রিপোর্ট ছিল আড্ডার বড় সম্পদ। এক শীতের দিনে প্রমথবাবুকে তাঁর এক বন্ধু এসে জিজ্ঞাসা করলেন,"বিশীদা, আপনি শান্তিনিকেতনে কতদিন ছিলেন?"

বিশীদা বললেন,"উনিশ বছর। সেখানেই যা কিছু শিক্ষা ও লেখা শুরু।"

বন্ধু বললেন,"গান শিখেছেন?"

বিশীদা বললেন,"না, ওই গানটাই শেখা হয়নি, নাটকে অভিনয় করেছি।"

বন্ধু খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন,"উনিশ বছর আছেন আর গান শেখেননি?"

একথা সেকথা বলছেন, আর বিশীদা গান শেখেননি বলে আফসোস করছেন। তারপর উঠতে চাইলেন বাড়ি যাবেন বলে। বিশীদা নিরীহ মুখে বললেন, "কোথায় বাড়ি?"

বন্ধু বললেন, "দমদমে।"

বিশীদা নিরীহতর মুখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "নিজে করেছেন?"

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে সগর্বে বললেন,"না, না, আমাদের তিন পুরুষের বাড়ি।"

বিশীদা আরও নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,"আপনি এরোপ্লেন চালাতে শিখেছেন?"

বন্ধু ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন,"না তো, এরোপ্লেন চালাতে শিখব কেন?"

বিশীদা এবারে হেসে ফেলে বললেন,"তাহলে আমি উনিশ বছর শান্তিনিকেতনে থেকে গান না শিখে কী আর অপরাধ করেছি, আপনি তিন পুরুষ দমদমে থেকেও যখন এরোপ্লেন চালাতে শেখেননি।"

ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়ে বললেন,"সত্যি বিশীদা, আপনি এভাবে আমাকে বসিয়ে দেবেন ভাবতেও পারিনি।"

আড্ডায় অচিন্ত্যবাবু এলে একথা-সেকথার পর ঠাকুর ও শ্রীমায়ের প্রসঙ্গ চলে আসত অবধারিতভাবে। তখন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব লেখকই আড্ডায় আসতেন কোনও-না-কোনও সময়ে। কোনও বন্ধু তাঁর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করলে বলতেন, "এক সময়ে ইউরোপের সব রাস্তা রোমে যেত, আমার এখন সব আলোচনা ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে পৌঁছে যায়।"

এই আড্ডাতেই প্রমথনাথ বিশী একটি খাতা চালু করেন— যার যা ইচ্ছা লিখে রাখবেন। খাতা খুললে চল্লিশ বছর আগের স্বর্ণময় দিনগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ১৯৬৩ সালে হয়েছিল সেই খাতার পত্তন। খাতার প্রথম দুটি ছত্র আজও অম্লান--

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম,
সেদিন শোনাবে তাহা কবিত্বের সম।

আর কয়েকটি পৃষ্ঠার পর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কয়েকটি ছত্র—

জীবন যখন তৃষ্ণাকাতর কিংবা বীততৃষ্ণ
স্মরণ কর শরণালয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

উত্তর কলকাতায় ছিল 'বিজলী' পত্রিকার অফিস। সেখানেও বারীন ঘোষ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখের আড্ডা ছিল। একদিন তনুবাবু নামে এক হিন্দিভাষী সাহিত্যিক এসেছেন। তবে বাংলাও জানেন। কী কথায় কথায় প্রেমাঙ্কুরবাবু ও তনুবাবুর মধ্যে তর্ক বাধল। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বড়, না তুলসীদাস বড়। দুজনেই নানা উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের নিজের পছন্দের কবিকে বড় করতে লাগলেন। তর্ক গিয়ে দাঁড়াল শেষে বাঙালি বড়, না বিহারী বড়। শেষে প্রেমাঙ্কুরবাবু বললেন,"আমি উলঙ্গ হয়ে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারি, তুই পারিস?"

তনুবাবু বললেন,"তুই পারিস? বাঙালি কেবল মুখেই তড়পাতে পারে।"

প্রেমাঙ্কুর বললেন, "দ্যাখ তবে।" বলে জামাকাপড় খুলে ধুতিটা পাগড়ির মত মাথায় বেঁধে লাঠিটা কাঁধে ফেলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত ঘুরে এসে তনুবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "কী, বাঙালি পারে না?"

তনুবাবু মাথা নিচু করে বসে রইলেন। অতঃপর তুলসীদাস অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল।

১৪ নম্বর পার্সিবাগান রোডে গিরীন্দ্রশেখর বসুর চেম্বার। প্রতি রবিবার সেখানে আড্ডা বসত। এই আড্ডা ১৪ নম্বরের আড্ডা নামে পরিচিত। এখানে আসতেন রাজশেখর বসু তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কোয়ার্টার থেকে। গিরীন্দ্রশেখর তো থাকতেনই, বড়দা শশিশেখর কলকাতায় থাকলে উপস্থিত হতেন। আর থাকতেন শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি।

এখানেই তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর— চার ভাই-ই বেশ রসিক। রাজশেখর বা পরশুরামের সাহিত্যের তো তুলনা নেই। শশিশেখরও রসের সাগর, একখানি বই লিখেছেন, যার জুড়ি নেই— 'যা হয়েছে যা শুনেছি'। তাঁদের পিতৃবিয়োগের পর কানাঘুষো, এবার সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাধবে। শশিশেখর খাবার টেবিলের চারটে চেয়ার সব উলটো দিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। আত্মীয়স্বজনরা খবর নিতে এসে দেখে অবাক হয়ে শুধোচ্ছেন, চেয়ারগুলো এভাবে রাখা কেন?

শশিশেখর বললেন, "বুঝলেন না, সম্পত্তি নিয়ে জোর বিবাদ তো, ভায়ে ভায়ে মুখ দেখাদেখি নেই, সেজন্য সবাই উল্টো মুখে খায়।"

বেগতিক দেখে কেউ আর ওঁদের ঘাঁটাননি। শশিশেখরের বইটি পড়লে মনে হবে আড্ডার গল্প যেন টাইপ করে সাজিয়ে ছাপার অক্ষরে ধরে দিয়েছেন।

আড্ডার মধ্যে অনেকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। রাজশেখর বসুকে কারও বিজ্ঞানমনস্ক প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করল। জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা রাজশেখরবাবু, আমরা এই যে রোজ ব্লেড পুরোনো হলে ফেলে দিই, এগুলো নিয়ে কোনও কাজ হতে পারে না?"

রাজশেখরবাবু গম্ভীর মুখ করে বললেন, "মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেখতে পারেন, যদি গোলাপ গাছ হয়।"

আর একজন প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, পুরাণে দশ আদিত্য আছেন জানি, বসুরা কারা?"

রাজশেখরবাবু বললেন,"আপাতত চার বসুর সন্ধান দিতে পারি— শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর।"

এক-একজন মানুষ ছিলেন, যাঁরা আড্ডা পকেটে নিয়ে ঘুরতেন। তা, দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের তো শার্ট-পাঞ্জাবির বালাই ছিল না, আড্ডা তাঁর ট্যাকে থাকত। তদানীন্তন রেডিও অফিসের স্টেশন ডিরেক্টর স্টেপলটন কী হাসিঠাট্টায় দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন, oh, you are a devil."

দাদাঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "সাহেব, আমাকে মাথা কাটলেও অর্থাৎ D বাদ দিলেও evil কিন্তু থেকেই যাবে।"

তখন তো রেডিও স্টেশন ছিল গার্স্টিন প্লেসে। একদিন নেমে দেখেন এক তরুণ ঢুকছেন। প্রায়ই দেখেন, আলাপ নেই। আসলে তিনি আজকের বিখ্যাত গায়ক রামকুমার। দাদাঠাকুর বললেন,"তুমি কী করো?"

রামকুমার উত্তর দিলেন,"আজ্ঞে আমি গাই।"

দাদাঠাকুর বললেন,"তা, সকাল বিকেল কত সের দুধ হয়?"

এই ছিলেন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

হাসির গানের গায়ক নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন দাদাঠাকুরের ভাবশিষ্য। তিনিও রেডিওতে ছিলেন একেবারে আদিযুগ থেকেই। তাঁর চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। তখন তো আজকের মতো একদিন-দু'দিনের অপারেশন হত না। বেশ কিছুদিন লাগত। ছানি কাটানোর পর মোটা লেন্সের চশমা পরতে হত।"

দাদাঠাকুর নলিনীদাকে দেখতে গেছেন। জিজ্ঞেস করলেন,"হ্যাঁরে, এই ছানি কাটানোটা কী ব্যাপার রে?"

নলিনীদা বললেন,"আসলে জানেন কি দাদাঠাকুর, ঈশ্বর-প্রদত্ত চোখের লেন্সটা খারাপ হয়ে গেলে সেটা কেটে বাদ দেওয়া হয়। তার বদলে মোটা কাচের চশমা পরে কাজ চালাতে হয়। অনেকটা পা কাটা গেলে যেমন ডাক্তাররা কাঠের পা করে দেন, তেমন অনেকটা।"

দাদাঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন,"কাঠের পা আসল পায়ের থেকে অনেক ভালো রে।"

নলিনীকান্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন,"একথা কেন বলছেন দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর বললেন,"কাঠের পায়ে মশা কামড়ায় না।"

প্রমথনাথ বিশীও ছিলেন এমনই আড্ডাবাহক মানুষ। খুব শীতকাতুরে ছিলেন। শীতে পাঁচ-ছ'টা জামা পরতেন। ঠান্ডা-সুতি গরমসহ। কোনও ছাত্র ক্লাসে জিজ্ঞেস করত হয়তো, "স্যার, আজ ক'টা জামা পরেছেন?"

তিনি অম্লানবদনে কোটের হাতা উল্টে দেখাতেন, "গুনে দ্যাখো।"

হাতার নীচে দেখা যেত চারটে। বলতেন, "ভেতরে আরও দুটো গেঞ্জি আছে।"

সৈয়দ মুজতবা আলীও ছিলেন এইরকম আড্ডাবাজ মানুষ। তাঁর কাছে একই সঙ্গে রসরসিকতা ও জ্ঞানভাণ্ডারের সিন্দুক খুলে যেত। অবশ্য সব আড্ডাতেই তাই হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী অর্থাৎ নীরদ. সি. চৌধুরী জানতেন না এমন বিষয় বোধহয় ছিল না। আর রসিকতাতেও তেমনই দড়, তাঁর তীক্ষ্ণ প্রাখর্য সত্ত্বেও।

নীরদবাবুর বাড়িতে আছি। কথায় কথায় অমিয়া বৌদি বললেন, "ভানু, তোমার এই দাদাটি কি কম পাজি, জানো?"

আমি বললাম, "কেন, কী করেছেন?"

বৌদি বললেন, "বাইরে গোলাপবাগান তো দেখেছ? উনিই মাটি খোঁড়েন, সার দেন। এক মেমসাহেব একদিন দেখে বলে, 'বাঃ বেশ গোলাপ ফুটিয়েছ তো! তা কত মজুরি পাও?"

ভেবেছে উনি মালি। তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বৌদি বললেন, "ও উত্তর কী দিয়েছে জানো? ল্যান্ডলেডি আমাকে মজুরি kind-এই দেয়। she allows me to sleep with her."

সে মেমসাহেব তো রেগেমেগে পাশের প্রতিবেশী সাহেবকে ডেকে আনেন। বলেন, 'এই ইন্ডিয়ান আমাকে খারাপ ইঙ্গিত করেছে।' তারপর ওর মুখে সব শুনে সাহেব তো হেসে কুটিপাটি। সাহেব বললেন, 'তুমি ওকে চেনো না? উনি নীরদ. সি. চৌধুরী। আমাদের সাম্মানিক নাগরিক, এটা তো ওঁরই বাড়ি। উনি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে শোবেন না তো কোথায় শোবেন?'

তখন মেমসাহেবই 'সরি, সরি, আমি তোমার রসিকতা বুঝতে পারিনি', ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বিদায় নিলেন।"

এই আড্ডার মধ্যেই সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছ থেকে আমি এক অমূল্য শিক্ষা পেয়েছিলাম। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, ওঁর পরিচারক কাটুর এক বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে সুপুরির গল্প করছেন। সে সুপুরির ব্যবসা করে। সুপুরি সব থেকে সস্তা অসমে। গুয়াহাটিতে তো সুপুরি অর্থাৎ গুয়ার হাট। ওইজন্যেই তো নাম গুয়াহাটি। সাহেবরা এসে করে দিল গৌহাটি। কাটু বাজারে গিয়েছিল, আসার পর সে উঠে গেল। আমি বললাম, "এসবেও তো আপনার কম সময় যায় না।"

আলীসাহেব বললেন, "ভানু, আমি লিখে পেট চালাই, আর ও ব্যবসা করে পেট চালায়। কাটু যখন অনুপস্থিত, ও তো তখন আমারই অতিথি। ওকে একটু

সময় না দিলে গৃহস্থ-কর্তব্যের হানি ঘটে। জানো, বিদ্যাসাগর মশাই গরমের দিনে এক কাগজবিক্রেতাকে ঘেমে নেয়ে আসতে দেখে বলেছিলেন,'চৌবেজি, একটু বসে যাও।' তাকে জল বাতাসা দিয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছিলেন। সে চলে গেলে উপস্থিত এক বন্ধু বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'আপনার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কাগজের হকারকে বাতাস করে খাতির করা!'

বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন কী জানো? বলেছিলেন,'ওতে আর আমাতে তফাত কী ? ও চৌবে, মানে চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ। ও কাগজ বিক্রি করে, আমি লেখা ও বই বিক্রির ব্যবসা করি।"

আড্ডার কথা যেমন ভাবগম্ভীর তেমনই হাস্যোদ্দীপক! সেকালের যুগটাই ছিল এমনি। মানুষগুলি এমনই জ্ঞানগভীরতা, ভাবগভীরতা ও রসগভীরতা বহন করে চলতেন। ওই যে বলছিলাম, তখনকার মানুষরা আড্ডা সঙ্গে নিয়ে চলতেন। গজেনবাবু একবার বিজয়ার চিঠি দিয়েছিলেন বনফুলকে—

শ্রীচরণেষু বলাইদা,

"বিজয়ার প্রণাম নেবেন।

ইতি

গ

তার দু'দিন পরেই উত্তর এল পোস্টকার্ডে---

ভাই গ,

চিঠি প,

আশীর্বাদ ল,

ইতি

ব

আড্ডার গল্প লিখে বা পড়ে পুরো আনন্দ হয় না, আড্ডার গল্প আড্ডাতেই বলতে হয়। আর সেখানে অবশ্যই লাগে মুড়ি ডালমুট তেলেভাজা আর চা।

১৯

কৃত্তিবাসী আড্ডা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

'সকল রকম গদ্য লিখে পদ্য লিখে
তোমার জন্য চতুর্দিকে
বানিয়েছিলাম কেমন সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে
ও মেমসায়েব দাঁড়িয়ে আছি জাত-ভিখিরি।
মান অভিমান? ছাড়ো-ছাড়ো।
বাড়িয়ে রাখা হাতে আমার খুচরো
কিছু দিলেই পারো। দিলেই পারো।'

এটি সুধেন্দু মল্লিকের কবিতার অংশ। কৃত্তিবাস-এর ২৩ নম্বর সংকলনে বেরিয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এই সংকলনটি আমি সম্পাদনা করি। এর দু'বছর আগে সুনীল বিদেশ থেকে ফিরেছে, ওর অনুপস্থিতিতে কৃত্তিবাস সম্পাদনার ভাব আমার ওপর পড়েছিল। ফিরে এসেও সুনীল কৃত্তিবাসের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। অর্থাভাব তার একটি কারণ। আর, ওর মনের মধ্যে তখন পেশাদার

লেখক হওয়ার বাসনা। আনন্দবাজারে সপ্তাহে একটি পৃষ্ঠা নীললোহিত লেখে, আর এদিকে ওদিকে গল্প উপন্যাস— যেহেতু গদ্য না লিখলে পেশাদার লেখক হওয়া যায় না।

সেই সময় বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীকে একটি চিঠিতে সুনীল লেখে,'কোথাও চাকরি পাবার ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত লিখলে তবেই আমার খাদ্য ও মদ্যের সংস্থান হবে। ভাবলে এক-এক সময় হাসি পায়। অথচ উপায় কী?... আমি কৃত্তিবাসের ভার ছেড়ে দিচ্ছি। এই একটা সংখ্যা সম্পাদনা করছেন শরৎ, আগামী সংখ্যা সমরেন্দ্র বা তারাপদকে সম্পাদক হতে অনুরোধ করেছি। যে সংখ্যার যে সম্পাদক, সেই সংখ্যার সম্পূর্ণ ভার তার। আমার কোনো দায়িত্ব নেই।'

২৩ নম্বর সংকলনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আমি জানিয়েছিলাম যে, এই সংকলনের প্রধান কবি সুধেন্দু মল্লিক। হৃদয় সংকট বা অন্য কিছু তাঁকে আজকাল প্রচণ্ড উত্তেজিত করে রেখেছে দেখছি। মুখচোরা ভদ্রলোকটি অকস্মাৎ অসংখ্য ভালো কবিতা লিখছেন। আসল ঘটনা হল, অনেকের মতো সুধেন্দু কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে এসে আমাকে 'নবগ্রহ' নাম দিয়ে নয়টি কবিতা দিয়ে যান। সেগুলি ছাপা হতে থাকে। তারপর একদিন আমাদের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের নিচু চাতালের আড্ডায় বেশি রাত্রের নির্জনতায় তিনি কৌতুকবশে আরও নয়টি কবিতা পকেট থেকে বার করে শোনান। আমি সেগুলিও ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নিই এবং কৃত্তিবাসের শেষ ফর্মায় ছেপে দিই।

এরই পাশাপাশি সেই সংখ্যার কৃত্তিবাসে বেরিয়েছিল দীপক মজুমদারের কবিতা— বিলি হলিডের গান— 'বলো'। এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করতে চাই—

বলো তুমি আমায় ভালোবাসো
বলো এটা সত্যি নয়, যে,
তোমার আরেকটা মাগী জুটেছে
বলো পেয়ারকে সোনা, দিলকে বাগিচা আমার, বলো
ওই ভাতারখেকোদের কথা সত্যি নয়
বলো আমার গুলবদন বলো
আমি আজও তোমার হাজার রাতের খেমটা
বলো রাজা বলো তুমি দূরে নেই
বলো ইয়ার বলো, মাইরি

একবারটি বলো
সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, বলো।'

কৃত্তিবাস প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯৫৩ সালে। আর তার প্রায় পনেরো বছর পরে বেরোয় পঁচিশ নম্বর সংকলন। এই পঁচিশ নম্বর কৃত্তিবাসই পত্রিকার প্রথম পর্ব, গোষ্ঠীর লেখকদের ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠার সময় এবং পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সময়ও। আমাদের আগের যুগের কবিরা ছিলেন একটু বাবু প্রকৃতির। ধুতি পাঞ্জাবি আর উত্তরীয় পরতেন, অনেকেই বাবরি চুল রাখতেন। লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন না। লোকেরা তাঁদের বাড়িতে যেত। আর আড্ডার আবহাওয়া যেটুকু ছিল, তা ওই প্রকাশকের দপ্তরে, সপ্তাহে একদিন। সবটাই ফর্মাল। আমরাই প্রথম গাটার থেকে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালাম। পঞ্চাশের কবিরা সংখ্যায় দু'জন কি তিনজন নয়, অন্তুতপক্ষে কুড়িজন। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। সেই কারণেই একটু আগে সুধেন্দু মল্লিক ও দীপক মজুমদারের নাম উল্লেখ করেছি। এই কুড়িজনের মধ্যে দু'তিনজন হলেন পূর্বসুরিদের অনুসারী, বাকিরা যাকে বলা যেতে পারে কৃত্তিবাসী।

ষাট দশকের বিশিষ্ট কবি এবং আমাদের সহচর তুষার রায় এঁদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। একটি চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গত বলেছেন যে, 'পঞ্চাশের কবিদের দামাল দাপট সেই সাজটাজ এখনও যেন ভূপালীর মতো লা-জবাব লা-পরওয়ারিস, লাবণ্যের যেন তুঙ্গকাল, বাগানের সমস্ত গোলাপ যেন একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। এখন তাঁরা অক্লেশ অবলীলায় অথবা লীলাভরে এ্যাকুরেট দম্বল কায়দায় দমপোক্ত দই বসাতে পারেন। এখনো সমান উচ্ছল লহরে উপস্থিতি— বাংলা কবিতার পুষ্পিত নিকুঞ্জ এখনো বুঝি সত্তর পার্সেন্টই পঞ্চাশ অধুষ্যিত। আমি জানি ষাটের কবিরা এখনো মুগ্ধ আপ্লুত রয়েছে পঞ্চাশ দশকের কারু ও চারুকর্মের ছত্রছায়ায়। ধর্মে মর্মে অবশ্যই কর্মে ষাটের চারুবাক ছেলেরা এখনো যেন মায়ের মতো পঞ্চাশের কোল বা স্তন ছাড়ে নি।'

এটি ১৯৬৬ সালের কথা। তারপর দিনকাল কিছু বদলেছে। ষাটের দশকের পর সত্তর, আশি, নব্বইয়ের দশকের কবিপ্রজন্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। উত্তর আধুনিকেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, পঞ্চাশের আধুনিক পশ্চিমি ভাবাপন্ন উদ্দাম কবিদের কাল শেষ হয়ে গেছে। এই বিতর্কের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে চাই না। কারণ এখন সামাজিক বাতাবরণ আর আগের মতো নেই। তখন আমরা ছিলাম বাবা-মায়ের পাঁচ-ছয় সন্তানের অন্যতম, মনোযোগ বিনা নিজেরাই

বড় হয়ে উঠেছি বড়দের চোখের আড়ালে। এখন আমাদের সন্তানরা এক-একজন বহুমূল্য সামগ্রী— সবসময় তাদের নজরে রাখা হয়, তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মেপে দেওয়া হয়, তাদের মূল্যবোধ এককভাবে গড়ে ওঠে। তাদের জন্য আয়োজন প্রচুর, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা কম। তখন আমাদের কোনও বান্ধবী ছিল না। এম. এ. ক্লাসের মেয়েরা নিজেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত। ছেলেদের সঙ্গে মিশত না। দুটি-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এখন ছেলেমেয়েদের মেলামেশা হয়েছে অনেক বেশি অবাধ। আমরাই তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছি। তার ফলে একদিক থেকে যেমন তাদের নিঃসঙ্গতা বেড়েছে, অন্য দিক থেকে তেমনই তাদের নিঃসঙ্গতা কমেছে।

অতএব, কৃত্তিবাসের প্রথম পর্যায়ে আমাদের আড্ডা ছিল পুরুষকেন্দ্রিক। প্রধানত কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে, তা ছাড়া সুনীলের বৃন্দাবন পাল লেনের ঘরখানিতে। আর, নয়তো ভাস্কর দত্তের বৈঠকখানা— এই ছিল কৃত্তিবাসের আড্ডাখানা। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, কৃত্তিবাসের দলে উঠতি লেখকের পাশাপাশি অলেখক সদস্যও ছিল দু'চারজন। তারা ছিল আমাদের উৎসাহদাতা। সুনীলের ব্যক্তিগত সহচর। যেমন ভাস্কর দত্ত। ওকে আমাদের যাবতীয় অভিযানের সঙ্গী করে পাওয়া গেছে, এমনকী, ওর বাড়িতে কৃত্তিবাসের ঠিকানা স্থানান্তরিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের বৈষয়িক সিদ্ধান্তে ওর পরামর্শ ছিল খুব জরুরি। কিন্তু লিখে নাম করার বাসনা ছিল না।

কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯৫৩ সালে। তখন সুনীল বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। কী অবস্থার মধ্যে কৃত্তিবাস প্রকাশের সূচনা হয়, তা অনেকেরই জানা। বিশেষ করে প্রভাতকুমার দাসের লেখা প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা আছে। আমি যুক্ত হই কৃত্তিবাসের অষ্টম সংখ্যায়। ষষ্ঠ সংখ্যায় যুক্ত হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তখন প্রাথমিক উৎসাহের রেশ কেটে গিয়ে সুনীলই সম্পাদক। এবং কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে খানদুই বইও বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ কৃত্তিবাস প্রকাশনীর তৃতীয় গ্রন্থ। সুনীলের নিজের বই বেরিয়েছে আরও পরে।

প্রথম থেকেই আমি পুরোপুরি চাকরিজীবী। আমার সকাল ও দুপুর ছিল অন্যত্র বাঁধা। আর সব বন্ধুবান্ধব ছিল ওই সময়ে বেকার বা হাফ বেকার। চাকরিবাকরি খুঁজছে। আমার মনে পড়ে, আমি যুক্ত হওযার সময় আর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সুনীল বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দেয়। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের মৌলালি অফিসে একটি নগণ্য চাকরি পায়। সেই অফিসের সামনে ছিল 'শ্যামলী' নামে একটি রেস্তোরাঁ। দুপুরবেলা সেখানেই ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা

দিত। তার মানে ওর কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল না, যদিও সেই চাকরি ও আমেরিকা যাওয়ার সময় অবধি ধরে রেখেছিল। বিনা ছুটিতে এক বছর কামাই করার ফলে ওর চাকরিটি খোয়া যায় বলে শুনেছি। তাই ১৯৬৪ সালে আমেরিকার বিলাসবহুল জীবন থেকে ফিরে ও সম্পূর্ণভাবে বেকার হয়ে যায়।

ওরা দুপুর ও বিকেলে কফি হাউসেও যেত। কফি হাউস সকাল ন'টায় খোলে, রাত ন'টায় বন্ধ হয়। এই বারো ঘণ্টা মোটামুটি গমগম করে। সেখানে এক কাপ কফি নিয়ে দু'ঘণ্টা বসে থাকা যায়। খাওয়ার জল চাইলেই পাওয়া যায়। যা কিনা কাছাকাছি বসন্ত কেবিন বা পুঁটিরাম বা ওয়াই এম সি-এ বা দিলখুশা-য় সম্ভব নয়। ছাত্র ও বেকারদের পক্ষে আদর্শ আড্ডাখানা ছিল কফিহাউস।

কৃত্তিবাসের সদস্যরা তখন প্রায় সবাই উত্তর কলকাতার অধিবাসী, উল্লেখযোগ্য তিনজন বাদে। অলোকরঞ্জন আর আলোক সরকার থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায়। শঙ্খ ঘোষ তো বাইরে বাইরে থাকতেন। এই তিনজনের কাছে আমাদের লেখা চাইতে যেতে হত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল কিছুটা দূরের, যদিও দীপক ওখানে পড়ত এবং পড়াত। আর বুদ্ধদেব বসুর আকর্ষণ ছিল আমাদের কাছে প্রবল। তিনি তখন বোদলেয়রের কবিতা অনুবাদ করছেন, কবিতার পত্রিকা বেরোচ্ছে। আমাদের কী প্রবল উত্তেজনা!

সুনীলের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা অভিযানে আমি যুক্ত থাকতে পারিনি। কেন না আমার দুপুর-বিকেল ছিল চাকরিতে বাঁধা। আমার সঙ্গে ওদের দেখা হত কফি হাউসে সন্ধেবেলা। আর, রবিবার ভাস্করের বাড়িতে। প্রেসে লেখার কপি দেওয়া, প্রুফ দেখা, কাগজ কেনা, মলাট ছাপানো প্রভৃতি কাজও দিনেরবেলা হত আমার অসাক্ষাতে। আমি খবর পেতাম। আর, পত্রিকা বেরোলে স্টলে-স্টলে দিয়ে আসার কাজে সাহায্য করতাম, টাকা আদায় করে আনতাম।

ওই কফি হাউসেই প্রণবেন্দু, সমরেন্দ্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অরবিন্দ গুহ, শিবশম্ভু পাল, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, শংকর চট্টোপাধ্যায়— এদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আর, কবিতা সিংহ ও বিমল রায়চৌধুরী, আল মাহমুদ,তন্ময় দত্ত, পরমেশ ধর, যুগান্তর চক্রবর্ত্তী, সন্দীপন, মানবের সঙ্গেও। তখন দীপেন বেঁচে ছিল। ও কৃত্তিবাসের একজন না হয়েও আমাদের বন্ধু ছিল। আমরা যে কেউ আগে এলে একটি টেবিল অধিকার করে বসে থাকতাম। তারপর তার চারদিকে চেনা মানুষের ভিড় জমে যেত। উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা হত। প্রত্যেকেই লেখালেখি সংক্রান্ত নতুন খবর কিছু নিয়ে

আসত। আর ফাঁকে ফাঁকে পড়া হত আমাদের নতুন লেখা। কৃত্তিবাসে দেওয়ার মতো কবিতা সেখানেই বাছাবাছি হয়ে যেত। কারও কোনও নতুন বই বেরোলে তার উপহার কপি পেয়ে যেতাম কফি হাউসেই। উল্লেখযোগ্য নতুন বই বেরিয়েছে খবর পেলেই সংগ্রহ করে আনতাম সিগনেট বুকশপ থেকে। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'সংবর্ত' বা অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার'। বা বুদ্ধদেব বসুর 'শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর'। সিগনেট বুকশপে কৃত্তিবাস রাখা হত বিশেষ ব্যবস্থায়। ওখানকার কর্মীদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমাদের হৃদ্যতা।

আমাদের একমাত্র বান্ধবী ছিল কবিতা সিংহ। বিমল রায়চৌধুরীর বউ হিসেবে তো বটেই, আবার আলাদা কবি হিসেবেও। ও কফি হাউসে ঢুকলে আমাদের টেবিলেই বসত। কিছু পরে হয়তো বিমল এসে ঢুকত। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হত, বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে বিয়ে করে ওরা বেশ মুশকিলে পড়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা কেউ প্রশ্ন করতাম না। বিমল ছিল শক্তিমান গল্প লেখক। কিন্তু কালক্রমে ওর লেখালেখির বেগ বেশ স্তিমিত হয়ে যায়। কবিতা সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা পায় কঠোর পরিশ্রম করে। ওদের প্রকাশিত 'দৈনিক কবিতা' ওই সময়ে খুব সাড়া জাগিয়েছিল।

দীপকের হাতে সব সময় একাধিক মোটা বিদেশি বই থাকত। আর সকলে বই রাখত কাঁধের ঝোলার মধ্যে, কিন্তু ও রাখত হাতে, টেবিলে। আমরা বইগুলির টাইটেল দেখে অবাক হতাম। দীপকই আমাদের দলে একজন, যে দুধ-চিনি মেশানো কফি খেত না, ইনফিউশন অর্থাৎ কালো কফি খেত। টেবিলে বসলেও সে বিশেষ কারও দিকে চেয়ে কথা বলত না। ঘাড় বেঁকিয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে ওর মতামত জানাত, যার ফলে ওর জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা আমাদের পক্ষে শক্ত কাজ ছিল। একদিন সন্ধেবেলা টেবিল ঘিরে বসে আছি কয়েকজন, কোনও একটা বিষয়ে হালকা সুরে আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় দীপক ঢুকল। মৃদু পায়ে আমাদের কাছে এসে বসল। একটু থেমে, একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রশ্ন করলো, ''তোমরা কি জানো?'' কী? ''বুদ্ধদেব বসু ঈশ্বরে বিশ্বাস করছেন আজকাল।'' ওর আশা ছিল এই কথা শুনে আমরা আকাশ থেকে পড়ব। আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে ও বলল,''উনি আজ আমার কাছে কবুল করলেন।''

এই খবর সত্যি হতে পারে, গুলও হতে পারে। আমরা আর কথা বাড়ালাম না, কেননা আমরা জানতাম দীপকের সঙ্গে বয়স্ক বুদ্ধিজীবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ও আমাদের মধ্যে একমাত্র জেলখাটা ছেলে। ও গোপাল হালদারকে

গোপালদা, দেবব্রত বিশ্বাসকে জর্জদা, চিন্ময় সেহানবিশকে চিনুদা বসে সম্বোধন করত। এবং সর্বোপরি, ওর একজন স্টেডি প্রেমিকাও ছিল।

আর একদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে কফি হাউসে গিয়ে শুনলাম, দুপুরে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমায় চাকরি করতে হয়, বন্ধুরা দুপুরে আড্ডা মারে। সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে মোহিত বলল,"আজ দক্ষিণ কলকাতা থেকে নবনীতা দেব এসেছিলেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের খোঁজ করলেন। তারপর আমাদের টেবিলে এসে বসলেন। মুখে হাসি, পরনে সিল্কের শাড়ি থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে। ওঃ, আর সব টেবিল থেকে ছেলেরা দেখছে আর হিংসেয় জ্বলছে। জল খেলেন না, কফি খেলেন না, যাবার আগে আমাদের হাতে হাতে এক চিমটি করে চিনি দিয়ে গেলেন টেবিলের পাত্র থেকে তুলে।" এই গল্প শুনে আমার মনে হল, আমি থাকলে পূর্বপরিচয় খানিকটা ঝালিয়ে নিতাম। বছর দশেক আগে ওর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে বসত আমাদের 'পাঠশালা' পত্রিকার আড্ডা। ওর বাবা নরেন্দ্র দেব ছিলেন সেই আড্ডার অধিপতি। নবনীতা তখন বালিকা, দুষ্টু নামে একটা কুকুরের সঙ্গে বাড়ির সিঁড়িতে খেলত।

কফি হাউসের স্মৃতির মধ্যে রয়েছে আমার কৃত্তিবাস সম্পাদনার দিনগুলি। সুনীল বিদেশে। আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। কৃত্তিবাসের বন্ধুরা আমার সম্পাদকীয় দায়িত্ব মেনে নিচ্ছে না। তারা লেখা দিচ্ছে না। আমি প্রত্যেকের জন্য চার পৃষ্ঠা ধার্য করে সকলকে লিখতে অনুরোধ করছি। একদিন জ্যোতির্ময় দত্ত এসে বললেন, তিনি তাঁর কোটা-র পৃষ্ঠা তারাপদ রায়কে ছেড়ে দেবেন, তারপর আট পৃষ্ঠার কবিতা দেবেন। সব কবি সমান হতে পারে না। আমি এ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। শক্তি আর শংকর প্রশ্ন তুলল, শরৎ কে? শরৎ কেন? সেই সময় আমার সঙ্গে দু'জন মাত্র সহযোগী বন্ধু ছিল— প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় আর বেলাল চৌধুরী। আমরা তিনজন বসে পরামর্শ করতাম, প্রুফ দেখতাম, মলাট ছাপার পরিকল্পনা করতাম। কাগজ কিনে প্রেসে দিয়ে আসতাম। বাঁধাইখানা থেকে পত্রিকা বার করে ঝোলায় করে বয়ে নিয়ে আসতাম কফি হাউসে। লেখকদের দেওয়া হত, পাতিরামে দেওয়া হত। একবার বিনয় মজুমদারকে এক কপি কাগজ দিয়েছি, ও বলল, "আমার এবারে দু' কপি চাই।" দু'কপি নিয়ে ও উঠে চলে গেল। সেদিন রাত্রে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল উল্টোদিকের ফুটপাথের রেলিঙে দু'কপি নতুন কৃত্তিবাস পুরনো বইয়ের মধ্যে শোভা পাচ্ছে।

তখন বিনয়ের প্রথম বই 'নক্ষত্রের আলোয়' ছেপেছেন বন্ধু প্রকাশক দেবকুমার বসু। একখানা নয়, পরপর ছ'খানা।

ভাস্করের শ্যামবাজারের বাড়ির একতলায় একটা বৈঠকখানা ছিল। একটা তক্তপোশ, আর কতকগুলো চেয়ার। দোতলায় ওর মা আর ভাইয়েরা থাকতেন। তিন-চারজন কাজের লোক ও তাদের বন্ধুবান্ধবের দখলে ছিল একতলার ঘরখানা। সেখানে যে আড্ডা হত তাতে কৃত্তিবাসের অলেখক বন্ধুরাও শামিল হয়েছে। প্রথম প্রথম তাসের ব্রিজ খেলা হত, একসময় তা তিন তাসের জুয়াখেলায় পরিণত হয়। জুয়ার সঙ্গে অনুপান হিসেবে যুক্ত হল রাম— তাও অল্প অল্প, খুব সাবধানে। ভাস্করের চাকরেরাই জল, গেলাস, সিগারেট এনে দিত। যাবার সময় খালি শিশি বোতল আমরা চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিতাম। একদিন ভাস্করের মা নীচের তলায় নেমেছেন। তখন চাকরদের কেউ চৌকিটা তুলে ওঁকে দেখায়। রাশি রাশি খালি শিশি। এই খবর পাওয়ার পর আমরা ও বাড়িতে খাওয়া কমিয়ে দিই। তার বদলে ভাস্করের দাদার মেডিকেল কলেজের কোয়ার্টারে আড্ডা বসাই। সেই বাড়িতে এক মদের আড্ডায় সুনীল 'শুধু কবিতার জন্য' লেখাটা পড়ে শোনায় আর সাগরবাবু সেটি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পকেটস্থ করেন।

এর আগে একটা পর্যায়ে আমাদের রবিবার সকালে আড্ডা বসত দেশবন্ধু পার্কের ভেতরে নির্জন গাছের ছায়ায়। রচনা পাঠই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। আর সেই সঙ্গে টিন খুলে গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খাওয়া। সেখানে শক্তি আসত, সঙ্গে তন্ময় দত্ত। বয়সে তন্ময় সবচেয়ে ছোট কিন্তু প্রচণ্ড তেজি, আর লেখার হাত খুব পরিষ্কার। ওদের দু'জনার বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। একসময় শুনলাম তন্ময়ের কবিতার খাতাখানা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারপর লেখালেখি থেকে হারিয়ে গেল তন্ময়। নিজের লেখা নিয়ে প্রচণ্ড সঙ্কোচ নিয়ে আসত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

ভাস্করের বাড়ির মতো তারাপদর বাড়িতেও ছিল আমাদের অবাধ প্রবেশাধিকার। দক্ষিণ কলকাতার আশ্রয়। তারাপদ ছিল অল্প বয়সে বিবাহিত, তাই আমাদের উড়নচণ্ডী জীবনযাপনে ও সঙ্গী হয়নি, কিন্তু ওর বাড়িতে কোনও বাধা ছিল না। দুপুরে হাজির হলে মাছ-ভাত জুটে যেত। কোনও এক দুপুরে কৃত্তিবাসের একটি দল, সঙ্গে অ্যালেন গিন্‌সবার্গ ও তাঁর সমকামী বন্ধু পিটার তারাপদর বাড়িতে গিয়ে মেস্কালিন মাদক সেবন করে কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে বলে শুনেছি। সেই দুপুর ছিল কাজের দিন, সুতরাং আমি সঙ্গে ছিলাম না। পরে অবশ্য নিমতলা শ্মশানে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাৎ হত।

তারাপদর বাড়ির অন্য এক ঘটনাও মনে পড়ে, সেবার শঙ্খ ঘোষ একটা পুরস্কার পেয়েছেন পাঁচশো টাকা। আমরা সেই সভায় উপস্থিত থেকেছি এবং যথারীতি কবিকে হাততালি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছি। সভার শেষে বেরিয়ে আমরা স্থির করলাম, পুরস্কারের টাকাটা খরচ করে তারাপদর বাড়িতে বসে আমরা আড্ডা দেব। শঙ্খবাবু সবটা দিতেই রাজি কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা অর্ধেক টাকা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে দিলাম, আর বাকি অর্ধেক টাকায় রাম এবং তেলেভাজা আর মহিলাদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত হুল্লোড় করেছি। ভাবটা, শঙ্খ ঘোষের পুরস্কারপ্রাপ্তি তো আমাদের সকলের প্রাপ্তির সমান। এক চুমুক মদ্যপান না করেও শঙ্খবাবু শেষ পর্যন্ত হাসি মুখে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন সেই আড্ডায়।

পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতায় সুশীল রায় মহাশয়ের বাড়ি আমাদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। সুশীলদা ছিলেন 'ধ্রুপদী' কবিতা পত্রিকার সম্পাদক। আমাদের বহু লেখা ধ্রুপদী-তে বেরিয়েছে। সুশীলদার বৈঠকখানায় দিনের পর দিন আড্ডা জমেছে আমাদের। জগ ভরতি জল আর মুসুরির ডালের পিঁয়াজি সাপ্লাই দিয়ে গেছে ওঁর পাঁচ মেয়ের কোনও একজন। তাদের প্রতি আমাদের কোনও দুর্বলতা তৈরি হয়নি লীলাদির কড়া শাসনের ফলে সম্ভবত। সুশীলদার বাড়ি থেকেই কয়েক রাত্রির পরিশ্রমে আমরা প্রকাশ করেছিলাম কবিতার 'ঘন্টিকী' পত্রিকা। এক পাঁচিশে বৈশাখের দিন সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা অবধি আটটি সংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় বেরিয়েছিল এবং কলকাতার ছ'টি স্টলে বিতরণ করা হয়েছিল। গড়িয়াহাট আর শ্যামবাজার মোড়ে ফিরি করা হয়েছিল। একটি কাগজে ঘটনাটি সংবাদ হয়ে বেরোয় পরের দিন। যতদূর মনে হয়, এটি ছিল বিমল-কবিতার 'দৈনিক কবিতা'-র মৃদু প্রতিবাদ।

দক্ষিণ কলকাতায় শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় বহু রবিবার সন্ধ্যায় আমাদের কবিতা পাঠের আসর বসেছে শুধু চা আর সিগারেটের ওপর নির্ভর করে। তখন কৃত্তিবাসের বিপজ্জনক যোলো নম্বর সংখ্যাটি বেরিয়ে গেছে। তার মলাটে একটি হাত-পা বাঁকা ভিখিরি মেয়ের ফটোগ্রাফ। ১৯৬২ সাল। আট ফর্মার মোটা কাগজ। আমার অভিমত, সেই সময় থেকেই কৃত্তিবাসের কবিরা যথার্থ সাবালক ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এর কিছুকাল আগে আমি বিদেশ থেকে ফিরেছি। এর কিছুকাল পরে সুনীল আমেরিকা যাবে।

শংকর অকালে মারা যায়। এই লেখা তৈরি করতে গিয়ে ওকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ওর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর। সুনীলের অনুপস্থিতিতে কিছুকাল ও আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, পরে আবার ফিরে আসে। সেই কর্ডুরয়ের প্যান্ট, টি-শার্ট, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। আর সিগারেটে টান দেবার ফাঁকে ফাঁকে চিৎকার, ''আমরা ওদের ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দিয়েছি বলেই না...''। 'ওদের' মানে সুনীল আর শক্তিকে। ভাবটা, আমাদের সাহায্যেই যেন সুনীল আর শক্তির জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি, ওদের যুগলবন্দি হয়ে যাওয়া। এর পর ওদের আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্তি। পুরস্কার পাওয়ার পর আমরা পার্ক হোটেলের পাশের বারে বসেই উৎসব করেছি। যেন, সে পুরস্কার কারও একার নয়, আমাদের সকলের।

১৯৬৭ সালে এসে আমাদের অনেকের একে একে বিয়ে হয়ে গেল। যেন দূর থেকে পাখিরা এসে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেল আমাদের এক-একজনকে। আমি চলে গেলাম চাকরি বদল করে দিল্লিতে। সুনীল পেশাদারি লেখায় আর বিজ্ঞাপনী প্রচারে বেশি করে মন দিতে লাগল। শক্তি হল গৃহবন্দি। পরিবর্তন হল প্রণবের, সমরেন্দ্রর। কেবল শংকরের বিয়ে হল না। আমার আর বিজয়ার বিয়ের পর প্রেস ক্লাবে একটি পার্টি দিয়েছিলাম। তাতে শ'খানেক মদ্যপ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আমিই প্রথম অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই।

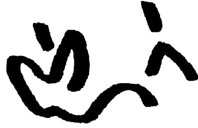
ওই সময়েই উৎপলকুমার বসু ইংলন্ডে চলে যায়। ভাস্করও বিলেত চলে যায় চিরদিনের মতো। অলোকরঞ্জন কী একটা বৃত্তি নিয়ে জার্মানি চলে গেল। সুনীলের পর শঙ্খবাবু গেলেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বিষয়ে নতুন তথ্য নিয়ে এলেন। কৃত্তিবাস সম্পাদনা করল সমরেন্দ্র, কিছুকাল, কিন্তু ভাঙা হাট আর তেমন জমল না, ভাঙন ধরল আড্ডাতেও।

আসলে ভাঙন শুরু হয়েছিল দু-তিন বছর আগেই, যখন শক্তি, উৎপল আর সন্দীপন তথাকথিত হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল। আমি ওদের সঙ্গে যাইনি। কেন না 'হাংরি' শব্দটা আমার পছন্দ ছিল না। বিলেতে তখন অ্যাংরিদের নিয়ে হইচই চলছে। তার দেখাদেখি হাংরি, ক্ষুধার্ত কেন? আমরা তো কখনও ক্ষুধার্ত ছিলাম না! মধ্যবিত্ত যুবকের দল ছিলাম অধৈর্য, বিদ্রোহী, কিছুটা তৃষ্ণার্ত। এক বড়দিনের রাতে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে মদ খাওয়ার টাকা জোগাড় করেছিলাম। সন্দীপন আর শক্তি খুব ভালো ভিক্ষে করতে পারত। তাই সন্দীপন ওর 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' (১৯৮৮) বইয়ে শক্তির চরিত্র প্রতিকৃতিতে লিখেছে—

এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিল
এদেশে মহুয়া খুব পাওয়া যেত
এদেশে শুনেছে লোকে ওর কোলাহল...
ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি।

সেই বইয়ে বড় বড় ছবি এঁকেছিলেন প্রকাশ কর্মকার। এর কয়েক বছর আগে প্রকাশিত সুনীলের উপন্যাস 'অরণ্যের দিনরাত্রি' নিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবি করেছিলেন।

এর পরই এখানে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই খবরটা জরুরি, কারণ আমাদের এলোমেলো জীবনযাপন, আড্ডা আর তা থেকে উঠে আসা বিস্ফোরক শব্দগুলি নকশাল ছাত্রদের প্রভাবিত করেছিল, এমন রটনা আছে। সেই বিস্ফোরণ ছিল উচ্ছ্বসিত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা বিদ্রুপাত্মক— বৈচিত্রে সর্বগ্রাসী। আমার অনেকেই তাতে শামিল ছিলাম।



আড্ডাহীন জীবন বড় বিস্বাদ লাগে

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জল বিনে যেমন মাছ বা মীনের প্রাণ বাঁচে না, তেমনই আড্ডা ছাড়া তাবৎ বাঙালির না হলেও অন্তত কলকাতার বাঙালির প্রাণ হাঁসফাঁস করে।

বাবার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিয়ে একজন সত্যিকারের মানুষ করে তোলার আশায় সাত বছর বয়সে আমাকে যখন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং আমাকে দেখাশোনা করার জন্য আমার বড়দিও যখন কলকাতায় এসেছিলেন, সেই তখন থেকেই এইরকম একটা ধারণা আমার মনে বিঁধে গিয়েছিল।

নদিয়া জেলার শান্তিপুরে আমাদের আদি বাড়ি, সেখানেই আমার জন্ম হয়েছিল। আমার জন্মের কিছুকাল পরেই নাকি আমাদের পরিবার শান্তিপুরের বৃহৎ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদিয়া জেলারই বেলপুকুর গ্রামে চলে গিয়েছিল। সেখানে ঠাকুমার পৈত্রিক বাড়ি ছিল। যে সময় সরলপ্রাণা মায়েরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে বেশ গর্বের সঙ্গে বলতেন, 'বড় হয়ে একজন দারোগা হয়ো বাবা', ঠাকুরমার বাবা ছিলেন সেই সময়কার ডাকসাইটে দারোগা। ঠাকুমা ছিলেন

তাঁর একমাত্র সন্তান। বাড়ি ছিল মানে বেশ লম্বা একখানা পাকা ঘর আর তার চারপাশে ছিল বুনো ঝোপঝাড় এবং ঝাড়ালো গাছপালার গভীর জঙ্গলে ভরা কয়েক বিঘে জমি। ঠাকুমার মৃত্যুর পর আমরা সেই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। পিতৃব্যদের পরিবারের সংস্রব ত্যাগ করে আমাদের পরিবার কেন যে আলাদা হয়ে বেলপুকুরে চলে গিয়েছিল, তার সঠিক কারণ আমার জানা নেই। যেটুকু জেনেছি, সে সবই শোনা কথা। শোনা কথায় আমল না দেওয়াই ভালো।

পরে, আমার সাত বছর বয়ঃক্রমকালে, বেলপুকুরের সেই বাড়ির মায়া, মা-বোনেদের অকাতর স্নেহ-ভালবাসা, বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে, জলে-কাদায় আপন খেয়ালে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর অগাধ স্বাধীনতা, সমস্ত কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ধুবুলিয়া স্টেশনে এসে লালগোলা প্যাসেঞ্জারের থার্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে চেপে শেয়ালদায় নেমে উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে দিদিমার বস্তিবাড়ির একটা এঁদো ঘরে এসে উঠেছিলাম। তারপর তখনকার দিনের নামী সরস্বতী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে বাবা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল উনিশশো একচল্লিশ সাল। তারপরে দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে এসেছি। এখন বয়সও বেড়েছে, বলা যেতে পারে যে, এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তার ওপর ক্রমাগত বাসাবদল করতে করতে, সরতে সরতে, উৎখাত হতে হতে বিশ শতকের সাতের দশকের গোড়ায় অর্থাৎ সত্তরের রাজনৈতিক হানাহানির উন্মত্ততার সেই দিনগুলোয় উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় এসে পড়েছি এবং সেখানেই এখন থিতু হয়েছি। শুধু আমি একা নাকি, আমার কালের অনেক ঘনিষ্ঠ কয়েকজন তুখোড় আড্ডাবাজ মানুষও উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় চলে এসেছেন।

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই কিংবা মুখে বুলি ফোটা মাত্রই কিংবা কিশোর বয়সেই কেউ আড্ডাবাজ হয়ে ওঠেন না। অল্প বয়সেই আমিও যে খুব আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছিলাম তা কিন্তু নয়, বরং তার উল্টোটাই ছিলাম। অতিশয় লাজুক স্বভাবের, ভিতু প্রকৃতির মুখচোরা ছিলাম। হয়তো বা গ্রামের গরিবঘরের ছেলে ছিলাম বলে সর্বদা সন্ত্রস্ত ও সংকুচিত হয়ে থাকতাম, কখনওই শহুরে ছেলেদের মতো বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারতাম না, পাড়ার ছেলেদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতাম। এখনও আমি সেইরকমই আছি। আজও তাই হাজার চেনাশোনা লোকজনের দঙ্গলে গিয়ে পড়লেও, আপাতগাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে পুরোপুরি আড্ডাধারী হয়ে উঠতে অন্যদের তুলনায় আমার যেন একটু বেশি

সময় লাগে। আসলে, ভাবীকালে আড্ডাবাজ হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ আমার ছেলেবলা থেকেই আমি পাইনি।

প্রয়াত সুধীনদার কথা মনে পড়ে গেল। বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত তখন সিঁথিতে থাকতেন, ডি গুপ্ত লেনের উনিশ নম্বর বাড়িতে। দোতলা বাড়ির পুরোটাই তাঁদের পরিবারের দখলে ছিল। সুধীনদা, তাঁর বড়দা, মেজদা, ছোটভাই, দিদি সবাই একসঙ্গে থাকতেন। সুবীরদা, গীতিকার সুবীর হাজরা প্রায় রোজই সে বাড়িতে আসতেন। মাকাদাকেও প্রায়ই দেখতাম। মাকাদাকে ওই মাকাদা নামেই চিনতাম। তাঁর পিতৃদত্ত নাম বা পদবি কিছু একটা নিশ্চয় ছিল, আমরা তার কিছুই জানতাম না। প্রশান্ত, অর্থাৎ সুধীনদার অন্যতম সহকারী সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার প্রশান্ত চৌধুরীর সঙ্গেও ওই বাড়িতে আলাপ হয়েছিল, পরে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। প্রতি রবিবার সকালে সেই বাড়িতে সুধীনদার ঘরে আমাদের তুমুল আড্ডা বসত, সেই আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে এক-এক রবিবার দুপুর অনেকখানি গড়িয়ে যেত। অমরদা, অমর মুখোপাধ্যায় আমাদের সেই আড্ডায় হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হতেন।

সেকালে উত্তর কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যেসব চা-খানা বা কফি-খানা ছিল সেগুলোই আড্ডার ডেরা হয়ে উঠেছিল। আমাদের রাজবল্লভবাড়ার জগৎ মুখার্জি পার্ককে বাঁয়ে রেখে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সমকোণে বেঁকে শ্যামবাজারের দিকে চলে গিয়েছে যেখানে, সেই জায়গায় পটলার চায়ের দোকানে পাড়ার ছেলেদের জমজমাট আড্ডা বসত। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, আপার সার্কুলার রোড শুরু হচ্ছে যেখানে সেখানে গাড়ি-বারান্দার নীচে একটা কফিহাউস ছিল, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত ও নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সেখানে আসতেন, দু'দণ্ড বসতেন, কয়েকদিন আমিও গিয়েছিলাম। সে কফিহাউস এখন আর নেই, এখন সেটা বোধহয় জামাকাপড়ের দোকানে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমাদের কালে দক্ষিণ কলকাতায় আড্ডা বসত না? বসত, নিশ্চয় বসত, তবে তা হয়তো আনুপাতিক হারে কিছুটা কম। আচ্ছা, কমই বা বলি কী করে! মনে পড়েছে, নানা সময়ে নানা বয়সে আমার দেখা কয়েকটি রেস্তোরাঁর কথা, 'অমৃতায়ন'-এর কথা, কালীঘাট পার্কে বিপরীত দিকের 'সাঙ্গুভেলি রেস্টুরেন্ট'-এর কথা, 'পানিয়ন রেস্টুরেন্ট'-এর কথা।

পানিয়নের কথাই আগে বলে নিচ্ছি। সে রেস্তোরাঁ এখন আর নেই, এই সেদিন পর্যন্ত সেখানে ছিল ক্যালিকো মিলের ছিটকাপড়ের একটা খুচরো

বিক্রয়কেন্দ্র। তার জায়গায় এখন শোভা পাচ্ছে পেল্লায় এক বহুতল বাড়ি। যশোদা ভবনের দিক থেকে বাঁ দিককার ফুটপাথ ধরে হেঁটে এলে প্রথমেই পড়বে রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সংযোগস্থল, সেটা পার হয়েই বাসন্তী বিদ্যাবীথির দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেই পেয়ে যাবেন সেই বহুতল বাড়ি। এককালে যেখানে ছিল পানিয়ন রেস্তোরাঁ।

আমি তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ঘোষকের চাকরি করছি এবং সেইসঙ্গে গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করছি। গল্পদাদুর আসরের ছোট ছোট শ্রোতাদের অতি প্রিয় গল্পদাদু জয়ন্ত চৌধুরি ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ায় তাঁর অভাব আমি সাময়িকভাবে পূরণ করছিলাম। গল্পদাদুর আসরের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য বাড়িতে বসে বিস্তর পড়াশোনা ও লেখালেখির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উত্তর কলকাতার কোথায় কোন এলাকার কোন রাস্তার কোন বাড়িতে তখন থাকতাম মনে পড়ছে না, শুধু মনে পড়ছে যে, আত্মীয়স্বজনদের আনাগোনা ও পারিবারিক হই হট্টগোলের দরুন সে বাড়িতে বসে আমার লেখাপড়া করার নিভৃত অবকাশের প্রয়োজনটা তখন মোটেও পাত্তা পায়নি। তাই হ্যারিসন রোডের নিকো বোর্ডিং-এ গিয়ে উঠেছিলাম। নিকো বোর্ডিং-এর ছাদের উপর একখানা মাত্র ঘর, কাঠের পার্টিশন দিয়ে সেই ঘরকে দু'খানা করা হয়েছিল, এধারে থাকতেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অশোক রায়, অমিয় চৌধুরী আর একধারে থাকতেন দু'জন, তাঁরা ছিলেন অফিসকর্মী। একজনকে ডাকতাম 'ঘোষদা' বলে, অপরজনকে কী বলে যে সম্বোধন করতাম মনে পড়ছে না। বোধ হয়, 'নীরেনদা' বলতাম। তিনি কাজ করতেন ধর্মতলায়, এখন যেখানে পিয়ারলেসের হোটেল হয়েছে, তারই পাশে রেলওয়ের বুকিং অফিসে।

নির্ধারিত ব্যবস্থামতো একদিন সকালবেলায় এই নিকো বোর্ডিং-এর কাছ থেকেই পানিয়ন রেস্তোরাঁর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। শেয়ালদা, পার্কসার্কাস ঘুরে গড়িয়াহাটে যশোদাভবনের কাছে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিলাম। তারপর একে-ওকে-তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষপর্যন্ত ঠিক সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং যাঁর জন্য এই সাতসকালে এতদূর ঠেঙিয়ে এখানে আসা সেই মানুষটিকে পেয়ে গেলাম। তাঁর নাম অসীম সোম। অসীমদাকে তো পেলামই, তার সঙ্গে সুশীল চক্রবর্তী, মণি সান্যাল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, গোরা নাগ, কালী দাশগুপ্ত এবং যতদূর মনে পড়ছে সুনীল মুন্সিকেও সেদিন পানিয়নে পেয়ে গিয়েছিলাম।

অসীমদা আগে দিল্লির অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগের বাংলা ইউনিটে চাকরি করতেন। তখন মাঝে মাঝেই দিল্লি থেকে বাংলায় তাঁর খবর পড়াও শুনতে পেতাম। তারপর কলকাতা বেতার কেন্দ্রের স্থানীয় বিভাগে বদলি হয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। সে সময় সংবাদ পাঠক ও অনুবাদক হিসেবে কলকাতায় স্থানীয় সংবাদ বিভাগে আমিও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে চাকরি করেছিলাম।

অসীমদা সেই যে দিল্লি থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, আর ফিরে যাননি, কলকাতায় থেকে গিয়েছিলেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। মাঝে-মধ্যে সকালের দিকে দেশপ্রিয় পার্কের উল্টোদিকে 'সুতৃপ্তি'তে গেলে তাঁর দেখা মেলে। একমাথা পক্ককেশ নিয়ে শান্ত মানুষটি নিচু স্বরে কারও না কারও সঙ্গে কথা বলছেন।

চাকরির ক্ষেত্রে আমার এবং অসীমদার মধ্যে স্তরভেদে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও, তার বাইরে এক জায়গায় আমাদের মধ্যে মিল ছিল। আমার দুজনেই সেকালের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলাম, সেই সূত্রেই বেতার কেন্দ্রের চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই পরস্পরের মুখ চেনা ছিল। চাকরি যাওয়ার ভয়ে এতকাল মনের মধ্যে গোপন করে রাখা কথাটা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার এক দশকেরও বেশি দিন পরে আজও যদি না বলি তো কবে আর বলব! সুতরাং এখন নির্ভয়ে বলতে পারি যে , বিশ শতকের পাঁচের দশকের গোড়াতেই আমরা অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলাম। সামুদ্রিক ঝড়ের ঝাপটে হাল ভেঙে পাল ছিঁড়ে ডুবে যাওয়া তরীর এক হতভাগ্য আরোহীর মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময়ে আমি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে, খুব কাছে গিয়ে পড়েছিলাম।

উনিশশো চৌষট্টি সালে দিল্লির সংবাদ বিভাগে বাংলা ইউনিটে যোগ দেওয়ার চিঠি পেয়ে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আগে কখনও দিল্লি যাইনি, কেমন করে যাব, কেমন জায়গা, কোথায় থাকব, সহকর্মী হিসেবে কাদের পাব, কাজের পরিবেশটাই বা কেমন হবে— এইসব ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। ঠিক তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল যে, কলকাতায় আসার আগে অসীমদা দিল্লিতেই ছিলেন, একটা মেসে থাকতেন। সেই মেসের তখনকার পরিচালকের নামে অসীমদা একটা চিঠি লিখে রেখেছিলেন, অমুকদিন সকালে পানিয়ন রেস্তোরাঁয় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেইমতই সেদিন সেখানে গিয়েছিলাম।

দিল্লি রওনা হওয়ার আগে কিছুদিন নিকো বোর্ডিং-এ ছিলাম, সেটা বোধহয়, উনিশশো বাষট্টি-তেষট্টি সাল হবে, নিকো বোর্ডিং-এর অবস্থান হ্যারিসন রোডের ওপরে হলেও এবং এই বোর্ডিং-এর ঠিকানা হ্যারিসন রোড, এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোড হলেও, তার প্রবেশপথ ঠিক হ্যারিসন রোডের ওপরে নয়। হ্যারিসন রোড থেকে একটু ঘুরে গিয়ে একটি শাখা সড়ক ধরে কয়েক পা হাঁটলেই নিকো বোর্ডিং-এ ঢুকবার একমাত্র প্রবেশপথের সদর দরজাটা পড়ত। এখনও পড়ে, কী যেন নাম সেই শাখা সড়কটার, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কি? কী জানি! নাম তার যাই হোক, সেই শাখা সড়কটায় নিকো বোর্ডিং-এর সেই সদর দরজার উল্টোদিকের একটি বাড়ির নীচের তলায় একখানা ঘরে তখন থাকতেন এখনকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং কবি মুকুল গুহ। লেখালেখির জগতে কেউই তখনও প্রতিষ্ঠা পাননি, প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য শীর্ষেন্দুকে তখন প্রচুর পরিশ্রম করতে দেখেছিলাম। কালীঘাটের একটি স্কুলে শীর্ষেন্দু তখন শিক্ষকতা করতেন এবং অবসর সময়ে ঘাড় গুঁজে গল্প লিখতেন। সে গল্প মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে লিখতেন। লেখাটা যতক্ষণ ঠিকঠাক না হত ততক্ষণ চলত। মুকুল তখন কোনও একটা বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, নেক-টাই ও সদ্য ভাঁজভাঙা পাতলুন পরে অফিসে যেতেন, তখনই তিনি বেশ ফিটফাট থাকতেন। জটিল কিংবা অশোক কিংবা অমিয় কিংবা আমি নিকো বোর্ডিং-এ ঢোকার সময় কিংবা বেরোনোর সময় কিছুক্ষণ তাঁদের ঘরে আড্ডা মেরে যেতাম। চা খেতে খেতে শীর্ষেন্দুর লেখা নতুন কোনও গল্প শুনতাম। মুকুল বরাবরই খুব চাপা স্বভাবের মানুষ, তাঁর কবিতা-টবিতা না শুনতে চাইলে শোনাতে বসতেন না। শীর্ষেন্দু ও মুকুলের সঙ্গেই আমার কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে প্রথম পদার্পণ। তার আগে এই কফি হাউসে আমি কখনও যাইনি। যাইনি, সে কি শুধু এই কফিহাউসে যাওয়ার সঙ্গতি আমার ছিল না বলেই কি? সে সঙ্গতি তখনও যেমন ছিল না, এখনও তেমন নেই। তা হলে? আসলে, কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এই কফি হাউসটার কথা আমাকে কেউ জানাননি, কেউ আমাকে এই কফি হাউসের পথ চিনিয়ে দেননি। তাই এতকাল এখানে আসা হয়নি। তা যাই হোক, শীর্ষেন্দু কিংবা মুকুলের সঙ্গে বেশ কয়েকটা দিন সন্ধ্যার ঝোঁকে যাতায়াত করতে করতে কফি হাউসের তখনকার পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল, কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও জমে উঠেছিল, ফলে তাঁদের ভরসায় শীর্ষেন্দু বা মুকুল ছাড়াও একা একাই দিনের অন্য সময়েও কফি হাউসে

গিয়ে বসে থাকতাম। প্রথমে আলাপ হয়েছিল তুলসীর সঙ্গে, তুলসী সেনগুপ্ত। তখন তিনি নিউ ব্যারাকপুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তখনও অবিবাহিত। তুলসী এখন বিবাহিত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রতিষ্ঠিত লেখক। যেমন হয়, তুলসীর পরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন করুণাসিন্ধু দে এবং ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার। আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঢের আগে থেকেই করুণা এবং ত্রিদিবের মধ্যে জানাশোনা ছিল। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অসমের হাইলাকান্দির বাসিন্দা।

ক'বছর আগে একদিন হঠাৎ করুণার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তার কয়েক দিন পরেই করুণার সমস্ত কবিতার এবং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, করুণা সেই অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যেসব খ্যাতিমান এবং সৃজনশীল মানুষের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পেরেছিলাম এই কফি হাউসে আসা-যাওয়া করার সুবাদে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ ছাড়াও পরিচিত মানুষের তালিকায় আর যাঁদের নাম সংযোজিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে তুলসী, করুণাসিন্ধু ও ত্রিদিবরঞ্জন তো আছেনই আর আছেন প্রয়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত প্রলয় সেন, দিব্যেন্দু পালিত, বিভূতি রায়, (ছদ্মনাম অভ্র রায়), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রয়াত বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য, দেবকুমার বসু, প্রয়াত নির্মাল্য আচার্য, কল্যাণ চৌধুরী, প্রয়াত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা আদিত্য, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, প্রয়াত শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন একদা-ঘনিষ্ঠ অথচ অধুনা বিস্মৃতনামা ব্যক্তি। স্মৃতির পটে তাঁদের মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে। কিন্তু তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না। আমার এই বিস্মরণের জন্য তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রায় রবিবারই সকালবেলা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আসতেন, কোনও কোনও রবিবার সকালে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ও আসতেন। তাঁদের সঙ্গে আমার এই কফি হাউসেই প্রথম আলাপ।

আমার এই আড্ডার জীবন শেষ হয়েছিল সেই দিন, যেদিন বেতার কেন্দ্রের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আকাশবাণী ভবন থেকে চলে এসেছিলাম। তাই কি? না, ঠিক তাও নয়, এখনও আড্ডার জন্য মন কাঁদে কিন্তু এখন আর তেমন জমাটি আড্ডা হয় কই? হয়তো বা হয়, শুধু আমার কাছেই তার খবর পৌঁছয় না।

মনে হয়, বিশ শতকের পাঁচের দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল আমার আড্ডার জীবন। সেই বছরটা আমাদের মা-বোন সকলকেই দুঃসময়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। হয়তো আমিই তার কারণ, আমার মানুষ হয়ে ওঠার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই দেখে হতাশ হয়ে আমার পিতৃদেব আমাদের ছেড়েছুড়ে দিয়ে সেই-যে বেলপুকুরে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁর একার সংসার পেতে বসেছিলেন, তারপর আর বাগবাজারের বাড়িমুখো হননি। বাবার কড়া শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল আমার লাগামছাড়া বাঁধনখোলা এলোমেলো জীবনযাপন আর তখন থেকেই চুটিয়ে আড্ডা দিতেও শুরু করে দিয়েছিলাম। এইভাবেই একসময়ে তখনকার জেলেটোলা স্ট্রিট, এখনকার সুধীর চাটার্জি স্ট্রিটে গণনাট্য সংঘের ছোট শাখা সংগঠন 'অরণি'-তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেখানে যাঁদের পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সন্তোষ গুপ্তের, তিনি 'অরণি'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পেয়েছিলাম নৃত্যশিল্পী তমালকুমারকে, তমালকুমার যে তাঁর প্রকৃত নাম নয়, তাঁর ছদ্মনাম, তাঁর পিতৃদত্ত নাম যে অমল মজুমদার, কালীঘাটে নেপাল ভট্টাচার্য লেনে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেকথা আমি জানতাম না। 'অরণি'-তে পেয়েছিলাম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহযোগী আবৃত্তিকার ও শক্তিশালী নাট্যকার সন্তোষ দাশগুপ্তকে। তাঁকে সহযোগী আবৃত্তিকার বললাম এই কারণে যে, বরাবরই তাঁর আবৃত্তি শুনেছিলাম তমালকুমারের নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে। একলা তাঁকে আবৃত্তি করতে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। এঁদের সঙ্গে আমার নিয়মিত আড্ডা হত।

গুলু ওস্তাগর লেন যেখানে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে এসে পড়েছে এবং গ্রে স্ট্রিটের গায়ে যেখানে পেট্রল পাম্পটা আছে, এই দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায় সার সার কয়েকটা দোকান আছে, সেগুলোর একটায় রয়েছে সেই ডাক্তারখানা, যেখানে প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েকজন বসে নানারকম গল্পগুজব করতেন, মাঝেমাঝে ভাঁড়ে করে চা আসত, সেই চায়ে চুমুক দিতেন কী করে জানি না, একসময় আমিও সেখানে ভিড়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারখানার নাম বোধহয় দিগেন ফার্মেসি ছিল, ডাক্তারখানার মালিক ছিলেন একজন ডাক্তারবাবু। আমার থাকায় তাঁর সুবিধাই হয়েছিল। রোগী দেখার ডাক পাওয়া মাত্র আমাদের বসিয়ে রেখে তিনি বেরিয়ে যেতে পারতেন। সেই আড্ডার কারও নাম এখন আর মনে করতে পারছি না। গোপী শেঠ ছাড়া অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সেই দর্জিপাড়া শাখার আর একজনের নাম মনে পড়ছে। অতুল সেনগুপ্ত।

সমূহ আর্থিক বিপর্যয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে উদ্ধারের আসায় অতিশয় দীনহীন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দু'একটি গৃহশিক্ষকের কাজ এবং তার পাশাপাশি শ্যামপুকুর স্ট্রিটে সরস্বতী ইনস্টিটিউশনের পাশেই একজনের একটি অস্থায়ী চায়ের দোকানে খদ্দেরদের চা-টা দেওয়া ও তাঁদের কাছ থেকে দাম বুঝে যখন সবেমাত্র রোজগার করতে শুরু করে দিয়েছি, তখনও নয়, কিংবা হাতিবাগান বাজারের ওপরতলায় টাইপিং শেখার স্কুলে টাইপিং শিখে নিয়ে একজন আত্মীয়ের অফিসে পুরোদস্তর টাইপিস্ট হিসেবে যখন কাজ করেছি, না, ঠিক তখনও নয় কিংবা তারও পরে দমদম-বসিরহাট-হাসনাবাদ ব্রডগেজ রেলপথ বসানোর প্রাক্কালে প্রাথমিক সার্ভের সময় যখন খালাসি হয়ে কাজে ঢুকেছি এবং চূড়ান্ত সার্ভের সময় যখন স্টোরকিপার হয়ে বারাসত থেকে টাকি-হাসনাবাদ পর্যন্ত গিয়েছিলাম ও সমীক্ষক দলের তাঁবুতে তাঁবুতে থেকেছিলাম, তখনও প্রকৃত আড্ডাবাজ হয়ে উঠতে পারিনি। আড্ডায় মেতে উঠেছিলাম তারও পরে, যখন গণনাট্য সংঘের স্থানীয় শাখা 'অরণি'-র এবং বিচিত্র সংঘের মাধ্যমে তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, তখনই।

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে খুব মনে পড়ে। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তখনকার গৌহাটি, আজকের গুয়াহাটিতে নিতান্ত অপরিণত বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল। অমন তরতাজা, দশাসই, বর্ণময় চরিত্রের মানুষের মৃত্যুসংবাদে তাঁর পরিচিত অন্য সকলের মতো আমিও যারপরনাই দুঃখ পেয়েছিলাম, ব্যথিত হয়েছিলাম। দেশপ্রিয় পার্কের পরে দু'একটা রাস্তা পেরোলে, দু'চারটে বাড়ি ছাড়ালে শরৎ বসু রোডের ওপরেই তাঁদের বাসা, যে বাসার দোতলায় তাঁরা বসবাস করতেন, একতলায় বৈঠকখানায় দু'জনে মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে গল্প করে কত না সকাল কাটিয়ে দিয়েছিলাম, তার কি কোনও হিসেব আছে? সাদা পায়জামা এবং নীল রঙের ফুলহাতা জামা পরা সেই ফুর্তিবাজ মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, আজও মনে পড়ছে তাঁর কথা, তাঁর হাত ধরে না হলেও, তাঁর আহ্বানে, তাঁর পথ নির্দেশ অনুসরণ করেই একদিন সকালবেলায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে 'সুতৃপ্তি' রেস্তোরাঁর চায়ের টেবিলের আড্ডায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। প্রথম দিকে প্রায়ই যেতাম, তারপরে যাওয়া আর না-যাওয়ার মাঝখানের ফাঁকগুলো ক্রমশ বাড়তে লেগেছিল, এখন তো যাওয়া হয়েই ওঠে না। শংকর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাসার ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ

অমায়িক মানুষ বলেই তাঁকে আমার মনে হয়েছিল। কথা উঠলেই হাত নেড়ে, মুখভঙ্গি করে কারও কথা বলতেন, ''দূর দূর ও আবার মানুষ নাকি, ও তো চাকর-বাকর।'' 'চাকর' কথাটায় 'চা'-টা প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন, যে 'সাকোর' শোনাত। মাঝেমাঝেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নান্দীমুখ' কবিতার কয়েকটি ছত্র বিড়বিড় করে আওড়াতেন। 'তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে।'

শংকর চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আরও কয়েকজন সেসময় 'সুতৃপ্তি'তে যেতেন, তাঁদের সঙ্গেও প্রথমে আলাপ, পরে আড্ডা হয়েছিল। সত্যেন আচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, প্রণবরঞ্জন রায়, ভানুদা অর্থাৎ ভানু ঘোষ—এঁদের দেখা পেয়েছিলাম। প্রভাস দত্ত, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল দত্তরায়, অসীম সোম প্রমুখ কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে ফিরে পেয়েছিলাম। তাছাড়া ঠিকানা বদল করে শীর্ষেন্দুরা যখন পূর্ণদাস রোডে চলে এসেছে, তখন মাঝেমাঝে তাঁদেরও সুতৃপ্তিতে পেয়েছিলাম। একাধারে কবি এবং চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও সে সময় ওখানে আসতেন। সে অনেক বছর আগেকার কথা, তিনি তখন শুধু কবিই ছিলেন, ছবি পরিচালনার জগতে তখন আসেননি।

অমৃতায়ন ও সাঙ্গুভেলির কথা তো বলাই হয়নি। একটা সময় ছিল, যখন এই কলকাতা শহরের যে কোনও রাস্তায় যে কোনও ফুটপাথ ধরে হাঁটলেই একটা-না-একটা সাঙ্গুভেলি রেস্তোরাঁর দেখা মিলত। গত কয়েক বছর সেই ছবিটা পালটে গিয়েছে। কেন জানি না, অনেক সাঙ্গুভেলি রেস্তোরাঁ উঠে গিয়েছে, তার জায়গায় অন্য ধরনের দোকানপাট গজিয়ে গিয়েছে। আমি যে রেস্তোরাঁর কথা বলছি, সেটা ছিল কালীঘাট পার্কের সামনের বড় রাস্তার ওপারে, হয়তো-বা এখনও আছে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্মচারী এবং আমাদের বন্ধু সমীর ঘোষ সেখানে আড্ডা দিতেন। সমীরের খোঁজে সেখানে কয়েকবার গিয়েছিলাম। যখন ঘোষক ছিলাম, তখন ট্রান্সমিশন একজিকিউটিভ বা ডিউটি অফিসার ছিলেন সমীর, তারপর পদোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। কতটা ওপরে উঠেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি কোন পদে ছিলেন, সে সবের কিছুই আমি জানি না, তবে সমীর যে ভালো কবিতা লিখতেন, তা জানতাম।

উনিশশো সাতাশ সালের ছাব্বিশে আগস্ট ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় বেতারকেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন হয়েছিল কলকাতায়, এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের ভুতুড়ে বাড়ির দোতলা-তেতলা ভাড়া নিয়ে। কলকাতা বেতার

কেন্দ্রে প্রথম অধিকর্তা হয়ে বিলেত থেকে এসেছিলেন মি.সি সি ওয়ালিক, আর ভারতীয় প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট ক্ল্যারিওনেটবাদক এবং শিশির ভাদুড়ির নাট্যদলের আবহসঙ্গীত রচয়িতা নৃপেন মজুমদার। এঁকে-ওঁকে-তাঁকে ধরে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে ওয়ালিক সাহেবই তাঁকে ভারতীয় অনুষ্ঠানসমূহের পরিচালকের পদে বসিয়েছিলেন। নৃপেনবাবুর জনপ্রিয়তা ছিল সুদূরবিস্তৃত এবং পরিচিতি ছিল সর্বগত। বেতারে যোগ দেওয়ার পরই তিনি তাঁর ঘরে নিয়মিত আড্ডা বসাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সমাজের নানা স্রোতের, নানা স্তরের মানুষ সে আড্ডায় মিলিত হতেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সূত্রে সেকালের সাহিত্য ও সঙ্গীতজগতের অনেক রথী-মহারথীই সেই আড্ডায় এসে জুটতেন। তাঁরা সকলেই যে চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় আসতেন, তা নয়। কেউ আসতেন কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই অভিনব বেতার প্রতিষ্ঠানটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার কৌতূহল মেটাতে, আবার কেউ আসতেন নিছক আড্ডার টানে। শহরের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তি, নামকরা শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিত্য আসা-যাওয়ায় সেই আড্ডা অচিরেই জমে উঠেছিল। সেসময় বেতারের সেই আড্ডায় যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট যোগেশচন্দ্র বসু, হীরেন বসু, বিজন বসু, বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), মনমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), পঙ্কজ মল্লিক, নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কোনও-না-কোনওভাবে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে এঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন। এইসব আড্ডাধারীর পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সঠিক লোকটিকে সঠিক কাজের জন্য বেছে নিয়ে নৃপেনবাবু কলকাতা বেতারকেন্দ্রে ভারতীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলেন। কালক্রমে এই আড্ডার মধ্য দিয়েই দানা বেঁধে উঠেছিল কালজয়ী প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'। বাণীকুমার রচিত 'বসন্তেশ্বরী'-ই পরে মহিষাসুরমর্দিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রের দ্বারোদঘটনের বহু বছর পরে, উনিশশো ষাট সালে আমি সেখানে চাকরি করতে গিয়েছিলাম। ততদিনে ভারত রাষ্ট্র ও তার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেই কলকাতা বেতারকেন্দ্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছিল।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রও তার একনম্বর গারস্টিন প্লেসের পুরনো আমলের সেই ভুতুড়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ইডেন-উদ্যান সংলগ্ন এই আকাশবাণী ভবনে চলে এসেছিল। আড্ডার দিন কবে শেষ হয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আর-পাঁচটা

অফিসের মতই তার কাজকর্মে গতি এসে গিয়েছিল। তবু তার মধ্যে পুরনো দিনের স্মৃতি সযত্নে আগলে রেখেছিলেন যাঁরা তাঁদের অনেককেই পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে, বাণীকুমার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ভি জি যোগ, গোপাল দাশগুপ্ত, কে রামতুল্লাহ্ খাঁকে। তাছাড়াও পেয়েছিলাম শ্যামল বসু, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, দুর্গা মিশ্র, মানিক পাল, শংকর ঘোষ, গিরীনদা, বিজয়দাকে। পেয়েছিলাম মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, গৌর গোস্বামী, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল, শৈলেন দাস, অলোক দে, অর্ধেন্দুদা ও তারকদাকে। আর পেয়েছিলাম পি সি চট্টোপাধ্যায়, সুদেব বসু, বিমল বসু, বিমল চক্রবর্তী, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, বরুণ হালদার, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন সরকার, পঙ্কজ মল্লিককে। সেকালের ডাকসাইটে আড্ডাবাজ বিশ্বপতি চৌধুরীকে পাইনি, তাতে কী হয়েছে, পেয়েছিলাম তাঁর পুত্র জয়ন্ত চৌধুরীকে, কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র কাজী সব্যসাচীকে। পেয়েছিলাম ইন্দিরাদি, বেলাদি, পুষ্পদি, বুলবুল সরকার, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়কে। আড্ডার সঙ্গীদের কত আর নাম বলব, থাক, এখানেই থামছি।

চার বছর পর দিল্লি চলে যেতে হয়েছিল, অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগের বাংলা বিভাগের ইউনিটে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে আড্ডাধারী হিসেবে পেয়েছিলাম, বিজন বসু, নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, অসিতভূষণ দাস, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী (কালী এখন তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনামেই বেশি পরিচিত, তাঁকে চেনার সুবিধার জন্য কালী না বলে আদিত্য সেন বলাই ভালো), ভবানী সেন (আদিত্যর সহোদর ভাই, অগ্রজ, চাণক্য সেন তাঁর ছদ্মনাম), শরদিন্দু সান্যাল প্রমুখকে পেয়েছিলাম সেখানকার আড্ডায়।

আদিত্যর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর দিল্লি থেকে আদিত্যর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা 'ইন্দ্রপ্রস্থ'-র কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। তার দরুন হাউলখাসে আদিত্যর বাসায় অবাধ যাতায়াতের সুযোগ পেয়েছিলাম। দিল্লির প্রবাসীজীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যখন কলকাতায় ফিরে এসেছেন, আমিও তখন কলকাতাতেই ছিলাম, হয়তো বা তাঁর ফেরার আগেই আমি কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম। আড্ডা দেওয়ার টানে কয়েকবারই তিনি আমাদের পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। মনে পড়ছে, তখন আমাদের বেশ বড়সড় একটা টেপরেকর্ডার ছিল, তার স্পুলে জড়ানো ফিতেয় তাঁর কণ্ঠে তাঁরই কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি রেকর্ড করে রেখেছিলাম। 'মধুবংশীর গলি'-ও তিনি আবৃত্তি করেছিলেন।

চৌষট্টি সালে দিল্লি গিয়েছিলাম, তার এক বছর পরেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম। ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে এসেছিলাম বললে এতটুকু অত্যুক্তি হবে না। বেতারের যেখানে শুরু সেখানেই শেষ হয়েছিল। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম দেখেছিলাম যখন, তখন তিনি ছিলেন পল্লিমঙ্গল আসরের মঙ্গলময়, তারই ফাঁকে ফাঁকে সংবাদ বিভাগের কাজও করতেন। দ্বিতীয়বার যখন ফিরে এলাম, তার কিছু পরেই স্থানীয় সংবাদ বিভাগের অন্যতম সংবাদপাঠক হিসেবে তাঁকেও ফিরে পেয়েছিলাম। তার ফলে পীযূষদার অনেক বিচিত্র রকমের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হতে পেরেছিলাম। তখন আড্ডাও চলত খুব। মনে পড়ছে, রাতের স্থানীয় সংবাদ শেষ হত আটটায়, পরবর্তী সংবাদ যুববাণীতে আটটা পয়ঁতাল্লিশে, মধ্যবর্তী সময়টা কাজের চাপ তেমন থাকে না, অথচ সকলেরই প্রচণ্ড খিদে পায়। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক হল যে ওইসময় ঘরেই নারকেল মুড়ির ব্যবস্থা করা হবে। তার জন্য চাঁদা তোলা হবে, এবং যাঁরা চাঁদা দেবেন, তাঁরাই বারোয়ারি খানার অংশীদার হবেন। এ বিষয়ে কারও কোনও দ্বিমত থাকল না। পীযূষদা যোগ্য ব্যক্তি, তাঁর ওপরেই ভার দেওয়া হোক। পীযূষদাও খুশি মনেই ভার নিলেন। মুড়ি আর নারকেল মালা কিনে রাখার জন্য কয়েকটা টিন কেনা হল, পীযূষদা একটা নোটবুক কিনলেন। সেই নোটবুকে আয়ব্যয়ের হিসাব রাখতেন। একটা খাতার মলাটের ওপর আঠা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে তার ওপরে বড় বড় অক্ষরে গোটা গোটা করে কী যেন নাম লিখে রেখেছিলেন— বোধহয় 'স্বদেশী জলযোগ সমিতি'। তার আবার কয়েকজন অবৈতনিক সদস্যও ছিলেন। তবুও এত করে সেই সমিতি দীর্ঘস্থায়ী হল না।

একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় স্থানীয় সংবাদ বিভাগের আড্ডা আবার জমে উঠেছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে তাদের এড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের যে সব বুদ্ধিজীবী কলকাতায় চলে আসতে পেরেছিলেন এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে বিবিধ অনুষ্ঠান পরিবেশনা করতেন, তাঁরাই সমবেত হতেন এই আড্ডায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কামাল লোহানি, হাসান ইমাম, জাহির রায়হান, সুভাষ দত্ত প্রমুখ। বাংলাদেশ স্বাধীন হল, তাঁরাও দেশে ফিরে গেলেন। তার কুড়ি বছর পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে আমার চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। আমিও বাড়ি চলে এলাম। এখন এই আড্ডাহীন জীবন বড় বিস্বাদ লাগে।



মেয়েলি আড্ডা নিয়ে ঋতদীপার প্রতিবেদন

সুতপা ভট্টাচার্য

ঋতদীপা' কলকাতার একটি কলেজে পড়ায়। তার বাড়িতে কয়েকজন নানাবয়সী মেয়ে মাঝে-মাঝে জড়ো হয়ে কোনও-না-কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সেই আলোচনার প্রতিবেদন লিখে রাখে ঋতদীপা। দলটির নাম রাখা হয়েছে 'সখী সংবাদ'। মেয়েদের আড্ডা নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল এই সভায়। এটি তারই প্রতিবেদন।

আজ উশ্রি এসেছিল ওর দুই বন্ধুকে নিয়ে। উশ্রির ক্লাসের মেয়েদের দেখি আর ভাবি, ওদের মতো মেয়েরাও কেন আগ্রহ বোধ করে না পড়াশুনার বাইরে অন্য কিছু ভাবার, অন্য কিছু জানার। এই মেয়ে দুটি ওদের ক্লাসের নয়। আমাদের সখীসংবাদের আসর বসে না অনেকদিন। আগ্রহী সদস্য অনেকেই ভিন্ন স্থানে চলে গেছেন। ছাত্রীরা সংখ্যায় খুব কমই আসত। যারা আসত তাদের মধ্যে উশ্রি ছিল সবচেয়ে উৎসাহী। ও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে— আবার কবে বসবে আসর। আমি তারিখ বলতে পারিনি। উশ্রি এবার নিজেই উদ্‌যোগ নিয়েছে বোধহয়, তাই নিয়ে এসেছে বন্ধুদের। ঈশানি আর কমলিকা উশ্রির দুই বন্ধু, ওর ছোটবেলার

নাচের ক্লাসের বন্ধু, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে যাওয়ায় আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে ওদের মিতালি। উশ্রির কাছে 'সখীসংবাদ'-এর কথা শুনে ওরা দেখতে চেয়েছে। উশ্রিকে বললাম, বড়দের দলের অনেকেই তো চলে গেছে, তাহলে ছোটরা এবার বেশি সংখ্যায় আসুক। ওরা' বলে গিয়েছিল সামনের শনিবার আসবে।

শনিবার ঠিক বিকেল পাঁচটায় ওরা হাজির— উশ্রি, মেঘনা, ঈশানি আর কমলিকা। বড়দের দলের মধ্যে আমি ছাড়া ছিল আমার সহকর্মী শ্রেয়া। পাশের ফ্ল্যাটের শ্রীমতীকে বলে রেখেছিলাম। ও এল ওর নিজের হাতের তৈরি এক প্লেট নিমকি নিয়ে। প্লেটটি মাঝখানে রেখে গোল হয়ে বসলাম আমরা। নিমকি সহযোগে আড্ডা শুরু হল। আমার মনে পড়ে গেল আমার মারাঠি বন্ধু প্রতিভার কথা। ওদের দেশের গ্রামীণ মহিলাদের আড্ডার কথা শুনেছিলাম ওঁর কাছে। ময়দা দিয়ে এক ধরনের ছোট ছোট খাদ্যবস্তু বানানো হয়, যেগুলি রোদে শুকিয়ে গেলে দুধে ফুটিয়ে পায়েস তৈরি করার জন্য রেখে দেওয়া হয়। বীণাদের দেশে নাকি একেক বাড়িতে ময়দার সেই ছোট ছোট বস্তুগুলি তৈরি করার জন্য পাড়ার অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা হাজির হয়ে যেতেন, হাতে হাতে তৈরি হত ময়দা-টুকরো, আর মুখে মুখে চলত গল্পগাছা। পরের দিন সবাই মিলে যেতেন আরেক বাড়িতে, সে বাড়ির ময়দা-টুকরো তৈরি করতে। মারাঠি মহিলারা যে কতটাই পরিশ্রম-অভ্যস্ত, ওঁরা আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে চলেন, সেটা বোঝা যায় এই গল্প থেকে।

প্রতিভার কাছে শোনা আরেকটি গল্পও মনে পড়ে, কখনও কখনও ওঁদের দেশের মেয়ে-মজলিশে মাঝখানে থাকে সিদ্ধ সজনে ডাঁটা। গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে ওঁরা ডাঁটা চিবান। উশ্রিদের শুনে সে কী হাসি! আমি বললাম, নিমকির থেকে ডাঁটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কথা সেটা নয়, ভেবে দেখ প্রতিভার মতো যদি ভিন ভাষার মানুষ এসে পড়েন আমাদের আড্ডায়, তাহলে কত কথাই না জানা যায়। হয়তো সেসব মেয়েলি কথাই, হয়তো পুরুষদের সেসব জানার কোনও কৌতূহল নেই, কিন্তু মেয়েলি কথার আদানপ্রদানও তো মনের প্রসার ঘটাতে পারে।

উশ্রি বলল, ও সম্প্রতি তসলিমা নাসরিনের 'নারীর কোনো দেশ নেই' নামে বইটি পড়েছে, তাতে মেয়েলি আড্ডা আর পুরুষালি আড্ডার বৈশিষ্ট্যের কথা পড়েছে। 'সখীসংবাদ'-এর আড্ডার সঙ্গে ওই লেখার মেয়েলি আড্ডার ধারণাকে একটুও মেলাতে পারেনি। তাই ও বইটি নিয়ে এসেছে। উশ্রি পড়ে শোনাল:

'পুরুষের আড্ডা আর মেয়েদের আড্ডার বিষয়গুলো আলাদা। পরস্পরের বিষয় নিয়ে কেউ খুব একটা উৎসাহী নয়। লক্ষ করেছি, মেয়েদের বিষয় শাড়ি কাপড়, বাচ্চাকাচ্চা, রান্নাবান্না, স্বামী সংসার, বড়জোর গানবাজনা। পুরুষের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি, যৌনতা, টাকাপয়সা। এই বিষয়গুলো পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল। বিবর্তন কত কিছুতে ঘটছে। নারী পুরুষের গল্পের বিষয় কেবল এক থেকে গেছে।'

আমি বললাম, তসলিমা তো ঠিক কথাই বলেছেন। আসলে নারী পুরুষের যাপনকে ঘর-বাহিরের বৈপরীত্যে ভাগ করে দিয়েছিল পুরুষতন্ত্র। তসলিমা যা যা বলেছেন, সেসব নিয়েই অন্দরমহলের আবদ্ধ জীবনে দিন কাটত মেয়েদের। আর সে ব্যবস্থা কিছু একদিন-দু-দিনের নয়, যুগ-যুগান্তরের। বর্তমানে সমাজের কোনও কোনও অংশে ঘর-বাহিরের বিভাজন শিথিল হয়েছে অনেকাংশে। ঘরের সীমানায় বাঁধা নেই আর মেয়েরা, বাইরের দুনিয়ায় সর্বত্র তাদের বিচরণ। তাই বলে তো আর ঘরের দায় তাদের বইতে হয় না এমন নয়। ঘরই নারীর প্রকৃত পরিসর—সমাজ এ কথাই বলে, বাজার এ কথাই বলে। টিভি চ্যানেলগুলোয় তো দেখতে পাও তোমরা, মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে তাদের 'হোমমেকারের' ভূমিকাটিকে কীভাবে তুলে ধরা হয়। আর তাই, ঘরের বাইরেও, জীবিকা-উপার্জনে রীতিমতো তৎপর হয়ে ওঠার পরও, এতকালের সাবেক ভূমিকা থেকে মেয়েরা বেরোতে পারে না। উশ্রি, তুমি তোমার সমবয়সী মেয়েদের আড্ডায় কি কখনও যোগ দাওনি? তার সঙ্গেও কি তুমি সখীসংবাদ-এর আড্ডার কোনও মিল পাও? উশ্রিকে মানতে হল, না, 'সখী-সংবাদ' ধরনের আড্ডা তারা সমবয়সীরা করে না। তারা কলেজের বন্ধুরা, একসঙ্গে হলে হয় পরীক্ষার প্রশ্ন-টশ্ন নিয়ে কথা হয়, কিংবা কোনও স্যার-ম্যাডামের নিন্দা-প্রশংসা-সমালোচনা নিয়ে কথা বলে। তবে বেশি কথাবার্তা হয় চলতি সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, চলতি গান কিংবা চলতি ফ্যাশন নিয়ে, অবশ্যই মেয়েদের ফ্যাশন।

আমি একটু অবাক হয়ে বলি, চারপাশে যা কিছু ঘটে চলে, সেসব নিয়ে কথা বল না তোমরা? উত্তর দেয় মেঘনা, বলে, ও আর উশ্রি যখন কথা বলে, তখন তো সেসব নিয়েই কখনও আলোচনা, কখনও তর্ক হয়। তবে ক্লাসের অন্য মেয়েরা সচরাচর তাতে যোগ দেয় না। সাম্প্রতিক দু'-একটি ঘটনায় অবশ্য সব মেয়েই কথা বলেছে, মতামত দিতে কসুর করেনি। যেমন, রিজওয়ানুরের মৃত্যু কিংবা তসলিমার বিতাড়ন। ক্লাসের অধিকাংশ মেয়ের মতামত অবশ্য পছন্দ হয়নি উশ্রি-মেঘনাদের।

শ্রেয়া বলল, "ঋতুদি, তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন? আমাদের স্টাফরুমের আড্ডাতেও কি বাইরের দুনিয়া তেমনভাবে আসে? সেখানেও তো নিজের নিজের স্বামীর কিংবা ছেলেমেয়েদের গৌরব-গাথার প্রতিযোগিতাই চলতে থাকে।"

আমার মনে পড়ে গেল মঙ্গলকাব্যের 'এয়োগণের পতিনিন্দা'-র কথা, সেখানে কিন্তু মেয়েরা জটলা করে কোনও বিশেষ নায়কের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিজের নিজের স্বামীদের নিন্দেমন্দই করছে। বললাম সে কথা। উত্তেজিত স্বরে শ্রেয়া বলল, "নায়কের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য সে বোধহয় পুরুষ কবিদের কল্পনা। অন্তত আমি তো ভাবতে পারি না স্বামী বিষয়ে কোনও মন্দ কথা স্ত্রীরা আড্ডায় কবুল করবে। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যই শুধু নয়, পতির গৌরবেই সতীর গৌরব। সর্বসমক্ষে সে গৌরবে দাগ পড়তে দেন না একালের সতী লক্ষ্মীরাও।"

তা ঠিক, মানতে হল আমায়। তবে স্বামীনিন্দার মতো হীন কাজ না করলেও, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, স্কুল-কলেজে কাজ-করা মেয়েদের আড্ডায় শাশুড়ি-নিন্দা প্রায়শই চলতে থাকে। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। বললাম, ভাবতে অবাক লাগে, এই মেয়েদের কিন্তু শাশুড়ির জিম্মাতেই নিজেদের কচিকাঁচাদের রেখে চাকরিতে ছুটতে হয়। বাড়িতে কেউ না থাকলে শুধু কাজের লোকের ভরসায় শিশু-সন্তানকে রেখে আসা কি কম উদ্বেগের! এই শিক্ষিত মেয়েরা সেসব কেন যে মনে রাখে না!

শ্রেয়াও আমারই মতো, ওর মাকে নিয়ে থাকে, আমারই মতো একা। হয়তো বা আমাদের মতো একা মেয়েদের আড্ডা আর 'হোম মেকার' মেয়েদের আড্ডা একটু আলাদা। ঘর/বাহিরের বৈপরীত্যের মধ্যে আমাদের পরিসর যে ঠিক কোনখানে, তা বুঝতে পারি না। ঘরের দায়দায়িত্ব আমরা নিই ঘরের যে-কোনও পুরুষ সদস্যের মতোই, হয়তো বা তাদের থেকে একটু বেশি দায়িত্ববোধ নিয়েই। আর বাহিরের দায় মানি হয়তো বা কিছুটা মেয়েলি মন নিয়ে। চারপাশে যা-কিছু ঘটে যাচ্ছে, সেসব দেখি বা সে বিষয়ে কথা বলি নৈর্ব্যক্তিকভাবে, কিন্তু নিরাসক্ত মনে নয়। মানুষের উপর মানুষের অন্যায় দেখলে, ক্ষমতাহীনের উপর ক্ষমতাবানের অত্যাচার দেখলে আমরা অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে যাই, বন্ধুদের মধ্যে সেই উত্তেজনার বিনিময় করি। সভায় এসব কথা বলতে শ্রেয়া উত্তর দিল, "তার মানে আমাদের যাপনে ঘর/বাহিরের বৈপরীত্য টেঁকে না। তাই বলে আমাদের আড্ডা পুরুষালি নয় মোটেই। কত ছোট ছোট ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা বলাবলি করি আমরা, উচ্চ নয়, তুচ্ছ কথাতেই আমাদের ঝোঁক। পুরুষালি আড্ডায় সেসব তুচ্ছ কথার জায়গা নেই।"

আমি ভাবছিলাম পুরুষালি আড্ডা কি পুরুষরা সবসময় ভালোবাসে? 'পোস্টমাস্টার' গল্পে গ্রামে নির্বাসিত পোস্টমাস্টারটি তার অবসর-বিনোদনের জন্যে কোনও চণ্ডীমণ্ডপের জমায়েত নয়, চাইত সরলা কিশোরী রতনকেই। তার দূরে-থাকা পরিবারবর্গের জন্য মন কেমন করার ভাগ নিতে যে রতনই পারে, সে কথা তার বুঝে নিতে ভুল হয়নি।

শ্রীমতী সম্প্রতি একটি উপন্যাসে পড়েছে এক ধরনের আড্ডার কথা, যাকে বলা যায় স্মৃতিরোমন্থনের আড্ডা। অনেক দিন পর পুরোনো দিনের বন্ধুরা এক জায়গায় হলে যে ধরনের আড্ডা হয়। উপন্যাসটি থেকে কিছু অংশ কপি করে এনেছিল ও, পড়ে শোনাল— একটু একটু করে টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে পড়েছে ছয় মাঝবয়সী বান্ধবী। ফিরে গেছে ফেলে আসা সময়ে। যেন মাঝে তিনটে যুগ ছিলই না, আসেইনি। ঘটে নি অজস্র ছন্দপতন। যেন এখনও তারা দল বেঁধে কলেজের সেই সবুজ মাঠটায়।... কে নেই আর কে যে থেকেও নেই, এসব যেন মাথাতেই নেই কারও।

'চিরহরিৎ' নামে একটি উপন্যাস থেকে এই উদ্ধৃতি। উপন্যাসটি লিখেছেন পাঁচজন— নবনীতা দেবসেন, বাণী বসু, এষা দে, কণা বসু মিশ্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য। এভাবে একটি উপন্যাস লেখা হয়েছে 'সই'-এর উদ্যোগে। লেখিকারা সকলেই 'সই'-এর সদস্য। প্রকাশক পুষ্প প্রকাশনী।

কমলিকা বলে উঠল, ''আরে এরকম আড্ডা তো আমাদেরও জমে উঠেছিল সেদিন, না রে ঈশানী, যেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল উস্রির সঙ্গে? আমাদের সেই ছোটবেলার নাচের স্কুল, সেদিনকার আশা, স্বপ্ন, আর প্রতিযোগিতা— এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা যেন বর্তমানকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।''

ঈশানী এতক্ষণ কথা বলেনি। ওকে দেখে মনে হয়েছিল ও একটু লাজুক ধরনের মেয়ে। লাজুক মৃদু স্বরে ও কথা বলতে শুরু করল, ''আমি এবার মা-বাবার সঙ্গে গুজরাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে বেশ কয়েকটি 'বাওলি' আছে। 'বাওলি'গুলি বহু বছর আগেকার ছোট জলাশয়, তার পাড়গুলো বাঁধানো শুধু নয়, কারুকার্য করা। সবচেয়ে আশ্চর্য কারুকাজ আছে পাটানের 'রানী কি বাওলি'তে। জলাশয়টি তিনদিকে পাথর কুঁদে ভাস্কর্যের প্যানেলগুলি এক থেকে আরেকে নেমে গেছে নীচে, আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ সিঁড়ির ধাপ নীচের দিকে নেমে গেছে। সমতল থেকে অনেক অনেক নীচে। যেমন কুঁয়োর জল অনেক নীচে থাকে, এই বাওলির জলও তেমনি। হয়তো পাথুরে জমি বলেই। বেশ কিছু সিঁড়ির

পর চওড়া ধাপ আছে, এরপর আবার নেমে গেছে সিঁড়ি। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম, কত যুগ আগের এক রানি তাঁর শত সখী নিয়ে এই বাওলিতে স্নান করতে এসেছেন, আর সখীরা এই সিঁড়ির ধাপগুলিতে এখানে ওখানে বসে জমিয়ে গল্প করছে। মেয়েলি আড্ডার এ যেন এক রাজকীয় আয়োজন। গ্রামে গ্রামে পুকুরঘাটে চিরকাল ধরে মেয়েরা গল্পগুজব করে এসেছে। পাটানের এই 'রানি কি বাওলি' যেন সেই সংস্কৃতিকেই মহিমা দিচ্ছে।"

আমি বললাম, ঈশানীর কল্পনাটি ভারী সুন্দর। হয়তো ওই রানি কি বাওলিতে রানি তাঁর সখীদের নিয়ে নয়, হয়তো রাজার সঙ্গেই জলক্রীড়া করতেন, কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কী? পুকুরপাড়ের মেয়েলি আড্ডার সূত্রে আমার একটি লেখা মনে পড়ছে, শরৎকুমারী চৌধুরানীর 'আদরের না অনাদরের' এই কবিতাটিতে পুকুরপাড়ের মেয়েলি আড্ডারই এক বিবরণ আছে। তার থেকে জানা যায়, মেয়ের মা হওয়া মেয়েদের কাছে কতটাই অনভিপ্রেত ছিল সেই উনিশ শতকে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, মেয়েলি আলাপেও কন্যা-সন্তান বিষয়ে কী বিরূপ মনোভাব ছিল সেদিন। আজও হয়তো আছে গ্রামে-গঞ্জে, কন্যাভ্রূণহত্যা আজও দেশ জুড়ে!

শ্রেয়া একটু রাগের স্বরে বলল, "শুধু শিশুকন্যা কেন, মেয়েদের আলাপে মেয়েদের বিষয়েই কি বেশি সমালোচনা হয় না? একটা কথা তো খুব চলিত— মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু, সেটার সত্যিটা কিন্তু মেয়েদের আড্ডাতেও ধরা পড়ে।"

আমি বললাম, এ নিয়ে শুধু আত্মসমালোচনা করলেই হবে না, অবস্থাটা বদলানোর জন্যে যতটুকু পারি আমাদের প্রয়াস করতে হবে। মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের চর্চা তো এইজন্যেই এত প্রয়োজন। পুরুষরা কি আর একে অন্যের নিন্দে করে না, একে অন্যকে ঈর্ষা করে না? কিন্তু মেয়েদের প্রতি মেয়েদের নিন্দা, ঈর্ষা এমন একটা ক্ষুদ্র মানসিকতা থেকে উঠে আসে!

হয়তো দীর্ঘদিন ক্ষুদ্র পরিসরে দিন কাটানোরই প্রতিক্রিয়া সেটা। বাইরের পরিসরের মাপ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তো ভিতরের পরিসরেরও মাপ বড় করতে হবে। মেয়েলি আড্ডাকেও তাই আমি সচেতনভাবে আরও বিস্তারের দিকে আরও গভীরতার দিকে সঞ্চালিত করতে চাই। কিন্তু আমি একা চাইলে কিছুই হবে না, তোমাদেরও সবাইকে চাইতে হবে। আমার কথায় উৎসাহভরে সায় দিল সবাই। শেষকালে গান ধরল মেঘনা— 'আকাশ ভরা সূর্য তারা...'।



আড্ডার জলছবি

হিরণ মিত্র

ঠিক পনেরো বছর আগে

হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের বারান্দা হয়ে বিশাল বপু একজন মাঝরাতে ঢুকছে, বয়স চল্লিশের কোঠায়— আমরা হতবাক, গলায় বিভিন্ন নাকিসুরে শব্দ, এঁখানে কিঁ দীঁপকদা আছেন। দীঁপকদা ও দীঁপকদা। তার সঙ্গে আদিবাসী ভাষায়, অবোধ্য বানানো শব্দের তুবড়ি। সেদিন বিরানব্বইয়ের শেষ, গত শতকের ব্যাপার। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ। দরজাও ভেজানো, তার ফাঁক দিয়ে তীব্র ডাক আমাদের কানে আসে, ঘরের ভিতর অল্প আলোয় চলছে তুখোড় আড্ডা।

সেখানে আছেন মধ্যমণি দীপক মজুমদার। স্যাঙাত গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী শুভলক্ষ্মী ওরফে টিউলিপ, মন্দিরা মিত্র, অমিতাভ চক্রবর্তী, আমি, ফ্রাঁসোয়া ফ্লুরি, সুইজারল্যান্ডের লেতিত্সিয়া কোম্বা মিলানের। যে ব্যক্তিটি এসে ঢুকল সে বাঙ্গালোরের রঞ্জন ঘোষাল।

এই আড্ডা পরের দিন অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি তিরানব্বই পর্যন্ত চলেছিল। আর এই ছিল আমাদের প্রায় শেষ আড্ডা। কারণ উনিশে জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে দীপকদার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। সেই সময়, শোনা যায় উনি মন্দিরার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন, কী কথা আমরা জানতে পারিনি, সেই সুবাদে আমাদের কাছে খবরটা দ্রুত পৌঁছে যায় (আশ্চর্য সেই সকালেই একটা সবুজ ফুলহাতা কার্ডিগান পরে আমার কাছে আসেন। তখন মুভ ক্র্যাফট-এর ডাইজেস্ট ইস্যু নিয়ে শেষ পর্বের কাজ চলছিল। প্রুফ দেখা, ডামি বানানো, কভার ইতিমধ্যেই করে ফেলেছিলাম। মুভ ক্র্যাফট আগে সাদা কাগজে ডামি বানিয়ে তারপর নানা আঁকিবুঁকি কেটে লেখার জোগাড় করা হত। অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলত, যদিও তখন দীপকদা 'আসা' ছেড়ে দিয়েছেন। তবুও আমরা এটা যৌথভাবে করছিলাম। উনি আমার বাড়ি থেকেই লুথারিয়ান ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের অফিসে চলে যান। অসুস্থ হবার পর ওরাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি খবর পাই সুনেত্রা ঘটক মারফত বেলা দেড়টায়)।

নিউ টালিগঞ্জের বাড়িতে একতলায় বর্ষশেষের জমাটি আড্ডায় নানা কথা পাক খাচ্ছে। কখনও লিকার-চা, কখনও গাঁজা, রাম।

আমাদের আড্ডা মারার ভঙ্গি ছিল সাধারণ। কেউ কেউ দেওয়াল ঘেঁষে বসতে চাইত। কেউ বেশি নেশা হলে শুয়েও পড়ত। সময়ের সীমা নেই। সারাদিন, সারারাত, পরের দিন— এমনই ছিল। আসলে দীপকদার কথা বলা, তর্ক করা আলোচনা থেকে আলোচনায় চলে যাওয়া একটা অদ্ভুত শক্তি ধরত। উৎপলকুমার বসুর কাছে শোনা— এক সকালে ওঁর পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে হঠাৎ দীপকদা ও হোসেনুর রহমান ভীষণ তর্ক করতে করতে ঢুকলেন। বেশ কিছুক্ষণ উৎপলদাকে উপেক্ষা করে তর্ক করেই চললেন। তারপর একসময় অমনভাবেই বেরিয়ে গেলেন। পরে দীপকদা বলেছিলেন ওঁরা নাকি পার্কসার্কাস থেকে তর্ক করতে করতেই আসছিলেন। মাঝে একটু জিরিয়ে অমনভাবেই চলে যান। অতএব বোঝা যাচ্ছে রাস্তা যদি এমন হয় ঘরে ঢুকতে তো বছর ঘুরে যাবেই।

সেদিনের ঘটনাগুলো হয়ত পরপর সাজানো যেত না যদি না আমার কাছে বড় একটা স্কেচখাতায় পুরো সময়টা দৃশ্যবন্দি থাকত। আমার স্মৃতি খুবই দুর্বল। কথা, নাম মনে রাখতে পারি না। ছবির মতো দৃশ্য শুধু ভেসে থাকে। মুখ ভেসে থাকে, সময়কে দেখতে পাই। সূর্যের আলো, রাতের আলো ঠিক তার মতো দেখিয়ে যায়। কথাগুলো অস্পষ্ট শব্দের মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। ওই স্কেচখাতাগুলো গাইডবুকের কাজ করে। সবাই কথায় আড্ডা মারে, আমি ছবির।

এই রঞ্জন আসার পর আড্ডার চরিত্রটা একটু বদলে গেল। ও বরাবরই উদ্ভটপনার আড়ত। কখন যে কী করে বসবে কেউ তার জন্য প্রস্তুত থাকে না। রামের বন্যা বইছে, বুড়ো সন্ন্যাসী। গৌতম কখনও টেবিলে চেয়ারে, কখনও মেঝেতে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বেশ নেশাগ্রস্ত। তবুও হাতে গিটার। অমিতাভ, দীপকদা গাঁজায় আক্রান্ত। হঠাৎ গৌতম গিটার বাজিয়ে গেয়ে ওঠে, 'কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে'। রঞ্জনও গলা মেলায়। রঞ্জনের অভিযোগ 'মহীনের ঘোড়াগুলো'র গানে ওকে কখনও গাইতে দেওয়া হত না। দীপকদা মাথা ঝাঁকিয়ে চলেন, ফ্রাঁসোয়া এক কোণে মুচকি হেসে মাথাটা যেন জলের ওপর তুলে রাখার মতো তাকিয়ে থাকে। চোখে গোল চশমা ঝুলছে। লেতিত্ সিয়া পুরো কথা না বুঝলেও এতবার এই গান শুনেছে যেন সবটাই জানা। ও চোখ বন্ধ করে ধ্যানীর মতো বসে। অনেকক্ষণ গান চলল। এই একটা গানে গৌতম তখন ভীষণ মাতিয়ে দিত। প্রথম শুনেছিলাম শিশির মঞ্চে, আশির গোড়ায়। গানটা হঠাৎ একজায়গায় থেমে যায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা, গিটারের শরীরে চাপড় মেরে তাল রাখা হয়। তারপর উদাত্ত গেয়ে ওঠা। সুরে শরীর কেঁপে যেত। এমন এক মোহময়তা ছিল, জাদু ছিল। গৌতম গাইত ভীষণ ভালো, তার সঙ্গে যোগ হল নাচ। শরীর সাপের মতো দুলে যায়। শরীর মেঝে থেকে উঠে শূন্যে প্রায় ভাসতে থাকে। ছোট্ট ঘর গানের সুরে ফুলে ফুলে ভরে যায়। বেলোয়ারির কাচের মতো আলো ছিটকায়। আজও যখন খালপাড়ে আমার বর্তমান বাড়ির পিছনে ওই ঘরটার পাশ দিয়ে একা একা ঘুরি, শুনতে পাই অমন গান। বাড়ির সামনে ফাঁকা জমিটায় দীপকদা হেঁটে বেড়াচ্ছেন। অমনভাবেই জীয়ন-কলমিকে দেখতে পাই রাস্তায় খেলা করছে নাকতলার বুদ্ধদেব বসুর উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দার ধারে।

একবার কে যেন দীপকদার বাড়ি খুঁজতে এসেছে, অথচ ঠিকানা জানে না,বাড়ি চেনে না, শুধু জানে কাছে কোথাও থাকেন। সে চিৎকার করে, 'দীপকদা, দীপকদা' বলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। যদি কোনও বাড়ি থেকে উনি বেরিয়ে আসেন।

খাতায় একটা ছবি আছে, রঞ্জন আকাশের দিকে তাকিয়ে, নীচে কোণে একত্রিশ তারিখটা লিখে আবার কাটা। তার পাশে এক এক তিরানব্বই লেখা। এই সেই ছবি যেখানে নতুন বছরকে দেখছে রঞ্জন আর সবাই। ঠিক রাত বারোটায় হয়তো ! তারপর রঞ্জন গাইছে নাকি সুরে 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি'। স্ব-প-নে তা-হা-রে কু-ড়া-য়ে... দু'হাত উপরে তুলে। বিশাল ভুঁড়ির শরীর দুলিয়ে, গ্যালিস্

দেওয়া প্যান্ট ঝুলছে কোমর থেকে। দাড়ি নাড়িয়ে সে কী উচ্ছ্বাস নতুন বছরের প্রতি! তখনই দীপকদা একটা ভঙ্গি দিয়ে হেসে এসে দাঁড়ালেন। আমি দ্রুত এঁকে ফেলি সেই হাসি। দাড়ি-গোঁফহীন এমন দীপক-চেহারা শেষ ক'দিনের। গৌতম তখন বেশ বেহেড। লেতিত্সিয়াকে আদরে আদরে ভরিয়ে তোলে। লেতিত্সিয়া মায়ের স্নেহের মতো ওকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। গৌতম বাঁধভাঙা অবস্থায় মেতে উঠেছে। একসময় নুয়ে পড়ে ওরই কাঁধে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়ল।

অমিতাভ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে। হয়তো বলছে 'ইটস্ এ গ্রেট প্লেজার টু সি ইউ লাইক দ্যাট'। বাংলা পড়তে পারে না। কথায় ইংরেজি মিশে যায়। প্রতিদিন সকালে যখন ও এই বাড়িতে দীপকদার কাছে আসতো, দীপকদাই ওর লেখা থেকে পড়ে শোনাতেন। নতুন-পুরনো।

ফ্রাঁসোয়া নির্বিকল্প বসে আছে। হাতে সিগারেট জ্বলে যায়। মন্দিরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে সব দেখে যায়। গৌতম উঠে টেবিলে বসেছে। পাশে রামের বোতল, শুধু ঢেলে যায়। পায়ের উপর পা নেচে যায়। বেঁকে যায়, ঢলে যায়। এইখানে আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে। দীপকদা ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে উঠে আসেন সামনের ফাঁকা জায়গায়। আমি সরে গিয়ে ওঁকে স্পেস ছেড়ে দিই। উনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ওঁর সাম্প্রতিক প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলতে বলতে অভিনয় শুরু করেন। একটা কাঠের সিঁড়ি থাকবে, তাতে উনি উঠবেন, নামবেন, বসবেন। এইটার কথা আমি বহুবার ঋতবানের মুখে শুনেছিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, বলেওছিলাম সিঁড়িটা কমলা আর লালরঙে চোবানো হবে। কালো কাপড়ের সামনে মঞ্চের মাঝখানে রাখা থাকবে। অভিনেতা দীপকদা, একা, উনি এটা ওদের অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেনও। দীপকদা-ঋতবান কথোপকথন--- কথা কাটাকাটি হতে হতে দীপকদা বলছে, "তুমি কী ভাবছ আমাকে? তুমি জানো আমি কী পারি, না পারি?"

বলে দীপকদা একটানা নিজেই কথা বলছেন বেশ উত্তপ্ত হয়ে। তারপর দীপকদা যেটা করলেন, কুঁদঘাটের বাড়িতে একটা ছোট মই সিঁড়ি ছিল। ওই সিঁড়িটা নিয়ে একটা পারফরমেন্স। ঋতবানের সঙ্গে তর্ক করছেন। কিন্তু কখনও সিঁড়ির ওপরে উঠে যাচ্ছে। কখনও সিঁড়ির ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিচ্ছেন। কখনও সিঁড়িটাকে ক্রুশকাঠের মতো কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। কখনও ঢালের মতো ধরছেন।

আজ এই বিকেলটা দীপকদা, গৌতম, লেতিত্সিয়াকে নিয়ে কাটাতে বেশ লাগছে। আজ দশই জানুয়ারি, দু'হাজার তিন। এরা সবাই গত হয়েছে, তবু আছে।

আছে এমনভাবে এত অলক্ষ্যে,ভাবনায়, জীবনে, উসকানিতে,তা ঘুরে ঘুরে আসে। আজ আমি বড় একা। জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছর কাটিয়েছি এমন সব বন্ধুদের সঙ্গে। এমন যাপন করেছি, এত ছবি এঁকেছি, আমাদের এখন বহন করার পালা। সম্প্রতি এক তরুণ বন্ধুর কাছে আক্ষেপ করছিলাম, সেই সময়ের ডিসকোর্স আমাদের ভাবনার অনেক দরজা খুলে দিত। মরচে ধরা কব্জা আওয়াজ করে খুলে পড়ত। আজ আর তেমন আড্ডা নেই। ডিসকোর্স নেই। গৌতম— যার গিটার যখন-তখন বেজে উঠত, শেষ যেদিন গৌতম আমার বাড়িতে আসে অত্যধিক ভদকা খাওয়া হয়। সারাদিন আমরা আর কিছু খাবার খাইনি। চারিদিকে বইয়ের, ছবির পাঁজা। হাত ভর্তি ধুলো। ওর ফোন আসে, আসছি। মৃদু আপত্তি করেছিলাম, বলে ওঠে এমন দিনেই তো আমরা এসেছি। কাঁধে গিটার,পা টলমল। সঙ্গে তৎকালীন লন্ডনবাসী অরুণ হালদার, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী। সম্পর্কে মামা হন ওঁর। সন্ধে পর্যন্ত হই হুল্লোড়, গান, টলতে টলতে বাড়ি বা অন্য কোথাও, ঠিক নেই।— দীপকদা একটানা অভিনয় করে ক্লান্ত হয়ে যান। হাতের নানা মুদ্রা, কোমরের ভাঁজ,ঘাড় সিধে ঝুলছে। একটা স্টান্স নিয়ে দাঁড়ানো, মাটি আঁকড়ে। তার হাত দুটো পাখনা মেলার মতো ছড়িয়ে দেওয়া। পাক দিয়ে ওঠা, ছিটকে শরীর থেকে বের করে আনা। বহুকাল পর বাঙ্গালোরে গিয়ে উৎকল মহান্তি, (রঞ্জনের বিজনেস পার্টনার) যে ওখানে দীপকদার সঙ্গে ওয়ার্কশপ করে শিষ্য বনে গিয়েছিল, ঠিক ওঁর মতো একটা পা সিধে রেখে আরেকটা পা হলহলিয়ে, কোমর ঝুঁকে, হাতটা গোত্তা মেরে উপরের দিকে তুলে— যেন দীপকদাকে হঠাৎ দেখতে পাই। গা শিহরিত হয়।

ততক্ষণে ফ্রাঁসোয়া এলিয়ে পড়েছে। হয়তো নেশায়। অথবা নেশার পরিবেশে নেশাগ্রস্থ। চোখে গোল চশমাটা তখনও বহাল। গৌতম আরও মদ্যপান করে আরও শিথিল হয়েছে। মন্দিরা আরও উজ্জ্বল, অমিতাভ উৎফুল্ল। তিন মক্কেল, গৌতম, অমিতাভ, ফ্রাঁসোয়া হয়তো কোনও নতুন চলচ্চিত্র-আলোচনায় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সার সার দীপক, গৌতম, অমিতাভ, ফ্রাঁসোয়া মুখোমুখি একপাশে। অন্য পাশে মন্দিরা, টিউলিপ, লেতিত্সিয়া। দেখছে।

—খাতা শেষ—

পিংক ফ্লয়েড শুনতে শুনতে মনে পড়ে যাচ্ছে রাতের আসরের কথা। যখন রাত এগারোটায় আমার পাশের চেয়ার, মোড়াগুলো ভরে যায় গত হওয়া বন্ধুদের ভিড়ে, সবাই একে একে এসে বসে।

এক এক করে

সবাই উঠে পড়ে

ওঠার আগে হাতলে

হাত রাখে

এমনভাবে স্পর্শ রেখে গেছে। বহুকাল আগে। এসে শহরের হালচাল শুধোয়। হাল হকিকত। 'হিরণ' গম্ভীর, মুর্ধণ্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে একটা গলা সব গলা ছাপিয়ে ডেকে ওঠে। দীপক মজুমদার। আরও শতবাব ডেকে যায়। ''কেমন ছবিটবি আঁকা হচ্ছে আজকাল''।

মন্দিরা অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। অমিতাভ স্থির। নেশায় টানটান। টিউলিপ ক্রমাগত অভিযোগ করে যায়। ''দীপক তুমি কিছু করছো না। শুধু বলেই যাচ্ছ।'' দীপকদার উত্তর— ''এখন আমি একে একে সব করে ফেলব। আমার যা কানেকশন, দেখে নেবে। একটা বায়োডাটা বানিয়েছি।'' ''রাখো তোমার ওসব।'' গাপুস তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। লেতিত্‌সিয়ার সেই শেষ কলকাতায় আসা। ডোরাকাটা শতরঞ্চির ওপর ছাইয়ের, সিগারেটের টুকরো, ছাইদান উপচে পড়ছে। দীপকদা চটি ফটাস ফটাস করতে করতে মাঝে বাইরে ফেলে আসেন। কানের তুলোটা ঠিক করে নিয়ে, একটা চারমিনার জিভে ভিজিয়ে ঠোঁটে ধরেন। আয়েস করে ধরান, ঝুঁকে পড়ে। মুঠো করে ধরে দু'আঙুলের ফাঁকে, লম্বা একটা টান দেন। চুপ করে থাকেন। ধোঁয়া গিলে, দম বন্ধ করে। শিরদাঁড়া খাড়া। পা পদ্মের মতো মোড়া, দৃষ্টি স্থির। কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যান। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠেন। বলে ওঠেন,''হিরণ কাউকে কিছু বোঝাতে পারছি না''। আমি বলি,''বোঝাবার কী দরকার। এমনই চলুক না।'' গৌতম বহুদিন ছবি বানাতে পারছে না। ছটফট করছে। ফ্রাঁসোয়া বহু দিন পর হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছে। রিল্যাক্সড। বহুদিন বাউল-ছৌ নিয়ে গ্রামেগঞ্জে দৌড়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার। লেতিত্‌সিয়া তখনও ধ্যানে মগ্ন। অমিতাভ অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে।''লেটস অ্যাকট নাউ। দীপকদা তুমি একটা ছবি বানাও।'' টিউলিপ দুধ ছাড়া গরম চা নিয়ে ঢোকে। বছরের প্রথম দিনে। এর তিন বছর পর গৌতম প্রথম ক্যাসেট বের করে। 'আবার বছর কুড়ি পর'। মহীনের ঘোড়াগুলির সংকলন, সম্পাদন। তখন দীপকদা কোথায়! গৌতম চলে যায় নিরানব্বইয়ের বিশে জুন। পঞ্চাশতম জন্মদিনের কুড়ি দিন পার করে। তার সাত দিন পরে লেতিত্‌সিয়া গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় মিলানে। এমনভাবে আড্ডা ভেঙে যায়। ডোরাকাটা শতরঞ্চি পড়ে থাকে মেঝে জুড়ে। আমরা অপেক্ষায় থাকি গুটিয়ে নেওয়ার জন্য।

দশ নম্বর পুকুর ও বাড়ির নাম তিস্তা

সঞ্জীব ও মধুমন্তী, কন্যা প্রকৃতি, রোববারের বিকেলে রিকসা, অটো পায়ে হেঁটেই আগেভাগেই সন্ধে গড়ানোর আগে চারতলার প্রশস্ত মেঝে, বিদেশি ও দেশি প্রিন্টের দেওয়াল ঘেরা ঝকঝকে আলোয়, পুরু কাউচে শরীর ডুবিয়ে দেয়। সেই বিকেলে চা এড়িট্। সরাসরি সূর্যের অস্তের অপেক্ষায় সুরার দিকে মন গড়ায়। সঞ্জীব স্নান সেরে শান্ত মনে মদ ঢালতে থাকে। রিফিলের পর রিফিল। আস্তে আস্তে দু'জন থেকে বাড়তে বাড়তে বিশজন।

বহুদিন তেমনভাবে আড্ডা দিইনি। গত হয়ে যাওয়া আড্ডাধারীরা আজকাল আর রাতের আসরে আসর জমায় না। মাঝে বেশ হত। বাঘা বাঘা চৌকস মন্তব্যে, হাঁটুর উপর চাপড় মেরে (সেইসময় মেঝেতেই বেশি আড্ডা গড়াত। এখনকার মতো এত দেড়ফুট উচ্চতায় টেবিলে আড্ডা ঝুলে থাকত না), গাঁজা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, যে হুংকার শোনা যেত, তাতে জানালার সার্সিগুলো ঝনঝনিয়ে, কেঁপে কেঁপে উঠত। যুক্তি, কাউন্টার যুক্তি, কেউ কাউকে মানত না। নেশা বাড়লে আসরও গভীর হত, তত্ত্বকথা, হালকা কথা, খুনসুটি, টিপ্পনি, কথার সিঁড়ি দিয়ে শুধু ওঠা আর নামা।

এখনকার মতো এত ওই 'হেডমাস্টারের' প্রাবল্য ছিল না। থিমমেকার, কবি, আঁকিয়ে, গাইয়ে, কত রঙ-বাহার! আড্ডা—স্বচ্ছ জলের মতো বইত। গ্রামে, মেঝেয়, রাস্তায়। তত্ত্বকথা, উক্তি, উপদেশ যেমন ছিল, তেমনই ছিল আবেগ, অনুভূত প্রস্তাবনা, মন ভরে যাওয়া ভাবনার খুলে-যাওয়া ঝাঁপি।

পার্বতী মুখুজ্যে ভারিক্কিচালে কথা পাড়েন। কয়েক দিন আগে বেরুনো গণশক্তি-র 'সকাল' পাতার এক প্রবন্ধের কিউবিজম বা ঘনকবাদের শতবর্ষ দুটির প্রসঙ্গে অরুণাভ সরকারের সংকলিত, ভাষ্য, সাক্ষাৎকার বিষয়ক প্রবন্ধ। অরুণাভ বয়সে প্রবীণ পরিতোষ সেনকে, যিনি আবার দীর্ঘদিন প্যারিসবাসী ছিলেন, খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন নানা আন্দোলনে, তাঁর ও আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেয়। বহু পত্র- পুস্তিকার সাহায্যে গেঁথে তোলা ওর অনুভব ও খবরাখবর। লেখাটি বেশ। বিষয়ের প্রতি আগ্রহ আনে। যাই হোক পার্বতীদা প্রসঙ্গটি টেনে আনতে চেয়েও বিফল হন। কারণ সেই বিকেলে কারওই কিউবিজম সুরাপানে তেমন উৎসাহ ছিল না। যদিও সঞ্জীব তার ঘরটি পিকাসোর গার্ল উইথ মিরর, মিরো, ক্লি দিয়ে এক পশ্চিম ও পূর্বের কে জি সুব্রহ্মনিয়ম, বিনোদবিহারী ইত্যাদি দিয়ে শিল্প সজ্জিত করেছে, তবুও আড্ডা, সুরা, গোল হয়ে বসা, সন্ধে গড়ানো, দক্ষিণী বাতাস,

কোনও কিছুই দানা বাঁধতে দিচ্ছিল না। হঠাৎই এক বিতর্কের ঢাকনা খুলে গেল। কলকাতার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্যের সুলুকসন্ধান শুরু হল। তেমন কি কারও চোখে পড়েছে। আশুতোষ এলেন, সুরেন বান্যার্জি এলেন, গান্ধী এলেন, নেতাজি এক ও দুই এলেন, শেষে ক্ষুদিরাম। পার্বতীদা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন কোনটা পড়ে যাচ্ছে কোনটা দাঁড়িয়ে। প্রদোষ দাশগুপ্তের নেতাজি ভারসাম্য রাখার জন্য, পিঠে বিশাল ওভারকোট চাপিয়ে নেন। শুরু হয়েছিল শর্বরী রায়চৌধুরীর কাগজের মতো পাতলা রবীন্দ্রনাথ, যা রবীন্দ্রসরোবরের হাওয়ায় প্রায় (!) দুলতে থাকে। রবীনদা (রবীন মণ্ডল) বললেন, "স্টুডিওতে তেমন খারাপ লাগেনি। তেমন পাতলা নয়। যা স্থাপনের পর পাল্টে যায়।" কালী (কালীকৃষ্ণ গুহ) সমর্থন করে। আমি যোগ করি, ভাস্কর্য, তার স্থানকে, উচ্চতাকে, ভিউ পয়েন্টকে মাথায় রেখে যদি নির্মিত হয়, ঠিকঠাক অবস্থান থেকে অবিরত দেখা হতে থাকে নির্মাণের সময়, তাহলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। প্রদোষবাবু দেবীপ্রসাদ-এ শুনেছি এমনটাই করেছিলেন। আরও বলি, এই সব মোড়সাজানো— ভাস্কর্যমুর্তি-সংস্কৃতি যা এক ঔপনিবেশিক বা বিশেষ দর্শন-চাপানো সংস্কার এ আমার পছন্দ নয়। দৃশ্য-শূল বা আইশোর। একবার রামকিঙ্কর বেইজকে কলকাতায় পূর্ণেন্দু পত্রী ভাস্কর্য পরিক্রমায় এনেছিলেন। তিনি নানা বিতর্কিত মন্তব্য করে একটুকরো জমি ও সামান্য লোহা, সিমেন্ট, বালি চেয়েছিলেন তৎকালীন সরকার বাহাদুরের কাছে। কিছুই জোটেনি। পরে বহু ব্যয়ে ওঁর শান্তিনিকেতনের ভাস্কর্যের ধাতুসংস্করণ কলকাতায় বসানো হল। এই কথার পরও আমি আরও বিরূপ মন্তব্য করে উঠি ওঁর সুজাতা ভাস্কর্য নিয়ে যা বনের মধ্যে গাছের মতো এক দক্ষিণী ছাত্রীর দৃশ্য-প্রেরণায় বানিয়ে তোলেন। তার কাছেই ছিল বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন ভাস্কর্য। নন্দলাল ওই ছাত্রীর মাথায় পায়েসের থালা বসিয়ে তাকে সুজাতা বানাতে বলেন। এমনটাই শুনি। আমার মন্তব্যটা বেশ কটুই ছিল। বলেছিলাম, নন্দলাল সবেতেই একটা পুরাণযোগ খুঁজতেন। হাওড়া ব্রিজের মতো সেতুবন্ধন করে সুজাতাকে টেনে আনেন এই ভাস্কর্যে, যা এমন সুন্দর, স্বাভাবিক গাছের মতো ঢ্যাঙা ছাত্রীটির বেড়ে ওঠা দেহ। গাছের ঘেরা বনে হঠাৎ সুজাতার কী প্রয়োজন ছিল। মাথায় ওই ভার কেন তাকে আজীবন বইতে হল। এতে সবাই বেশ চটে যায়। তারপরও আড্ডা অন্যদিকে বাড়ে। প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-শিক্ষার কথা ওঠে। আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জ্যাঠামি নিয়ে বন্ধু পার্থপ্রতিমের কাছে শোনা এক গল্পের কথা তুলি।

অবন ঠাকুর তখন শান্তিনিকেতনে। নন্দলালের ছাত্ররা প্রায় ওঁর কাছে কাজকর্ম নিয়ে চলেছে। উনিও শেষবয়সে নানা ছবি-ভাঙার খেলায় মাতছেন, যা প্রতিষ্ঠানকে ভাঙে। নন্দলাল প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রতিষ্ঠান গড়ার। গুরু-শিষ্যে বিরোধ লাগে। ফতোয়া পড়ে ছাত্রদের উপর। এতে অনেকে চটে যায়। রবীনদা নন্দলালকে নিয়ে বলেন কোনও একজনের উক্তি, যামিনী রায়ের থেকেও বড় শিল্পী। উৎপলদা বেশ রাগের সঙ্গেই বলেন, নন্দলাল এক অসাধারণ শিল্পী। ভাবনার বাইরে। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ওভার রেটেড, জার্মান একসপ্রেশনিস্টদের কপি মাত্র। এ সম্বন্ধে বেশি না বলাই ভালো।

এই নন্দলাল আমাদের আসরে আসেন ভাস্করের হাত ধরে। সঞ্জীব বেশ কিছু ড্রয়িং বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে, সেগুলি ভাস্কর মুখার্জির শান্তিনিকেতনে করা। বালি কাগজে, কালো কালিতে, বাঁশের কঞ্চি বা অমন কিছুতে তড়িৎ কাজ। উৎপলদা বলেন, এগুলো তো নন্দলালের কপি ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিনিকেতনী ঘরানার। অমন কাগজ-তুলি, অমন কারুকার্য, অমন গাছপালা, জন্তুজানোয়ার একটা ছায়া তো আনেই। তবুও আমার কাজগুলো ভালো লেগেছে। ছবি যারা আঁকে না বা ছবির ঘাঁতঘোঁত যাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা নয়, তাদের কাছে অমুক অমুকের কপি, অমুক অমুকের ল্যাজ ধরা—এসব ভাষার কারুকার্য বেশ আসর জমায়, কিন্তু আমাদের মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা এনে দেয়। চিন্তার সাম্রাজ্যে অস্থির করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ছবির অনিশ্চয়তা আমাকে যেমন আরও অনিশ্চয় করে তোলে। পাশাপাশি নন্দলাল, অবন ঠাকুরের ছবির নিশ্চয়তা, কারুকার্য তথাকথিত ভারতীয় জমি আমাকে স্বস্তি দেয় না। সময় ও পরিমণ্ডল-আশ্রিত, প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছাড়া এই কারুকার্য আমার কাছে কার্যকারিতা হারায়। আমি যে ছায়া ও নীরবতাকে বোঝার চেষ্টায় আছি, তার যাত্রায় এক মানসিক অন্তরায় এইসব দৃশ্যকল্প। ওই রোববারের পর থেকে আমার ছবির দৃশ্য-দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই আড্ডা নিয়ে বিবরণই হয়তো কোনওভাবে নতুন দৃশ্য-সংলাপে নিয়ে যেতে পারে।

উৎপলদা সাদা রঙের খাটো ঢোলা পায়জামা, পরে থাকেন। বিনোদবিহারী মুখুজ্যের একটি প্রকৃতিপ্রেমী ছবি আছে, ঠিক ওইরকম। শান্তিনিকেতনের লাল মাটি পরনের কাপড়ের নিম্নাংশ লাল করে তুলত। তাকে এড়াতেই ওটি খাটো হতে থাকে। অনেক কথার মাঝে পাবলো পিকাসোও এসে পড়ে। আমি বলি, বাষট্টি সালে একবার ওঁর এদেশে আসার কথা হয়েছিল, শান্তিসম্মেলনে। উৎপলদা

বলেন. হ্যাঁ, ওঁর একটাই ইচ্ছা ছিল ভারতীয় ভাস্কর্য দেখার। নেহরু ওকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ওঁর ভয় হয়। উনি বলেছিলেন, আই উইল বি মবড্ ইন ইন্ডিয়া। তখন ওই পঞ্চাশ-ষাটেও পিকাসো পরিচিত ছিলেন ঠিকই, তবে 'অমিতাভ বচ্চন' ছিলেন কি না জানি না। আমি স্বাভাবিক টিপ্পনি যোগ করি।

হুইস্কির রিফিলে সঞ্জীবের অক্লান্ত মনোযোগ একবারের জন্যও ছিন্ন হয়নি। কালী এতক্ষণ চুপচাপ, হঠাৎ ওর অভিজ্ঞতা বা নিউইয়র্কের জাদুঘরের কথা তোলে। সেখানে ওর দেখা রোঁদার ভাস্কর্য ম্লান মনে হয় যখন ও পাশাপাশি অনামা, অখ্যাত এপিটাফ ভাস্কর্যগুলো দেখতে থাকে। তার অসাধারণ সরলতা আবেগ, ওর কাছে রোঁদা অর্থহীন, অসহ্য করে তোলে। আসলে শিল্পীদের পরিপার্শ্ব সচল করে রাখে। কবে কোনকালে, কবে কোন কবি কোন জাদুঘরে বিচ্ছিন্ন এক ভাস্কর্য দেখে তাকে বাতিল করবে তার অপেক্ষায় সে ভাস্কর্য গড়ে না। তার নিজস্ব পরিবেশ আছে। আছে তার স্থানমাহাত্ম্য। সেই চালচিত্তিরেই সে খোলতাই। তার ইতিহাস, তার গড়ে ওঠা, তার আঙ্গিক, এসবই শিল্পীর পর শিল্পী তার নিজস্ব পরিক্রমায় নিজেকে সম্পূর্ণ করে যায়। কবিরা তাদের ভাষা-যাত্রায় এই শিল্প-পরিক্রমাকে কতটা বুঝে উঠতে পারে আমি জানি না, কিন্তু এর খুঁটিনাটি দৃশ্য-ভাষা- যাত্রা অন্য মনোনিবেশ দাবি করে।

যাই হোক, আড্ডাটা বেশ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। নেশাটা তেমন জমেনি। সন্ধের আকাশ, দক্ষিণী বাতাস, কোনও কিছুই আমাদের এলোমেলো করছিল না।

পার্বতীদা যখন সেই কিউবিজম-এর লেখার কথা বলছিলেন তখন এই কথাও তোলেন রবীনদার এই দর্শনে আঁকা বেশ কিছু ছবির। মজার হচ্ছে, রবীনদার অকপট স্বীকার— হ্যাঁ, আমার বেশ কিছু ছবিকে অমন আখ্যা দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি কিউবিজম-এর কিছুই জানতাম না। তেমন কিছু দেখিইনি। পরে অনেকে বলেছে অমন কথা। আমি কিউবিজম বুঝতাম না।

এরই মাঝে তখনও নতুন দল বৈঠকে যোগ দেয়নি, অথবা দেব, দেব করছে, সঞ্জীব আমাকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা সুবোধ গুপ্তর কাজ আপনি দেখেছেন? একটা কিছু বলুন।" আমি কিছু বলার আগেই রবীনদা বলেন, "আরে কিছুকাল আগে ওর কিছু কাজ আমি দেখেছি এখানে। ও একটা বিশাল স্টেইনলেস স্টিলের বাসনপত্তর দিয়ে কী একটা বানিয়েছে মিত্তলদের টাকায়। তা প্রায় এখান থেকে যাদবপুর পর্যন্ত হবে।" আমরা ছিলাম এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে যাদবপুর এক কিলোমিটার তো হবেই। কল্পনা কত দূর যায়!

রবীনদা কথা না থামিয়ে ওঁর হাওড়ার কথা বলে যান। উনি যখন হাওড়া অঞ্চলে থাকতেন, যা ওঁর আদি বাড়ি, সেই বেলিলিয়াস রোড। লেদের কারখানা, লোহাপট্টি, সেখানে পাহাড় প্রমাণ পড়ে থাকত ফেলে দেওয়া, মরচে ধরা স্ক্র্যাপ। একবার ওঁর মনে হয় এগুলো নিয়ে একটা বিরাট গেট বা ওই রকম কিছু বানালে হয়। যে ভদ্রলোক এমন কাজে শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠায় সাহায্য করবেন ঠিক হয়, তার কোনও এক দুর্নীতির দায়ে চাকরি যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ শিকেয় ওঠে। তাই, আমাদের কে আর সাহায্য করবে বলে আক্ষেপ করে ওঠেন রবীনদা। সুবোধ গুপ্ত ভাগ্যবান। তার মিত্তল আছে। সঞ্জীব ধৈর্য হারিয়ে দিক পরিবর্তন করে আমার চৌকির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে, বলে, "বলুন তো একটু সুবোধ গুপ্ত"।

সুবোধ গুপ্ত বিহারী, পাটনার লোক। গোরু, গোবর, দুধের বাসন, এইসব বিহারী প্রতীক, সঙ্গে যোগ হয় 'বিহারী লালু'। এই যে এথনিক স্লট, যে স্লট নিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যে আগে কেউ খেলেনি, সেটাই ও বেছে নেয়। নিয়ন আলোয় লেখা 'বিহারী'। আমরা সংস্কৃতিগর্বী বাঙালি যেখানে বিহারী, ওড়িয়াকে হীন চোখে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে মশকরা করেছি, আর অন্য এথনিক স্লট তৈরি করেছি, কারণ ব্রিটিশরা আমাদেরই ওদের প্রতিভূ বানিয়েছিল। সাংস্কৃতিক ঠিকাদারি দিয়েছিল আর সেই মৌতাতের সুযোগে নব্য ইউরোপীয় উত্তর-আধুনিক বাজার-নির্ভর খাঁজে ওরা ওড়িয়া, বিহারী গুঁজে দেয়। আমরা আমাদের গর্ব নিয়ে এখনও আসর কাঁপাই। সুবোধ গুপ্ত বড় বড় স্টেইনলেস স্টিলের বাসন দিয়ে স্থাপনাশিল্প গড়ে। পিছনে চালায় রাখে দেওয়াল ভর্তি বিশাল আকারের গোরুর ছবি। ভেনিস বিয়েনালে বিশাল, প্রায় বিশফুট উঁচু দুধের বালতি মেঝে জুড়ে থাকে। এই সুবোধ জার্মানিতে মিত্তলদের পয়সায় ক্ষুধা বলে এক স্থাপনাশিল্প বানায়। এক হাঁ করা মড়ার খুলি। পাত্রভরা দোকানের আলোকচিত্র তুলে তাকে ক্যানভাসে অ্যাক্রালিকে এঁকে বাস্তব বা ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতা দিয়ে ওর ভাবনা মেলে ধরে। এখানে কল্পনা বা ইমাজিনেশন বাহুল্য, অলঙ্কার, বাস্তবতা, এথনিক রিয়ালিটি প্রামাণ্য। শিল্পীর শিল্পদক্ষতা এখন তার স্থান পাল্টেছে। কার্যকলাপ পাল্টেছে। শুধুমাত্র দৃশ্য ভাঙচুর নয়, নয়া নয়া দৃশ্যপ্রস্তাব নয়, দৃশ্যহীন, দৃশ্যকল্পনায় বুদ্ধিসর্বস্ব, যন্ত্রনির্ভর বিশাল কর্মকাণ্ড বাজার-আকর্ষণের বঁড়শি হয়ে উঠেছে। ভালো চারা চাই। বঁড়শি অপেক্ষায় আছে খাদ্য ও খাদকের।

এ সময় এক ঝাঁক কবি ঢুকল। দুই কবি ছিলেন কালী ও উৎপলদা। উৎপলদার শরীরটা ভালো ছিল না। বেশ দুর্বল। কাহিল। তারপরে জৈন ভাবনায় সূর্য ডোবার

পর খাওয়া বন্ধ করেছেন। কে একজন জৈনধর্মী কী সব বলেছে। কালী ওর শেষ কবিতার বই— রবীনদার প্রচ্ছদ, বিপিনদার ভাস্কর্য (বিপিন গোস্বামী) দিয়ে ভরানো— উপহার দিয়ে চলেছে। সঙ্গে এঁকে দিচ্ছে ছবির আঁচড়। এবার এল ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না, নমিতা চৌধুরী। সঙ্গে প্রবীর ও মিহির। প্রবীর কী এক ব্যবসা করে। মিহির অঙ্কের বিখ্যাত শিক্ষক ও অঙ্কধারী। দেশ-বিদেশে অঙ্ক করে বেড়ায়। যাক, এবার তো কবিতা শুনতে হবে। দেখা গেল, কন্যা প্রকৃতি ছোট্ট সুন্দর কালো খাতায় কবিতা লেখে। বাংলায় ও ইংরেজিতে। ওকে দিয়েই শুরু কবিতা-বাসর। আসলে এখানে বলে রাখা ভালো নমিতা যেখানে কবিতা সেখানে। লাইফবয় সাবানের বিখ্যাত স্লোগানের অনুকরণে, মানে স্বাস্থ্য যেখানে লাইফবয় সেখানে। কার এক কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ আমাকে আঁকার অনুরোধ এই ফাঁকে করে রাখল নমিতা। নমিতা আমাদের যোগেন চৌধুরীর ছোট বোন। সেই সুবাদে কবিদের প্রচ্ছদ উনি যখন-তখন এঁকে দেন। তাঁকে ডিঙিয়ে আমাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হল। তেমনই ওই কবির অনুরোধ। প্রকৃতির কবিতা দুটি পড়ার পর কালী বলে উঠল, "এত স্যাফো। আরেব্বাস! এ তো ভয়ানক লেখা! এমনভাবে নিজেকে নিয়ে খেলা, এমনভাবে দেখা, ভীষণ ব্যাপার!" মন্তব্য করছি না। কবিতাটা এখানে উল্লেখ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোথাও হয়তো ও ছাপবে। তার বিস্ময় চলে যাবে। এরপর কালীর সেই চটি, মুচি, গাছ, অপেক্ষার কবিতা। এই পর্যন্ত বেশ ছিল, হঠাৎ পান্নার ইচ্ছা হল ওদের পিঠোপিঠি ছবি নিয়ে আর আর্তি নিয়ে ওরও দুটো কবিতা পড়ার। আমার এগুলো পছন্দ নয়। এই জন্য যে, সব কিছুর একটা রেশ থাকে। একটা কবিতার রেশ সেই কবিতাকে অনেকটা ছড়িয়ে দেয় তার সুবাসে। হঠাৎ যদি কেউ গন্ধের প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে প্রতিটি গন্ধের মৌলিক মৌতাত হাওয়ায় হারিয়ে যায়। তার একটু আগে কালীর একটা পাঠানো চিঠি পান্নাকে নিয়ে লেখা, নমিতার কাছে ছিল, তা হস্তান্তর হয়। পান্না খুবই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আরও অনেক কথা হয়েছিল, তা উহ্য রাখছি। এরই মধ্যে দীপ্তিশ ঘোষদস্তিদার ছবি আঁকিয়ে, সদ্য মা হওয়া, মেয়ের বয়স নয় মাস— সুদেষ্ণা, মাধব মিত্র, দর্শনের অধ্যাপক, কৃষ্ণাদি, তপন কর ভট্টাচার্য, গল্পলিখিয়ে— সব বেশ ভিড় বেড়ে চলেছে। অসীম বান্যার্জি, বিচারপতি, স্ত্রীসহ চেয়ারে আরাম করে বসেছে। কবিতা চলছে, ছবি চলছে, মদ চলছে, ধূমপান বারান্দায়।

এরই মধ্যে মাধবদা বয়স ও সম্বোধনের বিড়ম্বনা— দু'চারটে গল্প ছাড়েন।

লিখতে লিখতে একটা ফোন এল আমার। বাথরুমে গেলাম। চোখে পড়ল কোনও এক গ্যালারি থেকে সদ্য ফিরে আসা একটা ক্যানভাস চুপচাপ প্যাসেজটাতে দাঁড়িয়ে আছে। হলুদ, সাদা, কালো, বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত মোটা ও সরু রেখার বুনোট, কোনও বিষয় নেই। তথকথিত পুরাণ নেই। গাথা নেই, অবয়ব নেই তাই অবয়ব। এই দৃশ্য-সংলাপ অর্থহীন। আক্ষরিক অর্থেই। আমার দৃশ্য-লেখন ধারার একটা ক্যানভাস। কাগজে, ক্যানভাসে, কাঠে, ধাতুতে এমন দৃশ্য-লেখন চলছে আমার বেশ কিছুকাল। এর কোনও বাজার নেই। তাই গাথাও নেই, কোনও প্লট তৈরি করা হয়নি এর জন্য। বিকারগ্রস্ত মনের একান্ত চেপে রাখা আবেগ, নির্জনতায়, একাকিত্বে, নিজেদের কথোপকথনে নিজেরাই ব্যস্ত থাকে, আড্ডা মারে। মাঝদুপুরে। মাঝরাতে। ভোরের আলোয়। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আঁধারে। কোনও বিরাম নেই। তাই এই আড্ডার কোনও সঙ্গী নেই। রং বোলানো আর না-বোলানো, শূন্য ও ভরা্তি অংশের এই যে আড্ডা, চটুলভাব, পুরাণহীন, হাল্কা ফুরফুরে এমন চলনকে বেশ ব্যঙ্গ করে লোকে। আমিও করি। বলি সত্য পরাধীন, মিথ্যা স্বাধীন, কে যেন বলেছিল। সত্যের সত্য আছে, মিথ্যার কেউ নেই। একটা সাদা আস্তরে কাগজে বা ক্যানভাসে যখন ধূসর ছায়া পড়ে, কালো ঘন আঁচড় খোদাই হয়ে যায়। হঠাৎ করে তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। বড় বড় শিল্পীদের প্রতিভার ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে খোলা উঠোনে, মাঠে ময়দানে প্রখর রৌদ্রে তাপে দগ্ধ হয়ে যেতে আরাম লাগে। শরীর ঘামে ভিজে নরম হয়। আস্তর ভেজায়।

আড্ডাটা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এবার হয়তো সবাই উঠে যাবে। আমরা কয়েকজন, আমি, মিহির, নমিতা, বুলি, সঞ্জীব, মধুমন্তী, প্রকৃতি, তপন শেষ করেও শেষ করতে পারছি না। মিহির শুরু করল কবে একদিন সাউথ পয়েন্টের কিছু ছাত্র অঙ্ক-ভাবনা নিয়ে একটা বৈঠক করে, যেখানে একটি প্যারাডকস নিয়ে কথা ওঠে। তার সমর্থনে যখন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ সাত ক্লাসে পড়া একটি মেয়ে বলে ওঠে, হ্যাঁ, এতে অসুবিধার কী আছে? এমন তো ভাবাই যেতে পারে। মিহিরের উৎসাহ দু-গুণ হয়। অঙ্কে ও ভাবনায়। সঞ্জীবের স্নানঘরে হোকুসাইয়ের একটা উড্‌কাট প্রিন্টের প্রিন্ট আছে। গ্রেট ওয়েভ বা মহান ঢেউ। হোকুসাই জাপানে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাঠখোদাই বা অন্য মাধ্যমে করা ফুজিয়ামার নানা দৃশ্য বানিয়ে তোলেন। যেখানে এই মহান ঢেউয়ের মধ্যে ফুজিয়ামাসদৃশ ঢেউকেও পুর্নসংযোজন করেন। আমি ওকে চিনিয়ে দিই সেই ঢেউ। মূল রচনার প্রায় একশো বছরে পরে এর খ্যাতি হয়। আইকন হয়। বহুচর্চিত

হয়। সন্দেহ জাগে রচনা আগে না তার প্লট। কবে কোন প্লট কোন রচনার জন্য কত কত বছর অপেক্ষা করে আছে। ফ্যান গ'খ (ভ্যান গগ)-এর সূর্যমুখী অপেক্ষা করেছিল প্রায় সত্তর বছর। পিকাসোর বেশ্যা মহিলারা অল্প দিন, মাত্র, কুড়ি বছর। রথকোর ধ্যান-দৃশ্য তিরিশ বছর। সুবোধ গুপ্তরা ভাগ্যবান। হয়তো এখনকার তরুণ প্রজন্ম প্লট আগে খোঁজেন তারপর দৃশ্য। প্লটের চাহিদায় তৈরি হয় প্লট-দৃশ্য।

রাতের আহারে বসে যা হয় রন্ধন প্রণালী নিয়ে কেউ না কেউ প্রশ্ন করবেই। তারপর চলবে ক্যুইজ। তুমি উত্তর দিতে পারছ কি পারছ না। কী কী দিয়ে কী বানানো। পরের নানা ঘটনা দ্রুত ঘটে যায়। লিফ্‌টে করে নামা। মিহির, নমিতা, বুলির সঙ্গে গাড়িতে মোড় পর্যন্ত যাওয়া। তপন স্কুটারে ফিরে যায়। আমি বেশ রাতে বাহনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক বৃদ্ধ রিকশাওয়ালাকে পাই। তাতেই ফিরি। নতুন প্লট-ভাবনা নিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে জলপথ থেকে স্থলপথ। আড্ডা চলে ছবির সঙ্গে।

আড্ডা শুরুর আগে আড্ডা

প্রকৃতিকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি ছবি দেখো? মানে ভিসুয়াল আর্ট, আঁকা ছবি, ভাস্কর্য এই সব।" ওর সংক্ষেপে উত্তর, "তেমন নয়, তবে আকাদেমিতে গেছি। বিড়লাতে যাইনি। তেমনভাবে ছবির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তোমার ঘরে কী ছবি টাঙানো আছে একটা পিকাসো, সেটা ভালো লাগে। বাকি দুটোর একটা একদম নয়, অন্যটা মোটামুটি।" পরে দেখলাম মিরোর প্রিন্ট। এখান থেকেই সঞ্জীব প্রশ্ন করে, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে কেন ক্যান্ডিনস্কি, মেলচিভদের মতো শিল্পীদের চলে যেতে হয়েছিল। শিল্পীদের এই শাসকগোষ্ঠী কেন বুঝতে পারেনি। আমার উত্তর ছিল একদমই বোঝেনি। সে রাশিয়া হোক, চিন হোক পূর্বজার্মানি পোল্যান্ড। কারণ এই মতবাদ, এই কাঠামো এমন এক ভাবনা দ্বারা পরিচালিত যেখানে এই ধরনের দৃশ্য-যাত্রার কোনও স্থান নেই। প্রচার ছাড়া এই ভাবনা টেঁকে না। এই ভাবনার প্রসার হয় না। মানবিকতা, আবেগের কোনও জায়গা নেই। ব্যক্তি নেই তাই মিথও নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দল জেতে না, ব্যক্তি জেতে, আমরা এখনও জানি না। অন্তত কোনও প্র্যাকটিস এখনও একে, এই কাঠামোকে প্রামাণ্য করে তুলতে পারেনি। মোটা দাগে অনেক কথা বলে দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ

দেওয়া যেতে পারে। লেনিন, মাও কোট করা যেতে পারে তবুও কিছুই প্রমাণ হয় না। মাওয়ের শতপত্র বিকশিত হোক এই উক্তির পরও প্রশ্ন থেকে যায়— কার পুকুরে বা কার জমিতে? তোমার না আমার। আমরা-ওরা এই কথা এই কাঠামোকেই সমর্থন করে। সেখানে শিল্প নেই। বিশ্বজুড়ে যে তথাকথিত কমিউনিস্টদের আমরা দেশে দেশে দেখলাম, যারা বলল সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ক্ষমতা কায়েম করে বৃহত্তর জনগণের উপকার করবে, তা হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতালিপ্সু মুষ্টিমেয় দলীয় সদস্য। বৃহত্তর জনগণের উপর শোষণ করাই এই ঝান্ডাধারীদের মুল এজেন্ডা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর সবকিছুকেই বুর্জোয়া অপপ্রচার চালিয়ে তার আড়ালে থেকে ভয়ঙ্কর এক লাল ফ্যাসিস্ট হয়ে দাঁড়াল। সবই করল জনগণের নাম করে। এখানকার নেতা জ্যোতি বসু প্রায়ই ধমকের সুরে ভয় দেখিয়ে বলতেন, এবার জনগণকে বলে দেব। কিন্তু এই জনগণ কারা? এই জনগণকে এরা তাদের কান ও চোখ কি দিয়েছে? তাদের নিজস্ব চোখ, কান আছে কি? অথবা বোবা, কালা, অন্ধ এক রোবট জনগণ। চিনেও তাই দেখলাম। রাশিয়াতেও। শেষপর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছে তার ব্যাখ্যায় আর যাচ্ছি না। তখন সমস্ত আলোচনায় কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে এক সমঝোতার কাহিনি। অমুকের সঙ্গে অমুকের ভাব, কারণ এই বিষয়ে আমরা একমত। আর, বাদবাকী আলোচনার স্তরে। সমস্ত রাজনীতি ডিনার পলিটিকসে। কফি আর চায়ের কাপে। হাসতে হাসতে জবাইয়ের কাহিনি। শিল্প শেষপর্যন্ত আনন্দের, কি বিষাদের। প্রতিভা কি সাধারণের, সমষ্টির, কি ব্যক্তির, এই ধন্দ কাটে না। শিল্পীর স্বাধীনতা কী। কোন দেশে কোন শাসনব্যবস্থায় শিল্পী বেশি স্বচ্ছন্দ। সে কি মিডিয়া নির্দেশ দেবে। আবার এই মিডিয়া কোন পক্ষের। আমাদের না ওদের।

এই উপরের আলোচনাটা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। অতিথি আগমনে আমরা চুপ করে গিয়েছিলাম। ভিড় কমে এলে প্রকৃতি মিহিরকে বলে, "আমি এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য কোনও প্রদেশে চলে যেতে চাই। আর যেখানেই যাই অন্তত এখানকার থেকে ভালো হবে।" মিহির প্রতিবাদ করে বলে, এক কাঠামো থেকে আরেক কাঠামোতে গিয়ে পড়বে। আমি এই কাঠামোটার বিরোধী।" এই তর্ক শেষ হয় না। আমরা ফিরে যাই।

আড্ডা নিয়ে আড্ডা

কলকাতা, মফস্বল শহর, প্রত্যন্ত গ্রাম, বাংলার এক আড্ডা-আবহাওয়ায় বড় হয়েছি। আড্ডা না মারলে ভাত হজম হত না, এমনটাই। সাধারণত এই আড্ডাগুলো পরচর্চা, পরনিন্দায়, পরিভাষায় পি এন পি সি, তবুও তার মধ্যে ঢুকে পড়ত, আর্তিকথা, নিঃসঙ্গতার কথা, ভাবনার কথা, গভীর দর্শনও উঠে আসত প্রায়ই।

কাকে নিয়ে আড্ডা মারব, কী নিয়ে আড্ডা মারব, কোথায় আড্ডা মারব, কখন আড্ডা মারব— এসব কখনও পূর্বনির্ধারিত ছিল না। যেন আমরা সর্বক্ষণই ওই 'মোডে' আছি। পাত্র, পাত্রী পাল্টে যাচ্ছে। চটুলকথা, মন্তব্য, মশকরা, টিপ্পনি--এসবই এসবের মূল কাণ্ড। তারপর ডালপালা, পাতা এসব তো আছেই। আর আছে ওই মগডালে চুপচাপ বসে বসে মজা দেখার আড্ডাধারীরা।

ছোট বয়সে হাঁটতে হাঁটতে চলত কথা। মাঠের মধ্যে এক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অনর্গল কথা ঘুরত। কী যে এত কথা! কী যে বলতাম, মনে হত আত্মপক্ষ সমর্থনে অমন এক জায়গায় ঘুরপাক খাওয়া। ক্লাসের বেঞ্চে, কলেজের ক্যান্টিনে, টেবিল চাপড়ে তর্কের ঢেউ নিয়ে ওঠা পড়া। সে সব কম বয়সে গেছে।

ষাটের দশকে সুতৃপ্তি, অমৃতায়ন, কাফে ডি মনিকো, বসন্ত কেবিন, দিলখুশ, কফিহাউস, গরম ধোঁয়া ওঠা কাপের পাশে ঘিরে বসে থাকা উৎসুক গুলতানি। খালাসিটোলায় বা বারদুয়ারিতে আমার তেমন যাওয়া হত না, তবুও ছোটা ব্রিস্টল, ট্রিঙ্কাস, মোকাম্বো, ট্যাভার্ন-এ মাঝে মাঝে স্পনসর জুটত। ছোট বয়সে বাড়িছাড়া, পকেট প্রায় শূন্য, ছবি আঁকা, রঙ তুলি কিনে বাড়তি কোনও রেস্ত নেই, তাই বিকল্প ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত রাসবিহারীর বন্ধ দোকানের রকে কবি তুষার রায়ের সঙ্গে নেশা-আড্ডায় মজে থাকতাম। চলচ্চিত্রের শিল্প-নির্দেশনায় কাজ করেছি। এ ব্যাপারে তুষারের খুব আগ্রহ ছিল। নানা পরিকল্পনার কথা বলত। মনে হয় বানাত। ওই একই সময়ে একটা তরুণ কবিদের দলে আমার গতায়াত ছিল। প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জি, শামসের, আনোয়ার এমন সব। প্রিয়, সুরেন ব্যানার্জি রোডের অ্যাপার্টমেন্টে আমরা---কাচের সেন্টার টেবিলে, যার মধ্যে বিছানো ছিল চে গুয়েভারার বিখ্যাত পোস্টার, তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, চক্রাকারে কার্পেটে শুয়ে আমাদের আড্ডা। টেবিলটা দেড় ফুট উঁচু। তিন-চার মাপের মোটামুটি, আমাদের অনেকের মাথা এঁটে যেত। এমনভাবে আমার খিদিরপুরের এক চিলতে ঘরেও

মেঝেয় শুয়ে, সিলিং-এ টাঙানো ছবি দেখতে দেখতে কথা বলে যেতাম। ঘরটা অন্ধকার। একটা মতো বাতি হলুদ রঙের, কালো-সাদা উড়ন্ত পাখি আঁকা বিশাল ক্যানভাস, সিলিং থেকে ঝুলছে, তার দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আড্ডা দিয়ে যাওয়া। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। এমন ভঙ্গি কে যে আবিষ্কার করেছিল, জানি না, তবুও এক সূত্রে মালা গাঁথার মতো, বেশ আকর্ষণীয় ছিল। গা এলিয়ে বসা, মাথা ঝুঁকে, নেশায় ও কথায়, তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়া, যেন কথাও শুয়ে পড়ত। আরেক বিশাল আড্ডাধারী ছিল বিশাল মুখার্জি। ওর সঙ্গে কলেজে আঁকত এখন বার্নবাসী তপন ভট্টাচার্য। বনেদি বাড়ির ছেলে উত্তর কলকাতার, সুপুরুষ। পরে ইতালীয় অভিজাত রমণীর প্রেমে পড়ে, বিবাহ করে জার্মানিতে থাকতে থাকে। আমরা বহু সময়ে আড্ডা মারতে মারতে ট্রেনে চেপে দূরের পাহাড় জঙ্গল নদীঘেরা উপত্যকায় চলে গেছি। সঙ্গে গেছে, তাপস বোস, কুণাল কর, এমন অনেকে। আমার সহশিল্পী ও সহপাঠী বাঁধন দাস বেশ আড্ডাবাজ ছিল। ষাটের শুরুতে ওর বাড়ি আমার এক প্রিয় আস্তানা। দেশপ্রিয় পার্কের পাশে, সুতৃপ্তি কাফের উল্টোদিকে প্রিয়া সিনেমার পিছনে ওদের বিশাল বাড়ি। আজও দাঁড়িয়ে। তারই তিনতলার ঘর। তারপর আমরা কলেজ ছাড়লাম। অনেক দূরে চলে গেলাম। কেউ কারও খবর জানতাম না। বহু বছর, প্রায় তিরিশ বছর পর, আবার দেখা হল। কথা হল। রাত জাগা হল। আড্ডা হল। বাঁধনকে মাঝে মাঝে 'মা' এই শব্দটা পেয়ে বসত। মিশ্ররাগে এই মা শব্দটা ও নানা লয়ে ও গেয়ে যেত। রাত কেটে যেত মায়ে। ওর গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। ত্রিপুরার দিকের ছেলে। ওই দেশীয় ভাষায় ও উচ্চারণে আসর জমিয়ে দিত। তেমনি ছিলেন প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী। এইসব বয়স্ক শিল্পীর দল। এমনই এক প্রিয় জায়গা ছিল 'চিত্রবাণী'। রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করার পরও আমাদের আড্ডা থেমে থাকেনি। এখানকার মধ্যমণি ফাদার গাঁস্ত রোবের্জ, দীপক মজুমদার, পরে উৎপলকুমার বসু। স্যাটেলাইট অনেক। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রুচির যোশি, সুনেত্রা ঘটক, সেলিম, শেখর দাস, এমন সব। ওখানেই এক গ্রাফিক ওয়ার্কশপে মুনমুন সেন যোগ দেয় ছাত্রী হিসেবে। ও-ই আমাকে এক প্রাচীন চিনে খেলার বই ধার দেয়। ওর ডিজাইনে খুব দক্ষতা ছিল। রঘুনাথ গোস্বামী এই ওয়ার্কশপের পুরোধা ছিলেন। আমাদের আড্ডা উত্তর থেকে দক্ষিণ, মধ্য কলকাতা ছুঁয়ে মাঝে মাঝে পূর্বে ও পশ্চিমে চলে যেত। তেমনই ম্যাডাস স্কোয়ারে নীলা সেন, বিক্রম সেনের বাড়ি, পাশে জগন্নাথ গুহ, প্রিয় গুহ, প্রাক্তন নগর স্থপতির

বাড়ি। এখানেও ছিল গোল হয়ে বসে পড়ার সুরার আসর। সে এক জমকালো সময়। এমনই জমকালো, এক সন্ধে, পাশের বাড়ি জগার ঘরে গুলতানি চলছে। জগা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দ্রুত ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে। কার উদ্দেশে জানা নেই। বড় বড় জানালাগুলো খোলা। আমরা ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করি। ও বলে সমস্যাটা যারা পাশের বাড়ি থেকে এই অবস্থায় দেখছে তাদের। ওর কোনও দায় নেই জানলা বন্ধ করার। জগার বাবা প্রিয় গুহ আমায় ওঁর অনেক বিদেশি তুলি উপহার দিয়েছিলেন। এখানেই আসত গৌতম ঘোষ। পরে জগাও বাড়ি বিক্রি করে চলে যায়, নীলারাও ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসে হাজরা রোডে। সেখানেই পাই সুরারসিক অনিরুদ্ধ লাহিড়ী ওরফে চাঁদকে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরীদের পাই ক্যালকাটা ক্লাবে। যে ক্যালকাটা ক্লাব আর চৌধুরীদের বাড়ি প্রায় মুখোমুখি, পায়ে হেঁটে রাস্তা পেরোলেই। তবুও বরুণদা গাড়ি নিয়ে সাত রাজ্য ঘুরে ঢুকতেন ক্লাবে। রাজার মতো। একথা বললাম এইজন্য যে এই সন্দীপনদার সঙ্গে বহু বছরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার, গল্পগাছার, বিস্তৃত কাহিনি এড়িয়ে যাওয়া গেল। দীপক মজুমদার এসেছেন সত্তরে। ষাটের তালিকা দীর্ঘ। উত্তরে মিনার্ভা থিয়েটার, বিডন স্ট্রিট, দক্ষিণে মুক্তাঙ্গন। মধ্যে সিনে ক্লাব অব্ ক্যালকাটা। নরেশদার ফরেন পাবলিশার্স। চরিত্র বিচিত্র। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, অমল দে, প্রমোদ লাহিড়ী, অসিত পুরকায়স্থ, অরুণ মুখোপাধ্যায় (চলচ্চিত্র), শ্যামল দত্তরায়, প্রণবরঞ্জন রায়, মনু পারেখ, যতীন দাস, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় দে, অনিমেষ নন্দী, যোগেন চৌধুরী, সুনীল দাস, গণেশ পাইন, ইন্দ্রনীল-কিম, অনীতা রায়চৌধুরী, দিলীপ ভৌমিক, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামানন্দ জালান, জয়ন্ত কৃপালনী, নভীনকিশোর, মনোজ চক্রবর্তী, সুজিত সান্যাল, সুমন চৌধুরী, এরা বিচিত্র পেশার লোক। এক-একজনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মনোজদা নাম্বার টেন সিগারেট খেতেন, আরজি-এর আপিস থেকে পায়ে পায়ে ধর্মতলার মোড়ে আসার সময় লম্বা টান মেরে অদ্ভুত সব কাহিনি শোনাতেন। দু'একটা নমুনা— নেতাজি সুভষচন্দ্রের বেজায় ভক্ত। কয়েকদিন আগে, সেটা সত্তর দশকের শেষ, নেতাজি বম্বে শহরে, মেরিন ড্রাইভের ধারে চটের জামা পরে, ডালডা টিনের কৌটো নিয়ে ভিক্ষে করছেন। আসলে ছদ্মবেশে এসেছেন কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে। গভীর বিশ্বাসে বলা। একটা সময় গঙ্গার তলাটা তামার পাতে মোড়া ছিল সেই বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত। সেই মহামূল্য তামার পাত বিক্রি করেই নাকি ব্রিটিশরা দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের বিশাল ব্যয় সামলেছিল। নির্বিকার মুখে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে রোজই ঝুলি থেকে নানা খবর বের করতেন। দুঃখের ব্যাপার অনেকগুলোই ভুলে গেছি। বিচিত্র গল্প, অদ্ভুত মশকরা, গাম্ভীর্য, রসে-বশে মেশানো। বিচিত্র ভাষায় কারুকার্য, গল্পগাথায় জীবন বিতানো অদ্ভুত সুখের সময়। সময় কোথা দিয়ে বয়ে যেত। খিদে তেষ্টা ঘুম টের পেত না। এত অলস সময়, এত নিষ্কর্মা সময়, এত চাহিদাহীন সময় আমাদের জীবনকে বোঝায় ভরায়নি। বোঝা হাল্কা করেছে। তাই কিছুই চাইনি কখনও। এখনও আড্ডা এক প্রাণের ছোঁয়ায়, অট্টহাসে, মশকরায় আমাকে জীবিত করে রেখেছে। গ্রামের ছেলে। জোরে কথা বলার অভ্যাস, তাই জোরে আড্ডা মারা। কখনও কার্জনপার্কের তিন গাছের মাঝে, ট্রামগুমটিতে, তিলকের পাদদেশে, উত্তর কলকাতার রেলিঙে বসে, শহিদ মিনার, শহিদবেদি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বড় বড় গাছতলায়, চিড়িয়াখানার নানা খাঁচার পাশে, জাদুঘরের বারান্দায়, ভিক্টোরিয়ার পরিত্যক্ত মূর্তির নীচে, পিজি হাসপাতালের চত্বরে, গঙ্গায় ভাসমান কন্টিকিতে, জ্যোতি দত্তের হাজরা পার্কে, পুরনো মন্দিরে, জাহাজঘাটে, আর্টকলেজের ডুমুরতলায়, পাথরের বেদিতে।

ছবি-আড্ডা, নাটক-আড্ডা, গান-আড্ডা, লেখা-আড্ডা, ফিল্ম-আড্ডা, দুষ্টু-আড্ডা, আড্ডা, আড্ডা আজও আছে।

কত ঠেক। কখনও অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর ঠেক, কখনও অভিজিৎ নাথের ঠেক, কখনও শান্তিনিকেতন, কখনও প্যারিস, কখনও লন্ডন তো, কখনও বর্ধমান।

ফিল্মমেকার শেখর দাস, সুমন মুখোপাধ্যায় থেকে চলে গেছি কল্যাণীর কিশোর সেনগুপ্তের আড্ডায়। সেখানে পাওয়া গেল দীপক মুখোপাধ্যায়কে। রাত কেটে গেল। ওখানে আমাদের আড্ডায় উঁকি মারত বাপী ব্যানার্জি-গল্প। তার নানা কীর্তিকলাপ। বাপীর সঙ্গে আলাপ হয় ষাটের শেষে। কী একটা ছবি বানাতে চায়। হিজিবিজি কাগজে, ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় কতগুলো কাটাকুটি। ওটাই ওর স্ক্রিপ্ট। আজও চলছে তেমনই। পাপেট অ্যানিমেশন। কিন্তু বাপীর সাথে পাশ্চাত্য চিত্রকর, ভাস্কর নিয়ে আড্ডা হত তুখোড়। কতক বানানো, কতক পড়া, অজস্র খবর নিয়েও ঘুরত। জাপানি চিত্রকরদের খবরও রাখত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ঠাঁয়ে দাঁড়িয়েও কথা বলে যেতে পারত। একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাব। না-জানা না-শোনার জন্য বারবার দোষারোপ। আমরা কুঁকড়ে থাকতাম।

আড্ডার মধ্যে আড্ডা কেমন চেহারায় থাকে তার কিছু বিবরণ ধরা যাক। রঘুনাথ গোস্বামী, গঙ্গার ধারে, আউটরাম ঘাটের উল্টোদিকে, মাঠে বসে, পোর্ট

উইলিয়মকে পিঠের দিকে রেখে আমার 'সাক্ষাৎ' নিচ্ছেন। ওঁর সংস্থা আর জি-এর শিল্পী হিসেবে আমি যোগ দেব। তারই মহড়া। প্রসঙ্গ ভূত। আমি ভূত বিশ্বাস করি কি না। অথবা তেমন কোনও গল্প জানা আছে কি না। অ-দ্ভু-ত ব্যাপার। বললাম, আমার দাদার শ্বশুরমশাইয়ের নানাজনের ভূত দেখার গল্প। আমার বাবাও ভূত দেখেছিলেন। এত বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের বাইরে। কারণ অমন খেলার খোলা মাঠে, ভরদুপুরে, পাশে দুর্গ রেখে ভূত নিয়ে কথা বলাই যায়। দাদা হাসপাতালে মাঝরাতে দীর্ঘকায় ছায়াশরীরকে হেঁটে যেতে দ্যাখে। দ্যাখে সেই অ-শরীরী মাতৃসদনের কাছে গিয়ে মিলিয়ে যায়। এক সঙ্গে অনেকে নাকি দ্যাখে। নার্স পিছু নেয়। ছুটে আসে। কাউকে পায় না। তেমনই শ্বশুরমশাই পোড়ো বাড়িতে হাড়ের ঠোকাঠুকির আওয়াজের উৎস খুঁজতে গিয়ে ইটের দেওয়ালের মাঝে টুকরো মানুষের হাড় আবিষ্কার করেন। বাবা মাঝরাতে গভীর পাহাড় জঙ্গল পার হতে গিয়ে ভূতের গলার আওয়াজ পায়। ভ্রম হয়, গ্রামের লোক কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। সন্দেহ হয়। যেদিকে যাচ্ছে ওরা, ওদিকে জানত কোনও রাস্তা নেই। পরে দেখে ওখানে ওই পথে ছিল বিরাট এক গিরিখাদ।

বিজ্ঞাপনে এসে আলাপ হয় ময় রায়, ব্রতীনদের সঙ্গে। ব্রতীনের সাথে কলেজেই যোগাযোগ ছিল। ওর স্ত্রী আমার সহপাঠি ছিল। গৌরাঙ্গ রায়চৌধুরী, সৌমিত্র বান্যার্জি, সঞ্জয় ঘোষ, রমেন মিত্র, জহর ঘোষ এরা সবাই ফিনিক্স, আই পি বি, কন্ট্যাক্ট সূত্র ধরে আড্ডায় চলে আসে। রংগন চক্রবর্তী, ছন্দা কার্লেকর, বরুণ চন্দ, শ্রীরূপ গুহঠাকুরতা, বন্দনা দত্ত, যুগান্ত দত্ত, এরাও কর্মসূত্রে এই বৃত্তে চলে আসে। সারাজীবন এত আড্ডা মেরেছি এখনও তাতেই আছি, এত আড্ডাধারী, তাদের সংখ্যা নিরুপণ করা সহজসাধ্য নয়।

চাঁদের বাড়ির আড্ডা। চাঁদ মদ নামক বস্তুটিকে প্রায় মাতৃস্নেহে, দু'হাতে সন্তানের মতো ধরে গলাধঃকরণ করে, প্রশান্ত মুখ তুলে তাকায়, যেন ভীষণ তৃষ্ণার্ত। এমন স্নেহে মদ্যপান করতে প্রায় দেখা যায় না। সেই আড্ডার পাশেই একটা বিছানা, তার উপর মশারি খাটানো। তিনটি দড়ি টাঙানো। একটি খোলা। চাঁদ ওই একটি দড়ি লাগানোর অবস্থা পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে যায়। টাঙায় ও ঢুকে পড়ে। তাই কোনও হেলদোল নেই। একাট চেয়ার ডিঙোতে পারলেই হল। সম্প্রতি দেখা হয়েছিল। অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ওটুকুও আর পারা যাচ্ছে না। তাই নাকি দীর্ঘ বিরতি।

এমনিই ঘটে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সে এক বিদগ্ধ আড্ডা। শিবাজীর শিষ্যকুল ও বন্ধুরা শিবাজীকে অসম্ভব ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। তার রেশ ঘরময়। সুবাসে ভর্তি। মদের গন্ধ সেখানে পাল্টে ফুলের গন্ধের মতো জড়িয়ে তাকে। একটা আরাম। বেশ পা ছড়ানো, থিতু হয়ে বসা। শিবাজীর অসাধারণ বাকপটুতা সবাইকে মুগ্ধ ও বিমূঢ় করে রাখে। এখানে আসে অনুষ্টুপের অনিল আচার্য, প্রদীপ ভাওয়াল, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর বাড়ির ছেলে। এই আড্ডা কখনও কখনও পার্কস্ট্রিটের কোয়ালিটি পর্যন্ত চলে গেছে। শুভেন্দু দাশগুপ্তের বাড়ির আড্ডা বা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি পরিবেশ তৈরি করে দেয়, ঘরের চৌহদ্দিতে। শুভেন্দুর যেমন কেয়া, তেমনই রাঘবের বিশাখা। বাউলভাষায় বৈষ্ণবী। এদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের স্বস্তিতে রাখে। কত গভীর রাত, কত বিষয়, বিষয়ের নানা বাঁক আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যায়। নিজেকে বেশ ভরাট লাগে। এরই আরেক দিকে আছে ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়। সে রাঘবের বাড়ি, কলেজস্ট্রিটের চর্চাপদ-বইঠেক, ফ্রি-বার্ড-এ ঘোরাফেরা করে। অনেক রাতে বাড়ি পৌঁছে দেয়। সেই কাগজের বাঘ কলেজস্ট্রিটের, খোলামেলা মেলা, গৌতমের ঠেক, ইন্দ্রপুরী, বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম, খড়দহ, কেঁদুলি এক চলমান আড্ডা তরল করে ফাঁকফোঁকরে গড়িয়ে পড়ে। কোনও বাধা নেই। এমনি এক সন্ধেতে গৌতম সেনগুপ্ত, গল্পলিখিয়ে, প্রাক্তন অনুষ্টুপী, আমাকে ধরে নিয়ে গেল উদয় ভাদুড়ি মহাশয়ের এক ডেরায়। সেখানে পাওয়া গেল উর্মী ও তার কর্তাকে। কর্তা ছবি আঁকার চেষ্টায় আছে। আমায় কিছু টিপস্ দিতে হবে। রাতের আহারের বিশাল আয়োজন, সঙ্গীত সহযোগে। সুরা পান তো আবশ্যিক। এমন সময় অন্ধকার নেমে এল, লোডশেডিং। এই ভদ্রলোক উদয় ভাদুড়ি মশাই তখন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব বা অমন কিছু। দ্রুত ফোন বেজে উঠল। জানানো হল দশ মিনিটের মধ্যে এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। সময় লেগেছিল নয় মিনিট। আড্ডা চলল মাঝরাত পর্যন্ত। বাহনের ব্যবস্থা ছিল। উদয় ভাদুড়ি শুধু লেখেনই না। সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করেন। ওস্তাদ আমীর খাঁর ঘরানায় তেমনই কিছু আমাদের শোনানো হল, এমনকী এমন প্রশ্নের মুখেও পড়তে হল যে, উনি যে কালোয়াতি করছেন, গলা চিরে শব্দের সঙ্গে আবহাওয়া তৈরি করছেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে কি না। বলা বাহুল্য আমরা সুরায়, নারীতে মোহিত, সমস্ত শব্দ ও হুংকারই আমাদের সঙ্গীতময় লাগল।

সুর না থাকলেও আমাদের মনের সুর ও সুরায় তাকে শ্রুতিমধুর করে তুলতে লাগলাম। আমার সামান্য ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনার অতীত আছে। তাই

ফাঁকটা পুরণ হয়ে গেল। রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটল। সেই সন্ধ্যায় শিল্পী নিয়ে অজস্র প্রশ্নের, জটিল বিষয়ের মুখে পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সেই রামকিঙ্কর বেইজ থেকে হুসেন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথও একবার উঁকি মেরেছিলেন। ওদের তেমন নিরাশ করিনি, ভালো ব্র্যান্ডের বিলাতি সুরা জুটেছিল।

আড্ডা মারব বলে কেউ আড্ডা মারে না। কেমন কথার পিঠে কথা উঠে আসে। যেন বঁড়শিতে বড় বড় মাছ। ভালো চারা ও খেলানোর হাত থাকলে তবে ধরা পড়ে। তেমনই আড্ডা। এ এক অদ্ভুত শিল্প। তার ক্যানভাস, রঙ, তুলি কিছুই লাগে না। কিন্তু ছবিটা তৈরি হয়ে যায়। যারা এর স্বাদ পায়নি, তারা বুঝবে না। আমার বাবাকে দেখতাম, সন্ধেবেলায় ঈষৎ সিদ্ধি সহযোগে বন্ধুদের সঙ্গে বসতেন। এটা সিদ্ধির সরবত, ঘন সবুজ রঙের। বাবার বয়স্ক বন্ধুরা খাটো ধুতি পরে, জড়সড় হয়ে বসে পড়তেন প্রায় নির্দিষ্ট আসনে। একজনের সঙ্গে থাকত একটা দোনলা বন্দুক, আমরা ওঁকে বিষ্ণু মাইতি বলে জানতাম। তেমনই রামচন্দ্র মাল, আমার ঘনিষ্ঠ অগ্রজ শিল্পী হরভূষণ মালের বাবা। তখন ওখানে আমাদের থাকা নিষিদ্ধ ছিল। এই আড্ডা শেষ হলে সবাই চলে গেলে আবার, মানে আমি আর আমার খুড়তুতো বোন অনু, বাবার কোল ঘেঁষে বসে জঙ্গলের গল্প শুনতাম। তখন যেন গাছগাছালি, পাখি, জন্তু, পাহাড়, গ্রাম, খেতের সঙ্গে আড্ডা। কেমন রাতের আঁধারে বাবা পাহাড়ি জঙ্গল ডিঙোত, মাঝরাতে জঙ্গলে বাঘে এসে পা চেটে যেত তাঁবুর ভিতর ঢুকে ,এমনই সব কাহিনি।

সিনে ক্লাবের আড্ডায়, রাম হালদার, প্রমোদ লাহিড়ী, পরের দিকে সংগঠক শংকরদা (পদবি ভুলে গেছি), অজয় দে, আরও পরে সুধীন ব্যানার্জি, প্রকাশ দাস, জয়ন্ত ভদ্র, বিমল সরকার এদের পেয়েছি। বিমল আমার বিয়ের রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়েছিল সত্তর সালে।

সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের ছাতা কেমন দেখতে তখনই জানলাম। আর্ট কলেজে পড়ি। ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। নানা উৎসবে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সাজিয়ে তোলা, তারপর ছবি দেখা, নানা লেখাপড়া, গোদার, ক্রুফো, প্যাসলিনি, ফেলিনি, আন্তেনিওনি, যখন তখন আসতেন যেতেন। এঁরা প্রায় এসে পায়ের উপর পা তুলে বসতেন কোচে। তারকোভস্কি, কুরোসাওয়া, ওজু, ওশিমা মিজোগুচির সময় ষাটের দশক, আমাদের কাছে। কারণ সেই সময় ছবি বিদেশে রিলিজ করলেও এদেশে আসতে সময় লাগত। কিসলস্কি, কার্ল সউরা, আর্মাদোভার আরও অনেক পরে। ছবি দেখার আগে পড়াশুনা, দেখে এসে তত্ত্বালোচনা, সে এক পরীক্ষার সময়। ফরাসি,

জর্মান, ব্রিটিশ সংস্কৃত-ঠেকগুলোতে ছবি দেখা, ম্যাগাজিন ঘাঁটা মাঝে মাঝে আমেরিকান সেন্টারে। চলচ্চিত্র-আড্ডায় সেই সময় একটা নাক উঁচু, আনসেন্সরড প্রাপ্তবয়স্ক হাবভাব ছিল। নিষিদ্ধ এলাকার মতো, আড্ডাধারীদের চোখমুখ চকচক করত। এমন পারমিসিভ, সমাজ-অনুমোদিত-প্রায় বেশ্যাবাড়ি গমন এদেরকে বিশিষ্ট করত। একজন ছিলেন এখন গত হয়েছেন, তাঁর নাম গোপাল কর্মকার, সংক্ষেপে জি কে। ফেউ ডাকলেই যেমন বাঘের খোঁজ মেলে তেমনই কোনও চলচ্চিত্রে সামান্যতম নগ্ন দৃশ্য থাকলেই এই সদস্যকে ধারেকাছে পাওয়া যেত। লোকেও জেনে যেত ভিতরের খবর। এখান থেকেই এই মহলে চালু হয় 'ছবিতে জি কে আছে' এমন প্রবাদ। এক সন্ধেতে এই গোপাল আমাকে প্রশ্ন করে 'আরে এই ছবিতে জি কে আছে?''

ক্লাবসদস্যদের নিয়ে সেবার সুন্দরবন যাওয়া হবে বলে পরিকল্পনা হচ্ছে। গোপালও যাবে। হঠাৎ প্রশ্ন জাগে কেন যাবে। বাপী ব্যানার্জি বলে ওঠে, 'আরে, এও জানো না? গোপাল ওখানে ন্যুড বাঘিনীর স্নান-দৃশ্য দেখবে বলে আশায় চলেছে।'' হাসির রোল ওঠে। আরেকবার, আকাদেমিতে তখন ছবি দেখানো হত নাটকের বদলে। চেক্ ছবি, কারও মাথায় কিছু ঢুকছে না। পাইপ মুখে এক বিদগ্ধ অধ্যাপক হল থেকে বেরোচ্ছেন। সবাই ঘিরে ধরে। উনি ভীষণ গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন,''কাফ্‌কা পড়া আছে?'' সবাই মাথা চুলকোয়, ''না, মানে...।'' জানা গেল ছবির রিল গণ্ডগোলের, পাঁচের আগে ছয় দেখানো হয়েছিল। গল্প গুলিয়ে যায়। মৃতা নায়িকা ছবিতে আবার বেঁচে ওঠে। কাফ্‌কার এমনই হাল।

পঞ্চাশের শেষে ষাটের শুরুতে সিনে ক্লাব জন্মায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ভেঙে। পঁয়ষট্টিতে ফিল্ম ক্লাবের সেন্সরশিপ উঠে গেলে অনেক ক্লাবের জন্ম হয়। এখনকার সিনে সেন্ট্রাল, সিনে ইন্সটিটিউট এমনি। ষাটের দশক। রাজনৈতিক দামামা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। কিউবা, আলজিরিয়া, আর্জেন্টিনা উত্তাল। সেখানকার ছবি দেখানো হচ্ছে। আমাদের এই চলচ্চিত্র-আড্ডা তারপরে তিরিশ বছর বেঁচে ছিল মোটামুটি। নন্দন হয়নি। অনেকেই গত হল। সোসাইটির আকর্ষণ চলে যায়। ভিভিডি এসে কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতে। সেই আড্ডাগুলো ছিল চলমান, কখনও দণ্ডায়মান। অমল দে মশাই হাতদুটো মাথার উপর ঝোলানো সেতুর মতো রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা বার্গম্যান, আন্তিনিওনি নিয়ে বলে যেতেন। সাদা শার্ট, হাতা গোটানো, ধুতি। ব্যাঙ্ক কর্মচারী। কখনও প্রমোশন নেননি, এই চলচ্চিত্রে স্থির ও অবিচল থাকবেন বলে। চিনুবাবু আমাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতে

ডুবিয়ে দিতেন, ছবি দেখানোর আগে। বলে দিতেন কার কম্পোজিশন বাজছে। নারায়ণ চক্রবর্তী, শেষ দেখা নন্দনে, দিবারত্রির কাব্য বানিয়েছিলেন, বিমল ভৌমিকের যৌথ পরিচালনায়। সত্যজিৎ রায়ের পঞ্চাশতম জন্মদিনে, প্রথম, প্রমোদ লাহিড়ীর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক দিতে গিয়ে সামান্য আড্ডা হয় ওঁর বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে। এই প্রমোদদা, খনিমালিক, বিখ্যাত সব ছবির প্রযোজক, যা ওঁকে পয়সা দেয়নি একমাত্র 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছাড়া। 'পরশপাথর', 'লৌহকপাট', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ওঁরই প্রযোজনা। এঁর আবার শিকার ও ছবি তোলার নেশা ছিল। একবার কোনও এক জঙ্গলে গেছেন সরঞ্জাম নিয়ে, ক্যামেরায় ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স। ছবি তোলার পর দেখা গেল বাঘের শুধু ল্যাজ উঠেছে। লাহিড়ী মশাই গর্ব করে বলে ওঠেন, "বোঝো তাহলে, বাঘটা কত বড় ছিল।" রাম হালদার মশাই বিরাট শিল্প সংগ্রাহক, কমলালয় স্টোর্সের মালিক, খুবই গম্ভীর। সন্ধেবেলায় সুরাপানে মগ্ন থেকে, ক্লাবের পার্টিশন দেওয়া আপিসের ভিতরে কোচে বিশ্রাম করতেন। সে এক বনেদি ক্লাব-সংস্কৃতি।

ষাটের শেষে, সত্তরের শুরু প্রতিটা বিদেশি ছবির উৎসবে বেশ কিছু কিছু অস্থায়ী সদস্য নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ভালো রকম বাঁচা পয়সা ক্লাবের আয় হত। উৎসব প্রাঙ্গণ হইহই করে সাজানো হত। তোরণ, পোস্টার, আলো, এইসব। অনেক সময় বিদেশ থেকে নানা চলচ্চিত্রের বাছাই করা অপূর্ব পোস্টারের প্রদর্শনের আয়োজনও আমরা করেছি। এইসব কাজে আমি আমার চারু-বিদ্যালয়ের অনেক শিল্পীকে পেতাম। উৎসবশেষে যে ভূরিভোজ হত তাতে আমাদের ডাক পড়ত। তার সঙ্গে রত্নখচিত ব্যক্তিদের নিয়ে আড্ডা জমে যেত। ক্ষুধার্ত সময়ে মুখবদল মনের ও দেহের। এখনও এমন ঘটে, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবশেষে , তবে এখানে একটা ফুটনোট থাকে 'ধান্ধার' ও সংস্কৃতির খাতায় নাম রিনিউ করার।

নাটক-আড্ডার চরিত্র যেমন অন্যরকম ছিল তেমনই ছবি-আড্ডা। এখন বিক্রিবাটার রমরমা নেই। কেমন দুঃখী-দুঃখী ভাব। চা-কফি ভাগ করে খাওয়া, দুঃস্থ কবিদের মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পয়সা বাঁচানো। গণেশ পাইন সামনে ধুতি লুটিয়ে, ডাগর চোখে এমনই আড্ডা দিতেন। যোগেন চৌধুরীও অনর্গল পাঞ্জাবি বা শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কথা বলে যেতেন। সুনীল দাস বেশ রঙে থাকতেন। ভালো ঘোড়া আঁকেন। হাবভাবও চাবুক-চাবুক। একবার ওঁর এক সহপাঠী, তখন ওঁরা কলেজ থেকে বিদায় নিয়েছেন, সুনীলদার বিদেশ-ভ্রমণ হয়ে গেছে, প্রশ্ন করেন, "কি হে সুনীল খবর কী?" সুনীলদা গম্ভীর জবাব দিয়েছিলেন, "তুমি বোধহয় আজকাল খবরের কাগজ পড়ো না। তাই আমায় খবর শুধোচ্ছো।"

পার্বতী মুখুজ্জের আর্ট ফেয়ার, কর্পোরেশনের লনে এমনই সময়ে, তেমন জানাশোনা না থাকলেও গিয়েছি। কলেজের প্রায় পিছনে, মুক্তমেলা, বঙ্গসংস্কৃতিও ছিল শিল্পী-কবিদের জন্য। পার্কস্ট্রিটের আর্টস-এও প্রিস্টস গ্যালারি। আর্টিস্ট হাউস, আড্ডা-প্রদর্শনীর জায়গা। নিখিল বিশ্বাস গত হওয়ার আগে, ক্র্যাফট্ পেপারে আঁকা বিশাল বিশাল ছবির প্রদর্শনীতে সশরীরে থাকতেন একমুখ দাড়ি নিয়ে। এখানেই কবি ও শিল্পীদের হাতাহাতির উদ্যোগ হয়। আমরা শুনে কলেজ থেকে রে রে করে তেড়ে এসে দেখলাম ওঁরা লনে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন আর খালাসিটোলায় যাবেন বলে পয়সা তুলছেন।

কলেজ থেকে আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ যাওয়ার জন্য ময়দান ও তার নানা থামা, থামা ঠেক ছিল গাছের ছায়ায়। একটা চলমান আড্ডা। সঙ্গে বান্ধবী। প্রায় রঙিন আড্ডা। ছবি-সংস্কৃতির আগে, দুষ্টু-সংস্কৃতির মহড়া। আঙুল ছোঁওয়া, সন্ধে নামলেই চুমো খাওয়া, এই সব, সেই ষাটের দশকে দিনের আলোয় ঠিক চুমো খাওয়া যেত না। নন্দন-সংস্কৃতি আসতে তখনও চল্লিশ বছর বাকি। আমাদের কলেজগুলো তখনকার সময়ে মনস্তত্ত্বে একটা ঋতু ঋতু ভাব। উড়ু উড়ু। যৌনতা কারুকার্যখচিত খিলানে, কাঠের সিঁড়িতে, ফ্রেস্কোর আঁচড়ে, ক্লাসের তিসির তেলের গন্ধে মজে থাকত। বুক ভরে, চোখ ভরে, সেই সুবাস গায়ে মেখে নিতাম। কৈশোর পার হচ্ছি। কলেজ থেকে সিনে ক্লাবে যেতে কুড়ি মিনিট হাঁটাপথ। আকাদেমি তিরিশ মিনিট। তার পুকুরপাড়, সবুজ ঘাস, মেঠো-ময়দান পথ, ঘুরে ঘুরে আড্ডা ছবি। সময়টা যেন থেমে আছে। আজও। ওই পথে ট্রামলাইন ছিল, তবুও হাঁটতাম। কখনও কখনও বিদেশিদের দেখতাম ভালোবাসায় জড়িয়ে চুমো খেতে। পথচারী ফ্রিজ করে যায়। একবার সুন্দরী বিদেশিনির ক্যারাটের আঘাতে ছয়জন পথচারী ধরাশায়ী হয় মেট্রোর সামনে। কেউ একটু সাহসে কাছে যেতে চেয়েছিল হয়তো। তাকে এক বন্দুকের দোকানে ঢুকিয়ে জনরোষ থেকে বাঁচানো হয়। জনসংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম, একটা অবসর ও ব্যস্ততার এক্কা-দোক্কা চলছে। আমরা এই জনস্রোতকে অবজ্ঞা করে আড্ডা মেরে চলেছি। নিজেদের পরিধিতে। একটা সময় পার্বতী মুখুজ্জের কাঁকুলিয়া রোডের বাড়িতে বেশ আড্ডা বসত। ওখানে উনি একাই থাকতেন। আর একজন সৌম্য ভদ্রলোক একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের মতো কাটাতেন, আমরা রমেশদা বলে জানতাম, জাতিতে গুজরাতি, এই আড্ডার নেশায় পড়ে যান। পরে এ বাড়ি ছেড়ে দেশে ফিরে যান। এই আড্ডাটা অনেক রাত পর্যন্ত চলত। কোনও বাধানিষেধ ছিল না। কারও চোখরাঙানিও নয়। কথা

ফুরোতে চাইত না। বিষয়কে যে কত জটিল করে তোলা যায়, মানস রায়, ভুমেন গুহ, মিহির চক্রবর্তীর সঙ্গ না পেলে বোঝা যাবে না। কারও বাড়ি ফেরার তাগাদা নেই। এখান থেকেই উৎপলদা প্রস্তাব রাখেন, দিনরাতের কলোকিয়ামের।

কলকাতার বাইরে গিয়ে দীর্ঘ কথার স্রোত। আজ প্রায় চোদ্দো বছর হল এই যাত্রার। সেই ভ্রাম্যমাণ আড্ডা, ঘাটশিলা, মধুপুর, শান্তিনিকেতন, ব্যারাকপুর হয়ে শঙ্করপুরে চলে গেছে। এখন প্রায় থামার মুখে। এমনই এক সমান্তরাল আড্ডাস্থল ছিল ডাঃ ভূমেন গুহর চেম্বারের উপরে, দরগা রোডে। যেখানে মদ্যসহযোগে তাপ নেওয়া হত। সেই আসরটা বসত একটা কার্পেটের উপর সবুজ মতো বাচ্চাদের অয়েল ক্লথ পেতে। প্রায় গ্লাস উলটোত বলেই এমন ব্যবস্থা। ভূমেন গুহ ওখান থেকে উৎখাত হন, তেমন পার্বতীদাও। এখন ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের আড্ডা ছেঁড়া তোষকের মতো, তুলো ছড়ানো, বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ কখনও কখনও যায়। যখন আমরা কাঁকুলিয়ার দোতলায় যেতাম, সাক্ষাৎ পেতাম নিমাইয়ের। সে এক ধুরন্ধর বাংলাখোর ও দারোয়ান, হিসেব রাখত কে কে এল আসরে। নীচ থেকেই জানতে পারতাম সব খবর। হঠাৎ একদিন খবর এল নিমাই মারা গেছে। আরেকজন আড্ডাধারী একদিন বানিয়ে বলে ওকে গড়িয়াহাটের মোড়ে দেখেছে। পার্বতীদা সম্মতি জানান এ খবরে। বলে ওঠেন,"ও যা জিনিস, যা হারামি, বেঁচে থাকতেই পারে।" আমাদের আড্ডাগুলোর প্রধান গুণ, প্রচুর মিথ্যেকথা বলা যায়। যেমন বাপী ব্যানার্জি বানিয়ে বানিয়ে নানা বিষয়ে প্রচুর কথা শোনাত। মানে, আরে অমুককে চেনো না? সে তো ওর ছোট মাসির বড় ছেলের বউয়ের ভাগ্নে। কী করে এত আত্মীয়জ্ঞান, ভেবে আমরা অবাক হতাম। এমনই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে একটা ফেঁদেছে। এক প্রবীণ, বেশ পড়াশোনা করা, প্রতিবাদ করে উঠল। বাপী ঘাবড়ে গিয়ে বলে ওঠে, "আজকেরটা লাগল না।" সাধারণ আড্ডায় মিথ্যে কথাকে মিথ্যে বলে ধরতে নেই। তার সৌন্দর্য, সুবাসকে ঘ্রাণ ভরে নিতে হয়। তাই আমার বিশ্ব জুড়ে পঞ্চাশ রকম ঠেক। এ শহরেই তিরিশটা। বিদেশে কুড়ি। হয়তো দেখা যাবে গ্রামেগঞ্জে আরও কিছু ছড়িয়ে আছে। সুন্দরবনের পথে, জলপথেও আড্ডা-বিতর্ক ভাসমান থেকেছে। উড়োজাহাজ বা বেলুনে এখনও আড্ডা মারা হয়নি। অর্থাৎ আড্ডা এখনও মাধ্যাকর্ষণে আটকে আছে। আড্ডার একটা মৌতাত আছে। গন্ধ আর রং। অদ্ভুত, বহুবর্ণা। সবাই একটু রং ছোঁয়ায়। তখন বেশ সেজে ওঠে এই আড্ডা।



আড্ডার আশকথা-পাশকথা

মন্দার মুখোপাধ্যায়

অতুল্য ঘোষ। মানুষটি রাজনীতিক কিন্তু 'আড্ডায় সর্বভুক্ত। প্রমথনাথ বিশী, সুমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্রতে যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনই স্বচ্ছন্দ সুচিত্রা-কণিকা-হেমন্ত-চিন্ময়তেও। স্বচ্ছন্দ পি. কে-কুট্টি-সঞ্জীব রেড্ডি বা বিধান শিশু উদ্যানের খুদে সদস্যদের সঙ্গেও। হোক তা বিধান শিশু উদ্যান বা তাঁর বাঁকুড়ার বাড়ি বা মধুপুরের আস্তানা। কী আড্ডা, কী আড্ডা! চুরুট-সিগারের গন্ধ, লিকার চা আর তর্কাতর্কি। দ্য-গল, নেপোলিয়ান-লেনিন-গান্ধী থেকে গৌতম বুদ্ধ-রবীন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসু। জানালা দিয়ে বাতাসের মতো বয়ে এসে জুড়িয়ে দিত ঘরের শ্বাস। কত সাবলীলতায় মিশে যেত জ্ঞান এবং অ-জ্ঞান। কোনও পক্ষেই আক্রমণ নয়, নিছক আড্ডা। অথচ তুমুল সরগরম।

রাজনীতি ভাবতেই মনে এল রাজনীতি ঘেঁষা আর এক আড্ডাবাজের কথা। বর্ষীয়ান অধ্যাপক, তাত্ত্বিক এবং তার্কিক। আমি প্রয়াত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা বলছি। আলাপ হয়েছিল ডে-কার্ত-বিবেকানন্দ-বেন্থাম প্রসঙ্গে। ক্রমে তা হয়ে দাঁড়াল

প্রায় এক পারিবারিক সম্পর্ক। ফলে নিপুণ অভিনিবেশে দেখবার সুযোগ হল আড্ডার আর এক চালচিত্র।

তাঁর সকাল শুরু হত লেকের 'খাইখাই' ক্লাবের আড্ডা দিয়ে। সদস্যদের বয়স পঞ্চাশ হতেই হবে। বয়স অনুযায়ী তাঁদের পদবিন্যাস ছিল— জেনারেল ম্যানেজার, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি থেকে সাধারণ সদস্য। মাঝে মাঝে যোগ দিতে পারত আমন্ত্রিত সদস্যরাও। এই 'বাহাত্তুরে বুড়োদের' দল কোনওক্রমে লেকের একটা বেঞ্চিতে জমা হয়েই হইহই করতে করতে চলে আসতেন গোলপার্কের মৌচাকের সামনে। মুহূর্তে উড়ে যেত রাস্তায় ভাজা ঠোঙা ঠোঙা জিলিপি, কচুরি। সপ্তাহে দু'দিন তো বটেই, বাদবাকি দিন সকাল সাতটা থেকে আটটা দাশ কেবিনে, ডিম-টোস্ট-চা। এরই মধ্যে সুকান্ত-বুদ্ধ-মার্কস-মমতা-স্বপনকুমার। যে কোনও বিষয়েই তর্ক জমত। যেমন, নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিজেদের সম্ভাব্য প্রয়াণদিবস নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ মানুষের উপস্থিতিতে বিতর্ক মোড় নিত অন্য দিকে। যেমন, আমাকে দেখলেই হয় নারীবাদ বা আধুনিক কবিতা। এভাবেই কখনও পিকনিকে মাকড়দহ, কখনও উদিপিতে ইড্‌লি-দোসা-দইবড়া, বা বেদুইনে পাবদা-পারশে-চিংড়ি মাছ। প্রত্যেক সেশনের পর সতীনবাবুকে অনুরোধ করা হত আড্ডাটি সম্পর্কে কিছু সমাপ্তিসূচক বক্তব্য রাখতে। চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই তিনি লাঠিটি উঁচু করে দাঁড়াতেন। সহসভাপতি বলতেন, "স্তব্ধ হোন সকলে— সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ শুরু হতে চলেছে।" মুহূর্তে সকলে চুপ এবং স্থির। অসাধারণ বাগ্মী সতীনবাবু সেদিনকার সেশনের উৎকণ্ঠা-উৎকর্ষ-আক্ষেপ-সাফল্য-ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বলে খাইখাই ক্লাবের দীর্ঘায়ু কামনা করে আড্ডায় ইতি টানতেন।

এই সতীনবাবুরই আর একটি আড্ডা ছিল শান্তিনিকেতনের কালোর দোকানে। পূর্বপল্লীর জোড়াবাড়িতে তাঁর আস্তানা ছিল। সকাল ন'টা নাগাদ এসে বসতেন কালোর দোকানের বেঞ্চিতে। গুটি গুটি জমা হতেন আড্ডার সঙ্গীরাও। একজন আসতেন, ময়লা গায়ের রঙ, সাদা হাফ প্যান্ট, বুশ শার্ট পরে। চুল দাড়ি সাদা বলে তাঁকে সকলে বলতেন, নেগেটিভ দাদু। গুল মারায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হুসেনের সঙ্গে কালার ক্যানভাস কিনতে যাওয়া, রবিশঙ্করের সঙ্গে কবিরাজি কাটলেট খাওয়া, রথী ঠাকুরের সঙ্গে জাপান-জাভা, দিনু ঠাকুরের সঙ্গে বর্ষামঙ্গল— এই ছিল তাঁর মাপ। সতীনবাবুই নাকি তাঁকে এইরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে রাজি করিয়েছিলেন— আড্ডায় রং আনবার জন্য। দু'-পাঁচজন জড়ো হলেই সতীনবাবু

চোখ টিপতেন, আর তিনি গুল ছোটাতেন। গুল-জারির এই সাফল্যে সতীনবাবুর আত্মপ্রসাদ আর শ্রোতাদের ধৈর্যই ছিল এই আড্ডার মাধুর্য।

পোদ্দার কোর্টে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের একটি কুঠুরিতে 'অর্ন্তবৃত্ত'-র আড্ডা। মধ্যমণি মঞ্জুষদা। প্রয়াত মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। ছোট পত্রিকার কবি-লেখক-আবৃত্তিকারদের অবলীলায় জমায়েত এবং চেয়ারের পর চেয়ার জুটিয়ে কুড়ি-পঁচিশজনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা। আহা! সে ঘরের দেওয়ালে সাঁটানো যামিনী রায়ের প্রিন্ট, প্রিয় কবিতার ছাপা পাতা, নতুন কবিদের বইয়ের মলাট। মঞ্জুষদার অকালমৃত্যুতে শুধু যে আড্ডাটাই ভেঙে গেল তা-ই নয়, ওই ঘরটাও তড়িঘড়ি দরকার হল রাজ্য দফতরের। ফলে অর্ন্তবৃত্তের আড্ডা আজ শুধু আত্মজনের স্মৃতিতে। যা চায়ের কাপের ধোঁয়ার মতো উবে গিয়েও রেশ ও সুগন্ধ ছড়িয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গত আনাই যায় মিত্র ও ঘোষের দপ্তরে কলেজ স্ট্রিটে ভানুবাবুর ঘরে কথাসাহিত্যের আড্ডা, আনাই যায় রবিবারের সকালে শঙ্খ ঘোষ বা সুনীলদার বাড়ির সাহিত্যের আড্ডার কথা, কিন্তু এ সব একটু এড়িয়ে বরং বলি হালফিলে নবনীতাদিকে ঘিরে 'সই'-এর আড্ডার কথা। সে আড্ডা কখনও জমজমাট, ককনও ম্রিয়মাণ, কখনও ঘুসঘুসে, কখনও বজ্রনিনাদ। কিন্তু তা আড্ডা এবং আড্ডাই। অগ্রগণ্য থেকে আমাদের মতো নগণ্য এবং অগণ্য সব লেখিকা এর সদস্য। যে কোনও প্রস্তাবেই তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা-বাধা-চিৎকার—আর এরই মধ্যে সভাপতি নবনীতাদি গম্ভীর মুখে, "...ওয়ান মিনিট প্লিজ...আমার গলা খারাপ... আমাকে বলতে দেওয়া হোক... বিষয়টি খুব জরুরি...।"

হয়তো রণে ভঙ্গ দিয়ে "যাও খেলব না" বলে চলে যেতে চাইবেন তিনি। তখন তাঁকে, "এসো", "এসো চুপ করছি" বলে আদর করে বসানো হবে। এভাবেই সইমেলা, সইসংকলন, নতুন লেখা পড়া, মুড়ি তেলেভাজা, খুচরো গসিপ, নিরামিষ নিন্দে এবং পবিত্র দল পাকানো। সই-এর আড্ডা সত্যি সত্যি এ সময়ের মেয়েলি আড্ডা। শক্তিময়ীদের রোখা শেখা জমায়েত— মাসে দুটি বৃহস্পতিবার তো বটেই।

এই মেয়েলি আড্ডা প্রসঙ্গে মনে এল পাইকপাড়া এম. আই. জি. হাউসিং এস্টেটের মহিলা সমিতির কথা। মিসেস বোস, মিসেস দাশগুপ্ত, মিসেস রায়, মিসেস ঘোষদের লা জবাব জমায়েত। কর্তারা সরকারি পদস্থ আমলা আর অন্য দিকে একজন কলেজের অধ্যক্ষা বাদে বাকি সকলেই গর্বিত গিন্নি। যেদিন যাঁর বাড়িতে আড্ডা হত, তিনি সেদিন রান্নার বিশেষ পদ বানিয়ে ঘর গুছিয়ে নিজে

পরিপাটি সেজে এক গুচ্ছ ফুলের মতো হয়ে অপেক্ষা করতেন। সেখানে মার্কস, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আলোচনায় না এলেও, প্রসঙ্গত উঠত লোডশেডিং, ট্র্যাফিক জ্যাম, কর্তাদের কাজের চাপ, বদলি, ছেলেমেয়েদের শরীর-স্বাস্থ্য, পারিবারিক সমস্যা, রান্নার রেসিপি, উলের ডিজাইন আর বাপের বাড়ির গপ্পো। এই আড্ডার সঙ্গে যুক্ত ছিল নানা সুগন্ধির প্রলেপ, চুড়ির রিনরিন আর সংসারে তৃপ্তির এক চাপা জৌলুস।

তবে এই আড্ডারই অন্য পিঠ ফুটে উঠত আর এক মহিলা জমায়েতে। সকাল থেকে বেলা অবধি হাউসিং-এর বারোয়ারি কলপাড়ে। চরণমাসি, পারুল, সুনীতি, নমি কাপড় কাচতে কাচতে, বাসন মাজতে মাজতে কাঁইমাই করে অবতারণা করত বাবুদের বাড়ির গিন্নিদের কথা। কে মুখ করে, কে বাসি খাবার দেয়, কার হাত খোলা। গুড়াকু, নস্যি-তামাকের সঙ্গে গলে যেতেন মিসেস রায়, মিসেস দাশগুপ্তরা। একই ঢঙে তারা বলত তাদের স্বামী বা প্রেমিকের পালিয়ে যাওয়া, সতীনের সঙ্গে ঘর করা বা সমর্থ ছেলের খুনের দায়ে হাজতবাসের কথাও।

টিচার্সরুমের সেই 'বিকেলের আড্ডাটা আজ আর নেই'। সুগন্ধি লেবুফুলের মতোই তা যেন মিলিয়ে গেছে দূরের অরণ্যে কোথাও। দিগন্তেও আকাশ নেই যেন। শেষ বিকেলে মুড়ি আর কফি খেতে খেতে সেই সব অনবদ্য তর্ক— প্লেটোনিক লাভ না বায়োলজিক্যাল, রমা রঁলার রামকৃষ্ণ না কি সরাসরি কথামৃত, জ্যোতি বসু না বিধান রায়, ট্রটস্কি না লেনিন, পেরেস্ত্রৈকা নাকি পশ্চিমবঙ্গীয় মার্কসবাদ, ইন্দিরা গান্ধী না রামা রাও— এমারজেন্সি! 'সার্কল অব রিজন, কালার পার্পল, ডটার অব দি ইস্ট, দেখি নাই ফিরে পড়ে তুমুল উত্তেজনা, দল বেঁধে লেকস্‌পো— একস্‌পো, নান্দীকার নাট্যমেলা, বুক ফেয়ার। উমা সিদ্ধান্ত, গৌরী আইয়ুব, সত্যবতী যোশীদের সঙ্গে অনায়াসে ভারতীদি পূরবীদি মীরাদি। তসর-মটকা- পশমিনা-কাবাব-শ্রীখণ্ড।

তবে আড্ডা কালচারটি মিলিয়ে গেছে এমন ভাববার কারণ নেই। মেয়ের বন্ধুদের দল— আর তাদের আড্ডা— বলবার মতো লেখবার মতো বটে। এক ঝাঁক মাছের মতো ঘুরছে তারা। আর কলকল। রনোর ক্রিকেট, বিষ্ণুর ছাত্ররাজনীতি, দোলনের সোস্যাল সার্ভিস, তিস্তার নেট প্লেট, জয়া, রোহিণী সুমিতের সাংবাদিকতা— সব এসে এক হয়ে যায় যখন তারা আড্ডায় বসে। 'অর্থ' বা 'অর্থহীন' দুই মানের আড্ডাতেই তারা স্বচ্ছন্দ। এদের আড্ডায় মেয়ে-পুরুষের পৃথক ভাব নেই। সকলেই বন্ধু। আর অধিকাংশ পুরুষবন্ধুই নারীবাদী, মেয়েদের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ফলে মতের এবং ইগোর অমিল নেই। এই আড্ডার পরিবেশে অতি আধুনিকতা থাকলেও বন্ধুত্বের নিরিখে তা নিপাট দেশজ এবং মাটির মতোই প্রাচীন।

তবে পারিবারিক আড্ডা বলতে বিয়েতে জমায়েত। বিশেষত পাঁড় ঘটিবাড়িতে একটা বিয়ে লাগা মানেই যত 'আলুর ঝালুর' কথা, নয়তো 'তুই থুলি না মুই থুলি'। বিয়ের আগে থেকে আশীর্বাদ, আইবুড়োভাত, বরণডালা সাজানো, শ্রী গড়া, দধিমঙ্গল, জল সইতে যাওয়া, মোনামুনি ভাসানো, গায়ে হলুদ , কলাতলায় স্নান, পান সাজা, দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ— এ সবই একদমে হবে, কারণ এর পরতে পরতে জমে উঠবে আড্ডা, দলে দলে দফায় দফায়। সন্ধের সাজ, বিয়ের উৎসব , সে তো জনস্রোত। তাতে আড্ডা নেই। এই আড্ডা আবার ফিরে আসবে বিয়ে-থা হয়ে যাওয়ার পর সারারাত জাগা বাসরে। সে আমার বিয়েতেও যে ছবি, মেয়ের বিয়েতেও। ভোররাতে মশারিতে ঢুকেছিল ছ'জন, সকালে দেখা গেল মশারি চাপা পড়ে ঘুমিয়ে আছে বত্রিশজন। সেই শঙ্করমামার চোর ধরা, দুলুমামার জোক্‌স মেজোমাসির ক্যারিকেচার, সিদ্ধি খেয়ে নিজের বরকেই চিনতে না পারা,বাবার দেখানো তাসের ম্যাজিক, ফুটেমেসোর গুম মেরে থাকা, বাসর উপলক্ষে মায়ের ব্যবস্থায় বারবার রিহার্সাল— কতবার শোনা তবু সেই একভাবে হেসে গড়িয়ে লুটপাট করা সময়। ফিরে এসে রাত কাবার করে তত্ত্ব সাজানো— বউভাত সেরে যে যার মতো চোখে বাড়ি ফেরা। আড্ডা শেষ।

আসলে এই যে সব আড্ডা এর উৎসে ছিল যৌথতা। এই আড্ডার গড়নটা এসেছিল বড় পরিবারের মধ্য দিয়ে, এসেছিল পাড়া-ঘরের ভিতর দিয়ে। স্নানঘাটে, ঠাকুরদালানে, ছাদে 'বড়ির বিয়ে' উৎসবে দল বাঁধতেই হত। ফলে, পা ঘষতে ঘষতে, আনাজ কাটতে কাটতে, পান সাজতে সাজতে আড্ডা। আড্ডা সেলাই বোনা, আঁতুড় তোলা, তেল মালিশে। আমার চার ঠাকুমার তো সব কাজেই ছিল এই আড্ডার আয়োজন— পিসু হেমন্ত ইন্দে রাঙা, মানেই চার সাদা থান— কাজ সারছে আর চার চারুমুখী চার মুখে আড্ডা মারছেন।

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার স্ট্রিটে সোমনাথদা— সতীনাথদার বাবার আড্ডা। বিপত্নীক এই মানুষটি, প্রয়াত অজিতকুমার বোস আমার দেখা সেই শেষ অভিজাত। স্বল্পভাষী সুঠাম এক মানুষ। নিপুণ হাতে সংসার এবং ব্যবসা চালান। সপ্তাহে দু'-একদিন কাশীপুর ক্লাবে টেনিস খেলেন, একেবারে সাহেবি ঢঙে। আর বাদবাকি সন্ধেগুলো নিজের বাড়ির একতলায়, প্রায় ক্রিকেটমাঠের মতো বৈঠকখানা ঘরে

আড্ডা জমান দিশি কায়দায়। তাস খেলেন, বা মুড়ি খান, তাঁকে ঘিরেই ফিঙেবাবু, পটলাবাবু, মু-জেঠু, হারুখুড়োর দল। বেশির ভাগই ব্যাচেলর বা বিপত্নীক। কার্পেট বিছানো, ফ্রান্স থেকে আনা তাঁর বাবার আমলের এবনি আসবাবে সাজানো বিরাট হলঘর। দেওয়াল জোড়া আয়নায় ঐশ্বর্যের স্থায়ী ঠিকানা। তো এহেন আড্ডায় খয়েরি র‍্যাপার জড়ানো ধুতি পরা হিলহিলে চেহারার কিছু মানুষ আর গরম তেলেভাজা। কী করে যে মেলাতেন মেসোমশাই, তাঁর ওই সাহেবি কেতার টেনিস কোর্টের সঙ্গে এই শিকড় বিছানো পাড়ার আড্ডাকে! ষাট পাওয়ারের আলো আর এই টাইজোড়া মানুষগুলির সান্ধ্য উপস্থিতি খুবই জরুরি ছিল তাঁর বৈভবের ভুবনেও।

তবে সত্যি সত্যি 'ব্যাচেলারি' আড্ডা ছিল গণেশদার বসন্ত কেবিন। না বিবাহিত, না পঞ্চাশ গণেশ পাইন, তাঁর কবিরাজ রো-এর বাড়ি থেকে অলস চালে হেঁটে আসতেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ওপর মন্দার মল্লিকের স্টুডিওতে। অ্যানিমেশন সংক্রান্ত কাজে নাম ছিল তাঁর। পরে সে সব কাজ করা হয়ে গেলেও গণেশদা কিন্তু তাঁর দুটো-পাঁচটার চাকুরিটি বজায় রেখেছিলেন। অবশ্য তখনই তাঁর আঁকা একটি পেন্সিল স্কেচের দামে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের বিয়ে বেশ ভালোভাবে দিয়ে ফেলা যায়।

জানালার ধারে একটি ছোট্ট টেবিলে পাঁচটা অবধি মগ্ন থাকবার পর গণেশদা বেরিয়ে পড়তেন। প্রথম দিকে বসন্ত কেবিনটি ছিল মেডিকেল কলেজের উল্টো ফুটপাতে। সাকুল্যে ছ'জন বসা যেত। পরে এই আড্ডা চলে আসে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভেতর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত বসন্ত কেবিনেই। ডিম-টোস্ট এবং চা খেয়ে অপেক্ষা করতেন গণেশদা। গুটিগুটি জড়ো হতেন এই ঠেকে নানা ভাবের নানা মাপের আড্ডাধারীরা। কাকে না দেখেছি, সোমনাথ হোর থেকে তখন ফাইন্যাল ইয়ারে আর্ট কলেজের ছাত্র মানিকদাকে (অশোক ভৌমিক)।

আড্ডার প্রধান বিষয় ছিল সাম্প্রতিকতম নাটক, সিনেমা এবং সাহিত্য। আমি আর মানিকদা তো দায় নিয়ে ফেললাম, ভোর চারটে থেকে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সকলকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখানোর। এভাবেই দেখা এবং পড়া 'সিদ্ধার্থ'। অসংখ্যবার ফেলিনি বার্গম্যান ত্রুফো। এখানেই বারবার দেখি এক বিচিত্র শিল্পকর্মী অলকেন্দুশেখর পত্রীকেও। প্রায় দুটো থেকে আটটা— এই আড্ডার সব চায়ের দাম দিতেন গণেশদা। চুপচাপ হাসিহাসি মুখে শুনতেন সবার কথা। দু'-একটা মন্তব্য আর মাঝে মাঝে খোলামেলা হাসি। তাঁর ওই তৃপ্ত

পরিপাটি নিরহঙ্কার চেহারাটাই ছিল আড্ডার আকর্ষণ। সন্ধে হওয়া মানেই গণেশদা আছেন, আছেনই।

এই আড্ডা থেকে আমি মানিকদা, ধীমানদা (দাশগুপ্ত), রতন (বন্দ্যোপাধ্যায়) আবার মাঝে মাঝে এসে বসতাম দেশবন্ধু পার্কে। হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে যেতাম অতগুলো স্টপেজ। ধীমানদার উপস্থিতি মানেই, হেব্বার-হুসেন-বেন্দ্রে থেকে ক্রমে আমরা সরে আসব মল্লিকার্জুন-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বীতশোক এবং সত্যজিতে। রবিবারের দুপুরগুলো ঘুমের হাত থেকে বাঁচতে ধীমানদার কড়া শাসনে আমাদের আবশ্যিক গণিতের মতো চর্চা করতে হত রেনোয়া-গদার। আর সে কী তর্ক! কী মতামত জাহির! যেন আমরাই সেই অধিকারীর দল, শেষ কথাটা বলবার। কবিতা লেখা, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করা আর প্রতিদিন একবার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা-আড্ডা। রোজ নেট সার্ফ করার মতো আমাদের প্রত্যেকদিনের আড্ডাটা ছিল জরুরি। মাঝে মাঝে এসব ফেলে আমরা চলে আসতাম মানিকদার বরানগরের বাড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বনহুগলির একটা চায়ের দোকানে। সামনে পানাপুকুর, আর আমাদের চোখে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন। ক্রমাগত খুঁজে চলা সেই একটা শত্রুকে, যে আছে টের পাই কিন্তু ধরতে পারি না।

মানিকদার সঙ্গে আড্ডা মানেই ওঁর নিজস্ব ভোকাবুলারি— অর্থোডক্সকে অর্থোপেডিক, হচপচকে থপারিসম, মেকিকে বিটুথাঙ্কুম, অলকেন্দু পত্রীকে গামাবিট'— এইরকম অনর্গল বলে যাওয়া। এখনও দেখা হলে যে কথাই বলি, সব কথাই আসলে সেই আমাদের আঠারো থেকে পঁচিশ হয়ে থমকে যাওয়া আড্ডার রেশ। সেই ইচ্ছে করে গরিব হয়ে যাওয়া, এক বুক বন্ধুত্ব, শুধুই বন্ধুত্ব। শুধুই আড্ডা।

আড্ডা মানেই যেমন বন্ধুত্ব, তেমনই বন্ধুত্ব মানেই আড্ডা। না হলে ক্লাস সেভেন-এ ছেড়ে আসা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আজ মধ্যযামে কী করে আবার আড্ডা জমে? বিশেষত, সকলেই যখন চল্লিশ পার করা, ছেলে-মেয়ের মা এবং শাশুড়িও। এমনকী যোগাযোগ করা হল প্রব্রাজিকা বৈরাগ্যপ্রাণা মাতাজির সঙ্গে, তখন যে ছিল পদ্মিনী, আমাদের খেলার সঙ্গী। স্কুলের রি-ইউনিয়নের দিন দেখা হতেই সকলের সকলকে জড়িয়ে সে কী উচ্ছ্বাস! সন্ধের সময় মাঠে বসে আড্ডা। এগারো-বারো বছরের কিশোরী সময় যেন এখনও থমকে আছে এই মধ্যচল্লিশেও। সেই জয়া সেনগুপ্তের মৃত্যু, রানিদি-বুলুদি-জ্যোতিদি, স্কুলগেটে মোটা দারোয়ানজি, হস্টেলের ডর্মিটারি থেকে মনখারাপ করে চেয়ে

থাকা পাশের লেডিজ পার্কের দিকে, বাড়ি গেলে বন্ধুদের জন্য হু-হু আর হস্টেলে গেলে বাড়ির জন্য হু-হু। আজ এতকাল পরে অল্প বয়সের সেই একসঙ্গে কাটানোর জন্য হু-হু।

অ্যালবামে তিনটে ছবি দেখতাম। তিনজনেই এক মানুষ, আমার ঠাকুরদা, র'য়সাহেব প্রয়াত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। একটি ছবি পুলিশ অফিসারের উর্দিপরা, বুকে কোমরে কার্তুজের পাট্টা। অন্যটি ঠাকুমার পাশে বসা বাবা, পিসিদের কোলে নিয়ে ধুতি-কোট পরা বাড়ির কর্তা। আর একটিতে খালি গায়ে আড় হয়ে শুয়ে, পৈতে গায়ে। কোমরে গিঁট দিয়ে বাঁধা মাড়হীন মিলের ধুতি। সেই ছ'ফুট আড়াই ইঞ্চি দীর্ঘদেহের রেখা বরাবর পিছনে সার দিয়ে বসে আছেন বন্ধুরা। সামনে হারমোনিয়াম, গানের খাতা, গড়গড়া। এই ছবিটা আমাকে খুব টানত। ক্যামেরার সামনেও সেই একই ভঙ্গি— কেতাহীন অলস আড্ডা। সেকালের আড্ডার এই অ-পোশাকি গড়ন এবং অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে হারমোনিয়াম এবং গড়গড়া আমাকে বেশ নাড়াচাড়া দিয়ে মনে করাচ্ছে, এই ছিল বাঙালি বাড়ির প্রায় প্রতি সন্ধ্যার আধুনিক আড্ডা। সময় অকুলান ছিল না যে।

তবে দাদামশাই ঁউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। অল্প বয়সের কথা জানি না, বড় হয়ে দেখেছি, তাঁর আড্ডা মানে খবরাখবর। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী অর্থবান কিন্তু সঙ্গীত, ফুলবাগান, আরামকেদারা, গড়গড়া— এ সবের ধারেকাছেও ঘেঁষতেন না। মি. বান্যার্জি, মি. দেওয়ানরা তাঁর বৈঠকখানা কাম বেডরুমে আসতেন। কাঠের চেয়ারে বসতেন এবং শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, চা-বাগানের ম্যানেজারি, কোম্পানির মালিকানা বদল, পরিবারের অসুখবিসুখ— এসব নিয়ে ঘড়ি ধরে আলোচনা করতেন, তারপর যে যার মতো বাড়ি চলে যেতেন। মাঝে মাঝে দাদামশায়ের তীক্ষ্ণ গলায় লেকচার শুনতেন, তাঁদের গলার আওয়াজ মানে 'তাই তো', ইয়েস', 'নট অ্যাটঅল' ইত্যাদি।

বাড়ির কথা যখন উঠলই তখন একটু আমাদের বাবার আড্ডার কথাই বলি। ঠাকুর্দা এবং দাদামশায় দুজনেই কর্মসূত্রে প্রবাসী, ফলে বাবার বেশির ভাগ বন্ধুই রাঁচি-পাটনা বা পুরী-কটক-ঢেঙ্কানল আর মায়ের বন্ধুরা সিমলা-দিল্লি। তাই বাঙালিয়ানার এক অন্য চেহারা ফুটে উঠত তাঁদের বন্ধুদের আড্ডায়। বাবার সঙ্গে থেকে থেকে মা-ও খুব সুন্দর ওড়িয়া বলতেন।

বালেশ্বরের রবিজেঠুর সঙ্গে রাঁচির প্রীতি জেঠুর আড্ডা জমত কি না জানি না, বাবার বন্ধু মৈত্রী (শুক্ল) পিসি অনেক ভাষা জানতেন, এমনকী গুজরাটিও।

ফলে তাঁর সঙ্গে সকলেরই আড্ডা জমে যেত। আড্ডায় অনুপস্থিত হলেও আমরা খুব চিনতাম কটকের ভাগ্নে সাধনকে, টুনাকাকার বউ আশ্চর্য কা কেমাকে। রাঁচির গণেশ সত্য, হরি সত্য, কালো লক্ষ্মী বা পবিত্র ডাক্তারকে। প্রবাসী বন্ধুদের সঙ্গে এই সব আড্ডায় সুধাংশুজেঠু, দাশুকাকারা খুব ভালো ইংরেজি জানলেও একটু যেন ম্লান হয়ে যেতেন। এ আড্ডায় ভাষার আদানপ্রদান ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তবে সিপটি বাঙালি হস্টেলে করোয়াল আড্ডা হত হাজরার বিনয় দত্ত মহাশয়ের (কল্যাণী দত্তের দাদা) বাড়িতে। আড্ডা হত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের (পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়) বাড়িতে। খুবই বালিকা বয়সে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেছি বাবাকে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতে। কত কথা বলতে, কত কথা শুনতে। এই সময়ের যোগাযোগেই বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটে গ্রন্থজগতের দেবকুমার বসু ও অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয়দের। তারই ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় সচিত্র 'ফটকে', বাংলায় প্রথম অফসেটে ছাপা ছোটদের বই। এই ধরনের বন্ধুত্ব বা অমলিন আড্ডা ক্রমেই মিলিয়ে গেছে এক পরম আশ্বাসের মতো।

বড় পিসিমা রমাদেবী বাল্যবিধবা এবং বিদূষী ছিলেন। কর্মসূত্রে তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। ছুটিছাটায় বাড়ি এলেই ডেকে পাঠাতেন আড্ডার সঙ্গী খুড়িমা, জেঠিমা, বৌদি, পাড়াপড়শি, মেয়ে-বউদের। চাকরিজীবনের গল্প, প্রবাসের একলা সংসার, এখানকার খবরাখবর আর দল জুটিয়ে টোয়েন্টিনাইন না হয়তো রঙ মিলিয়ে বিন্তি খেলা— এভাবেই কেটে যেত সময়। সংসারবঞ্চিত মানুষটির জীবন সম্পর্কে যত খোঁজ, তা মিটত এই আড্ডার মধ্য দিয়েই।

আর অন্যদিকে বাবা, ছোটপিসি আর মায়ের আড্ডা মানেই হয় ইনস্ট্যান্ট নাটক না হয়তো অনেক লোক জুটিয়ে কিছু একটা ফেঁদে বসা। ছোটপিসি তো তাঁর এই আড্ডার আর্টকে বেশ একটা সাংগঠনিক রূপ দিতে পেরেছিলেন। সাহিত্য পত্রিকা 'খেয়ালী' বার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বড় বনেদি ঘরের শিক্ষিত মেয়ে-বউদের নিষ্কর্মা-অলস জীবন থেকে টেনে বের করতে বানিয়ে ছিলেন 'ঘরোয়া বৈঠক'। শাড়ি-গয়না-পান-তাসের চেনা পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা দল বেঁধে আড্ডা জমাতেন, সপ্তাহে একদিন কোনও একটা বাড়িতে। সন্দীপ রায়ের দিদিশাশুড়ি প্রয়াত শিবানী ঘোষালের অপর্ব হল নয় তো আমার পিসিমা মীরাদেবীর বাইরের ঘরে বসত ঘরোয়া বৈঠকের আড্ডা। নাটক-সাহিত্যসভা- চিঠি লেখা —

কী না করতেন তাঁরা। তাঁদের সব ডাকসাইটে প্রতিষ্ঠিত কর্তারা ছেলে মেয়ে ভৃত্য পরিচারিকা-সহ দেখতেন ইন্টেলেকচুয়াল হাবভাব এবং নানা সেবামূলক কাজ।

আমরা একালের মহিলা ইন্টেলেকচুয়ালরা মাঝে মাঝে আড্ডায় বসি, কোনও নামী টি-শপ-এ বা ম্যাক্সমুলার ভবনের ছাতার নীচে। ফলের রস, চায়ের লিকার, স্যান্ডউইচ, সিগারেট, জিন্‌স-এ যথেষ্ট মেয়েলিত্ব বজায় রেখে আড্ডায় আনি সংঘর্ষ, প্রতিবাদ, প্রেম— বেশ গতানুগতিকভাবে এবং নিয়ম মেনেই। সমকামিতা, উভকামিতা, এথনোসিটি, এসথেটিকস— এ সবই আমাদের নতুন করে ভাবাচ্ছে। ভাবাচ্ছে অ্যানোমিআইসোলেশন, সুইসাইড। ভাবাচ্ছে বিশ্বায়নের সংকট।

একটা ফুরিয়ে যাওয়া আড্ডার কথা বলি। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন আশ্রমিক মিষ্টুনিদির সঙ্গে। কতবার কাশফুল দেখতে যাওয়া, হেতমপুরে মদিনাবিবির কবর, রাজবাড়ি— সুমিদির বানানো কেক কফি নিয়ে বিক্রমের নেতৃত্বে অনন্তের পথে যাত্রা। বনলক্ষ্মীতে খেতে বসবার আগে আমবাগানের জোনাকি, বালিগড়ার মাদল আর আমাদের ডুবে ডুবে আড্ডা আর আড্ডা।

তবে মিষ্টুনিদির আড্ডা ছিল খুব অভিনব। সে, একা একা কথা বলত তার কিশোরীবেলার সঙ্গে, কথা বলত শালগাছের ঝুঁকে পড়া মঞ্জরীর সঙ্গে, বসন্তোৎসবের আগের রাতে গৌড়প্রাঙ্গণের চাঁদের আলোর সঙ্গে, এইরকম একা-একা-আড্ডা নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে, এ আমি আর দেখিনি। তার এই আড্ডা দেওয়া যেন না-লেখা এক দীর্ঘ কবিতা, যা আর কেউ জানবে না।

আড্ডা যেমন শেষ হতে চায় না, তেমনই শেষ হতে চায় না আড্ডার এই আশকথা-পাশকথা, তবু শেষ করতেই হয়। শেষ করি হালআমলের অন্যরকম এক আড্ডার কথা বলে। নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের একটি অরাজনৈতিক মিছিল হয়। সেই মিছিলের পর রাস্তায় বসে পড়ে সকলে। সারাদিনের বিষণ্ণতা কেটে যেতে থাকে ক্রমে। ছোট-বড় দলে ভাগ হয়ে কত মানুষ, কত বন্ধু, কত আত্মজন; বিস্ময়ে বিষণ্ণতায় দেখা হল কতকাল পরে। জীবনের শুরুতে যাঁদের সঙ্গে হেঁটেছিলাম, মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আজ এত বছর পরে আবারও এক সঙ্গে পা মেলালাম! আশ্চর্য! আর এই আড্ডায় শামিল হল অনায়াসে একালের কুচো প্রতিবাদীরাও— ব্র্যান্ডেড ব্যবহারিকতা সত্ত্বেও। কোথায় জেনারেশন গ্যাপ! কোথায় মূল্যবোধের অভাব। কোথায় এ যুগে আর কিসসু হবে না বলে গেল গেল রব।

তাহা জানি না— কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না।
(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একা! কমলাকান্তের দপ্তর, প্রথম সংখ্যা।)

নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, বিষণ্ণতার কারণে নারী মারা গেল। যদি সে আনন্দময়ী হত। অবসাদগ্রস্ত না হত, সে এভাবে প্রাণময়তা হারিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হত না। খোলা মনের মানুষ, মানুষের সাহচর্যে-থাকা মানুষ বেশিদিন বাঁচে। আনন্দ করো, মানসিকভাবে উচ্ছল থাকো, অনেক প্রতিকূলতা দূরে সরে যাবে, জীবন ব্যাপ্ত হবে। আমি একা, কেহ একা থাকিও না।

এই দুই মহান কবি-নাট্যকার এবং প্রাবন্ধিক-কথাসাহিত্যিকের উক্তির মধ্যেই আড্ডার সমাজ-দর্শন বিধৃত রয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আড্ডাকে লঘু অর্থে অনুভব করলে সত্যিকার আড্ডার তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর শেষ চলচ্চিত্র 'আগন্তুক'-এর মধ্যে আড্ডা বিষয়ে অনন্য উক্তি করেছেন। আগন্তুক মামা বলছেন, গ্রিসের জিমনাসিয়ামে আড্ডা হত, সেখানে ধর্ম দর্শন রাষ্ট্রনীতি শিল্প সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হত। মাইন্ড অ্যান্ড মাইন্ড-হেল্‌থই ছিল তাঁদের দর্শন। পরনিন্দা নয়, পরচর্চা নয়। উন্নত মানসিক চর্চা।

হুবহু সংলাপ ভুলে গিয়েছি, কিন্তু মর্মকথা এটাই। এটাই আড্ডার ক্ল্যাসিক্যাল রূপ। জ্ঞানচর্চা— পরনিন্দা, পরচর্চা নয়।

আড্ডা একদিকে যেমন জ্ঞান ও ভাবের আদানপ্রদান, তেমনই অন্য দিকে একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা থেকে বাঁচবার পথ,— আনন্দময় জীবন-যাপনের পাথেয়, ব্যষ্টিমানুষ সমষ্টিমানুষের মধ্যে লীন হয়ে মানবজীবনের নতুন তাৎপর্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। একা থাকার মধ্যে যেমন মঙ্গল নেই, আছে অবসাদ,— অন্যদের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে মিলিয়ে দিলে জীবনে অন্য মাত্রা যুক্ত হয়। তাই সমাজতত্ত্বে আড্ডার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়,— আড্ডার সমাজ-দর্শন তাই মানবিক-অনুভূতিতে ভাস্বর।

আড্ডার সমাজ-দর্শন একরৈখিক নয়, সাদামাঠা বিশ্লেষণে তার হদিশ পাওয়া যাবে না। আড্ডার বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি রয়েছে। সামাজিক গোষ্ঠীর মানসিক-অর্থনৈতিক-পেশাগত-শিক্ষাগত শ্রেণির অবস্থানগত অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন,— আড্ডার সমাজ-দর্শনও তাই বিভিন্ন হতে বাধ্য। আর এইসব দর্শন শুধুমাত্র বুদ্ধি-মনন-চেতনা দিয়ে জানা যাবে না, চাই অভিজ্ঞতা, বিপুল অভিজ্ঞতা। কফি হাউসে ছোট পত্রিকার সম্পাদক-লেখকের আড্ডায় যে সমাজ-দর্শন প্রকাশ পায়, মেদিনীপুর

জেলার শঙ্করপুরের সাগরতীরে মৎস্যজীবী, যাঁরা ট্রলার নিয়ে দশ-পনেরো দিন মাঝ-সমুদ্রে থাকেন কিংবা পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট কুঠার নিয়ে অসংখ্য নারী কাঠ কাটতে যান— এদের জীবনেও আড্ডা আছে, আড্ডার বিষয় আছে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের সমাজ-দর্শনের বিস্তর ফারাক রয়েছে।

আড্ডা হল পৃথিবীর সভ্যতার আদিমতম মিলনকেন্দ্র। আর সেই ভুলে-যাওয়া কাল থেকেই প্রতি আড্ডায় রয়েছে নিজের নিজের গোষ্ঠীসমাজ লোকসমাজের সমাজ-দর্শন। আজকে আড্ডাকে যেমন আমরা লঘুভাবে ব্যবহার করি, আড্ডা কিন্তু সেই লঘু মানসিকতা বহন করে না। আড্ডাই মানুষকে সহিষ্ণু করেছে, যুক্তিবাদী করেছে, অন্যের বক্তব্য মন দিয়ে শুনতে শিখিয়েছে, গরিষ্ঠের মতকে মান্য করতে শিখিয়েছে,— সবচেয়ে বড় কথা সমাজ সম্পর্কে উদ্দীপিত করেছে, আর তারই ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমানুষ চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে, দর্শন-ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের জিমনাসিয়াম কিংবা প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিদের 'তর্কযুদ্ধ' শুধু নয়, পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠী সেই আদিমকাল থেকেই আড্ডার মধ্যে সেই উন্নততর চিন্তায় বিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষের গাঁয়ে গাঁয়ে যেসব লৌকিক দেবদেবীর পুজোয় মানুষ সমবেত হত, বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ, আদিবাসীদের পঞ্চায়েত,---সর্বত্রই আড্ডার আবহাওয়ায় মানুষ সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু সমৃদ্ধ হওয়াই নয়, মন ভালো হয়ে যায় আড্ডায়, বাড়ি ফিরে পরম শান্তি। এটাই সমাজ-দর্শন।

আড্ডার সমাজ-ভাবনা পৃথিবীর মানবসমাজের বিবর্তনে বিপ্লব এনেছে।

সেই কাল শিকারজীবীর সমাজ। সেই সমাজে সব পুরুষই পিতা, সব নারীই স্ত্রী। যে নারীর সন্তান হল, জানা গেল মা কে। তখন পরিবার গড়ে ওঠেনি। সব নারী সব পুরুষের বউ। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, সংহত সমাজ। সকলের মত নিয়েই কাজ হয়, একক কোনও চিন্তার স্থান নেই। আলোচনা হবে, সকলে মত দিলে সেইমতো কাজ হবে। আড্ডায় বসেই এসব সিদ্ধান্ত হয়। আজ কোন দিকে শিকারে গেলে ভালো হয়,— সবাই মত দেয় একসঙ্গে বসে।

পুরুষেরা গাছের ডালের বর্শা, ছুঁচলো পাথরের অস্ত্র, মুঠিতে ধরা যায় এমন নুড়ি পাথর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের ফিরতে দু-তিন দিন লাগবে। গাঁয়ে শুধুই নারী ও শিশুরা।

শিশুরা খিদের জ্বালায় কাঁদে। মায়েরা ঝোপ জঙ্গল থেকে ফল-মূল-কন্দ নিয়ে আসে। বড় কষ্ট। শিশুরা বুকের দুধ ও এসব ফল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মায়েরা জটলা করে আড্ডা দেয়। কত কথা, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা, খিদের কষ্টের কথা, কবে পুরুষরা ফিরবে, কী জন্তু নিয়ে আসবে— এসব কত কথা।

গাঁয়ের মধ্যে বর্ষার পরে নতুন নতুন চারা বেরিয়েছে। দু-একজনের নজরে পড়ল। অন্যদের ডেকে আনল। আশ্চর্য, যে ফলের গাছ থেকে ফল এনেছিল, এ গাছ ঠিক তার মতো। এখানে তো এই গাছ ছিল না? তবে?

দিনের পর দিন আড্ডায় আলোচনা হয়।এই মাটির এখানে কিছুই ছিল না। এখন গাছ হল। একদিন গোষ্ঠীর কোনও নারীর মনে হল, ফলের মধ্যে যে বীজ ছিল, তা তো ওখানেই পড়ে ছিল। সবার বুদ্ধি খুলে গেল। হ্যাঁ, ওখানে তো আমিই বীজ গুলো ফেলেছিলাম আর একটু দূরে। যে ফলের বীজ যেখানে ফেলেছে সেখানে সেই ফলের গাছ হয়েছে।

পুরুষদের বলল। পুরুষরা কিছুই বুঝতে পারল না। বারবার বলাতে তারা বিরক্ত হল। শিকার করা যে কত ধকলের তা ওরা বুঝবে কী করে? ওসব কথা ভালো লাগে না। বড় ক্লান্ত, আবার মাংস ফুরিয়ে গেলে দু'দিন পরে পাহাড়ি বনে যেতে হবে।

শিশুদের সামলাতে হয় মায়েদের। তাদের ধৈর্য বেশি। বুদ্ধিও বেশি। নিজেদের মধ্যে বারবার আলোচনা হয়, এবার সচেতনভাবে বীজগুলোকে ছড়িয়ে রাখল আগে থেকে ঠিক করা মাটিতে। পরের বর্ষায় তাদের আন্দাজের ভাবনা মিলে গেল। নারীজাতি কৃষির স্রষ্টা হল। এখানে পুরুষের কোনও ভূমিকা নেই।

খাদ্য সংগ্রাহক, শিকারজীবী, পশুপালক সমাজ থেকে বৈপ্লবিক কৃষিসমাজে উত্তরণ ঘটেছিল নারীদের সমবেত ভাবনার সংহত সমাজের আড্ডা থেকে। আর, এই প্রথম উন্নত মানের সমাজ-দর্শন গড়ে উঠল। কেননা, স্থিতি না এলে উন্নত দর্শনের জন্ম হতে পারে না। আগের তিন স্তরের মানবসমাজ স্বাভাবিক কারণেই ছিল যাযাবর, স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হত। কৃষিজীবী সমাজ যুগ যুগ ধরে একই জায়গায় থাকে। নারী যেমন বারবার গর্ভবতী হয়, জমিও নারীর মতোই একইভাবে প্রতি বছর ফসল ফলায়। নারী ও ফসলের জমি তাদের চিন্তায় একাকার হয়ে গেল। মানবসমাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর এই উত্তরণ, কৃষিতে উত্তরণ ঘটেছে নারীদের আড্ডা, আড্ডায় সিদ্ধান্ত এবং সমবেত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এখনও

পৃথিবীর ষাট শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী মানুষের সভ্যতাকে বহন করে চলেছে। মূল উৎস আড্ডা। বড় বিস্ময় জাগে।

দেশের নাম ফিনল্যান্ড। দুজন চিকিৎসক ছিলেন। একজন জাকারিয়াস টোপোলিয়াস ও অন্যজন ইলিয়াস লোনরোট। তাঁরা দু'জনেই স্বদেশভূমিকে খুব ভালোবাসতেন। যাঁরা স্বদেশকে ভালোবাসতে জানেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে জানেন। আবার, এই দুজনেই ছিলেন খুব মিশুকে ও আড্ডা-ভক্ত। সেই আড্ডায় আলোচনা হত সমাজের কথা, চিকিৎসার কথা, ডাক্তার হিসেবে তাঁরা যেসব গাঁয়ে যেতেন সেখানকার মানুষের সংস্কৃতির কথা,— তাঁদের আড্ডার সমাজ-দর্শন ছিল উন্নত মানের। রোগী দেখা শেষ হলে ডিস্‌পেন্‌সারিতে আড্ডা বসত। আসতেন চিকিৎসক, শিক্ষক, গায়ক, শিল্পী।

জাকারিয়াস গাঁয়ে গাঁয়ে কৃষক ও পশুপালকদের চিকিৎসা করতে যেতেন। সেখানে কৃষকদের কাছে একটি বীরগাথা শুনতেন। বিস্মিত হতেন তার কাব্যমাধুর্যে। শেষকালে তার কিছুটা লিখে আড্ডার বন্ধুদের শোনালেন। তাঁরা সকলেই প্রাজ্ঞ মানুষ, তাঁরা জাকারিয়াসকে সেগুলো সংগ্রহ করতে বললেন। এ বিষয়ে আড্ডায় অনেক আলোচনা হল। তিনি সংগ্রহ করে আনেন, আড্ডায় আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এই আড্ডার সমর্থনে সংগৃহীত হল ফিনল্যান্ডের জাতীয় মহাকাব্য।

মহাকাব্যটির নাম 'কালেভালা'। অর্থ বীরভূমি। ইউরোপের লৌকিক মহাকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এই 'কালেভালা'। যুগ যুগ ধরে ফিনল্যান্ডের চারণকবি ও কৃষকেরা এই বীরগাথা গেয়ে আসছেন।

জাকারিয়াস সংগ্রহ করছেন। জীবনের শেষ দশ বছর প্রতিবন্ধী হয়ে শয্যাগত ছিলেন। এখন চারণকবিদের নিজের শয্যার পাশে ডেকে ডেকে গান শুনে সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রাখেন। লৌকিক মহাকাব্যের আশিটি অংশ সম্পূর্ণ করে ১৮২২ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তা প্রকাশ করলেন। প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর আড্ডার বন্ধুরা।

তাঁর মৃত্যুর পরে ইলিয়াস ১৮৩৫-৩৬ সালে কালেভালার ১২,০৭৮ লাইনের ৩২টি সর্গ প্রকাশ করলেন। বিশাল কালেভালায় রয়েছে ৫০ সর্গ, ২২, ৭৯৫ লাইন। কালেভালা হল, Old Finnish ballads, lyrical songs and incantations memorized and handed down by word of mouth by the bards and ordinary people for generations.

জাকারিয়াসের চেম্বারে প্রাজ্ঞ সমাজ-সচেতন দেশপ্রেমী ওইসব মানুষ যদি উৎসাহ না দিতেন তাহলে এমন সম্পদের কথা আমরা কেউ জানতে পারতাম না। আড্ডায় সমাজ-দর্শন ছিল বলেই এই ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সন্ধান আমরা পেলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সহজ-সরল জীবনাচরণ, বাইবেলের প্যারাব্‌ল্-এর মতো অনন্য উপদেশ এবং সৌজন্যে সেকালের বাংলার সব মনীষীরই তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর ছিল কতিপয় ঘনিষ্ঠ শিষ্য। তাঁরা সুশিক্ষিত, পরিশীলিত, ধর্মানুরাগী, মানবদরদি এবং পরাধীন ভারতের সুস্থ জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ। একসঙ্গে থাকেন। দারিদ্র আছে কিন্তু মনে দীনতা-সংকীর্ণতা নেই। গুরুকে নিয়ে আড্ডা হয়, নানা পরিকল্পনা হয়। এই কতিপয় সন্ন্যাসীর প্রাণময় আড্ডা থেকেই সমাজ-দর্শন উৎসারিত হল। একই সঙ্গে ধর্মসাধনা ও মানবকল্যাণ। মানুষের হিতার্থ-ভাবনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের ভজনা। আড্ডা থেকে জন্ম নিল রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা। বেলুড় থেকে শুরু। শতবর্ষ পরে সেই আড্ডা-ভাবনার বিস্তৃতি আজ কোথায় পৌঁছেছে তা তো সকলেই জানেন। এই সন্ন্যাসীদের আড্ডার সমাজ-দর্শন ছিল খুবই উন্নত মানের।

আড্ডা যদি সুস্থ চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে ধ্বংসকারী সমাজ-দর্শনও জন্ম নেয়। সেও দর্শন, তবে বিকৃত দর্শন। এমনই এক বিকৃত সমাজ-দর্শন উৎসারিত হয়েছিল উনিশ শতকের জার্মানিতে।

এই আড্ডার পান্ডার জন্ম ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর অস্ট্রিয়ায়। স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে শিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেন। শিল্পীর কোনও প্রতিভা না থাকায় চরমভাবে ব্যর্থ হন। ব্যাভেরিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, পদোন্নতি হয়ে করপোরাল হন। চাকরি ছেড়ে দেন। অস্থিরচিত্ততা ছিল ছোটবেলা থেকে।

কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল জার্মানিতে। সকলেই স্বভাবে নিষ্ঠুর ও অপ্রকৃতিস্থ। সবার হাতেই কিছু অর্থ আছে। চুটিয়ে আড্ডা চলে, নানা পরিকল্পনা হয়। ঠিক হয় একটা রাজনৈতিক পার্টি তৈরি করতে হবে। দুষ্কৃতীদের শেষ আশ্রয় রাজনীতি। রাজনৈতিক বোধবুদ্ধি নেই, পড়াশোনা নেই, কিন্তু ক্ষমতা আয়ত্ত করার উদগ্র নেশায় তারা 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' গড়ে তোলেন। তখনকার শিক্ষিত রাজনীতিবিদরা উপহাস করে বলত'নাজি'। মেঠো উত্তেজনাপূর্ণ ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা করে বেড়াত এরা। মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গত

বিভেদ, অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, আর্যজাতির গরিমা, জার্মান জাতিই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর জার্মান জাতিকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে পরাধীন করে শাসন করতে— এইসব অনৈতিহাসিক কুরুচিপূর্ণ অনৈতিক বিবেকহীন ভাষণ বেশ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য তার কারণও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিকে যে গ্লানি সহ্য কবতে হচ্ছিল, তাতে জার্মান অহংবোধে আঘাত লেগেছিল।

তারপর? ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালের ৯ মে পর্যন্ত ইহুদিদের জীবনে ও গোটা পৃথিবীতে সেই কয়জন যুবার আড্ডার পরিকল্পনা কী বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, সে ইতিহাস সকলের জানা। আড্ডার সমাজ-দর্শনও কিন্তু এমন বীভৎস স্তরে নেমে আসতে পারে। তবে আনন্দের কথা, এমন আড্ডার পরিচয় পৃথিবীতে বেশি নেই, তাহলে পৃথিবী আজ আর বাসযোগ্য থাকত না।

উনিশ শতকের চারের দশকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম। জন্মেছিলেন বৈভবের মধ্যে, জমিদার বংশের সন্তান। কিন্তু স্বভাবে সামন্ত পুরুষের মতো বিলাসে ভাসেননি। মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটির বিশাল বাড়িতে গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজসচেতন আড্ডার আসর। নব নব পরিকল্পনা, সবই সমাজ-ভাবনার ও দর্শনের ইতিবাচক দিক। আড্ডায় স্থির হয়, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে অভিনয় করতে হবে। অভিনীত হল 'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্বশী'। যাঁরা তাঁর ছদ্মনামে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' পড়েছেন তাঁরা অনুভব করতে পারবেন কীভাবে আড্ডার মেজাজে এই নকশা লেখা যায়। যিনি আড্ডা দেননি তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়। এরকম আড্ডা থেকেই মহৎ সৃষ্টির পরিচয় আমরা পেয়েছি।

এই আড্ডার আলোচনাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। সেকালের নামী পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত বাংলায় অনূদিত হল। মাত্র ছ' বছরের মধ্যে কাজ শেষ হয়। কালীপ্রসন্নের বাড়ির সেই আড্ডার সমাজ-দর্শন সুস্থ ছিল বলেই এমন সব অনন্য কাজ সমাধা হল।

অল্পসংখ্যক কিছু মানুষের মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে, তাদের চিন্তার ধারাবাহিকতা নেই। তাছাড়া মানুষমাত্রেই শিক্ষিত। আমাদের দেশের লক্ষ-কোটি কৃষক-কারিগর-মজদুর-লোকশিল্পী নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু অশিক্ষিত নন। নিজের নিজের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা পরম সৃষ্টিশীল।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকের ধারণা রয়েছে,— লোকসংস্কৃতি সাধারণ নিরক্ষর মানুষের প্রাচীন সৃষ্টি, সেই মানুষ বর্বর, অসভ্য, বুদ্ধিহীন এবং অশিক্ষিত, তাদের মনন নেই বা অত্যন্ত নিম্নমানের। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্যতম ব্যাখ্যাকার নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রস বললেন, যেসব মানুষ এমন অপরূপ লোককথা সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা কোনওভাবেই নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন ছিলেন না। এসব শিক্ষিত মানুষের সচেতন সৃষ্টি।

কৃষকদের আড্ডার অভিজ্ঞতা আছে। সূর্য ডুবে গেলে তাঁদের আর মাঠের কাজ থাকে না। তখন একজনের দাওয়ায় আড্ডা বসে। আড্ডার বিষয় জীবিকা। ফসলের জমি। সেচের সুবিধা। কম বৃষ্টি। খরা। কোন জমিতে কি ধরনের সার দিলে ফসল ভালো হবে। সবাই পরামর্শ করেন। যে কৃষক অভিজ্ঞ, চাষি তাঁর মতামত শোনেন। ঝগড়া নয়, বিবাদ নয়, মন-কষাকষি নয়, পরনিন্দা নয়, পরচর্চা নয়। [illegible] হয়ে শুনতে হয়। প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির জন্য সমবেত চিন্তা। লড়াই করেই কৃষককে পরিবারের অন্ন জোগাতে হয়, তাই সেই লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য ভাবের আদানপ্রদান। সে যে কী অসাধারণ সমাজ-দর্শনের পরিচয় পেয়েছি তাতে বিস্মিত হতে হয়।

অন্য একটি কৃষি-আড্ডায় এই একই অভিজ্ঞতার পাশাপাশি একটি উক্তির কথা মনে পড়ছে। এক কৃষকের বউয়ের সঙ্গে অন্য কৃষকের বউয়ের ঝগড়া হয়েছিল। হতেই পারে। আলগা কথাবার্তায় তাই বুঝতে পারলাম। সেবার বৃষ্টি কম হয়েছে, জমি নরম হয়নি। এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এক কৃষক অন্য কৃষকের নামে অভিযোগ করলেন। একজন বললেন, তোর পরিবারের সঙ্গে ওর পরিবারের ঝগড়া হয়েছে। পরিবারে পরিবারে মিটিয়ে নে, এখানে ওসব কথা কেন? আর মনে রাখিস, অন্যের দিকে একটা আঙুল তুললে আর চারটি আঙুল নিজের দিকে তাক্ করা থাকে। এই তো সমাজ-দর্শন।

সুস্থ মানবিক আড্ডায় সবাই বক্তা, সকলেই শ্রোতা। কোনও মতকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সেখানে থাকে না। সকলেই সমৃদ্ধ হয় এই আড্ডায়। জানার পরিধি বাড়ে, সহিষ্ণুতার শিক্ষা হয়— সবচেয়ে বড় কথা, মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। একের ভাবনা অন্যকে সমৃদ্ধ করে, সংকীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে শেখায়,— সমাজ-দর্শনের ইতিবাচক প্রভাব ব্যক্ত হয়।

সব শেষে 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের মামার উক্তি 'পরনিন্দা নয়, পরচর্চা নয়' প্রসঙ্গে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। অন্য রাজ্যের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমাদের রাজ্যের মধ্যবিত্তদের আড্ডার সাম্প্রতিক পরিণতি বিষয়ে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তাও 'সমাজ-দর্শন', তবে তা অধঃপতিত দর্শন, সংকীর্ণ মানসিকতার দর্শন, যুক্তিহীন একপেশে দর্শন, 'দলীয় ভাবনায় জারিত' হওয়ার অসুস্থ-বিকৃত দর্শন।

আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে আড্ডার অনেকরকম অর্থ দেওয়া আছে। একটি অর্থ— দুর্বৃত্তলোকের মিলনস্থান। আবার তিনি দুর্বৃত্ত অর্থে জানিয়েছেন— কুক্রিয়া, কুকার্য, দুর্জন, অসদাচরণ।

মধ্যবিত্তদের যে সাম্প্রতিক আড্ডার (ব্যতিক্রম তো অবশ্যই আছে) কথা বলছি, তাঁরা কিন্তু কেউ কুক্রিয়া করেন না, দুর্জন নন, অসাধু নন। ব্যবহারিক জীবনে তাঁরা পরিচ্ছন্ন। শিক্ষিত, পরিশীলিত, ভালো ভালো জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁদের চিন্তা-চেতনা-মনন বিবেকের দ্বারা চালিত নয়, যুক্তিহীন আনুগত্য তাঁদের ভাবনাকে পঙ্গু করেছে, দলীয় ক্রীতদাসত্ব মানবিকতাকে খর্ব করেছে। এ সব সব সময় স্বার্থচিন্তা থেকে আসেনি, এসেছে যান্ত্রিক দর্শনের ভ্রান্তিতে। মস্তিষ্ককে সচল রাখবার অভ্যাসকে বিসর্জন দিয়ে, শেখানো বুলিকে প্রাধান্য দিয়ে, দলদাসত্ব শিরোধার্য করে এবং বিরুদ্ধ মতকে দলিত করবার বিকৃত শিক্ষা থেকে এসবের উৎসার। আর, এই সবের মিলিত কারণে আজ মধ্যবিত্তের অধিকাংশ আড্ডা পরনিন্দা-পরচর্চা-অসহিষ্ণুতা-বুদ্ধিহীন শব্দ ব্যবহার এবং বন্ধুরহিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই ঐতিহ্য কিছুকাল আগেও আমাদের রাজ্যে ছিল না।

মহান মানুষ অধ্যাপক গোপাল হালদারের 'আড্ডা' গ্রন্থটি পড়লে আমরা জানতে পারব আমাদের বাঙালি মননের আড্ডার ঐতিহ্য।

রাজনীতি উচ্চমানের সমাজ-দর্শন। সাম্প্রতিক আড্ডায় আমরা ভাবি, আমরা বোধহয় রাজনীতি বিষয়ে আড্ডা দিচ্ছি। কিন্তু সেখানেই রয়েছে সমাজ-দর্শনের ভ্রান্তি। আমরা দলীয় আনুগত্যে মানসিক-মানবিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে নিজেরা যে যে দলীয় মতভুক্ত তার সপক্ষে যুক্তিহীন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি, অন্যের মতকে অগ্রাহ্য করার কুরুচিকর ধৃষ্টতা দেখাই— আড্ডার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে যায়। প্রতিবাদী কথার সারবত্তা আছে কি না তা ভেবে দেখি না। এই বুঝি আমার দলের নিন্দা হল, দল বোধহয় জনপ্রিয়তা হারাল,— বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তাই নিঃসন্দেহে শত্রু। 'শত্রু' যে অনেকসময় সঠিক যুক্তিপূর্ণ মানবিক কথা বলতে পারে— সে সব ভাবনাকে আমরা গুরুত্ব দিতে নারাজ।

এগুলো ক্ল্যাসিকাল আড্ডা নয়, আড্ডার চিরায়ত সমাজ-দর্শনও নয়, এইসব আড্ডা আড্ডাধারীদের সমৃদ্ধ করে না, সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় না— এসব আড্ডার 'সমাজ-দর্শন' কূপমণ্ডূকতা, সংকীর্ণতা, চিত্তের দীনতা, রাজনীতির নামে দলীয়. ক্ষুদ্রতা,— মন-চিন্তা-মনন যেখানে প্রসারের সুযোগ পায় না তাকে আড্ডা বলি কেমন করে! এ সব মানসিক বিভেদের গুলতানি। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী মধ্যবিত্ত অধিকাংশ মানুষ সেই বিদ্বেষ-সংকীর্ণতা-বিবেকহীনতা-যুক্তিহীনতা-অজ্ঞতার গুলতানিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আর ভাবছি এটাই আড্ডা। উন্নত বাঙালির মননজাত আড্ডার কী করুণ পরিণতি!



আড্ডার সাংকেতিক শব্দাবলি

জ্যোতির্ময় দাশ

বাঙালি যে আড্ডাপ্রিয় (বিকল্পে আড্ডাপ্রাণ কিংবা আড্ডাবাজ) জাতি, এটা আজ পৃথিবীর সবাই জানে। কিন্তু আড্ডায় যে এক ধরনের সাংকেতিক শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রচলন আছে, সেটা বাঙালি ছাড়া আর কোনও জাতি সম্ভবত জানে না। 'সম্ভবত' এই কারণে বললাম, কারণ, বিদেশে যে 'ডিকশনারি অব স্ল্যাংস' আছে, তাকেই এক শ্রেণির আলোচকরা 'আড্ডার অভিধান' বলে মনে করেন। কিন্তু সেটা সঙ্গত কারণেই সঠিক নয়। স্ল্যাংস-এর অর্থ হল 'অশিষ্ট' বা 'অপভাষা'—তাই বিদেশের অশিষ্ট ভাষার অভিধানে সমাজের অন্ত্যজ বর্গের মানুষদের (বারাঙ্গনা, অপরাধী ইত্যাদি শ্রেণির) মধ্যে প্রচলিত অশিষ্ট শব্দটি আছে, যাকে নির্ভেজাল আড্ডার ভাষা বলা যাবে না। তবে নির্ভেজাল আড্ডার মধ্যে এমন কিছু শব্দবন্ধও আছে যেগুলি ততটা মার্জিত নয় এবং প্রায় অপভাষার অশিষ্টতার লক্ষ্মণরেখাটি স্পর্শ করে ফেলতে পারে। যেমন, কলকাতার রাস্তার ধারে রকে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় একটি অল্পবয়সি কিশোরীকে দেখে যদি কেউ বলে ওঠে, 'বি এইচ এম এইচ', তাহলে বুঝতে হবে আড্ডার ছেলেটি বলতে

চেয়েছিল,'বড় হলে মাল হবে'— যার পোশাকি অর্থ 'ভবিষ্যতে কন্যা অপরূপ সুন্দরী' হয়ে উঠবে। আর, লন্ডন কিংবা আমেরিকার কোনও সান্ধ্য পার্টিতে একটি বিদেশি সন্তান কোনও কিশোরীকে দেখে যদি বলে,'বিচ' (bitch),তা হলে সেই কন্যার ভারতীয় পিতা হিসেবে আপনার জানা উচিত যে, ছেলেটি তার বন্ধুদের বলতে চায়,'বিউটিফুল ইন্ডিয়ান টিনএজার কজিং হার্টব্রেক'! কবিগুরুর ভাষায় যেটিকে বলা যায়, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো একি সন্ন্যাসী'!

কৌতুক ও ব্যঙ্গ রচনার নিপুণ লেখক কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'যষ্টি-মধু' পত্রিকায় গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দীর্ঘ দশ বছর ধারাবাহিকভাবে আড্ডার সাংকেতিক শব্দের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সেই শব্দবন্ধকে সংকলিত করে প্রায় চার দশক আগে ১৩৭৬ সালে শ্রীঘোষের সম্পাদনায় 'আড্ডার অভিধান' নামে একটি সংক্ষিপ্ত সাড়ে পাঁচ ফর্মার (অষ্টআশি পাতা) বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিবন্ধের উৎস-মূল হল ওই অধুনা দুষ্প্রাপ্য বইটি ও কিছু পত্রপত্রিকা।

আড্ডার ওজন এবং আভিজাত্যের শ্রেণী-তারতম্যে এই সাংকেতিক শব্দাবলির গুণগত মাত্রার পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। যেমন ছাত্রছাত্রীদের আড্ডার সাংকেতিক অপশব্দ (slang) এবং অপরাধীদের ক্যান্ট (cant)-এই দু'ধরনের সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টির উদ্দেশ্য আলাদা হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীর কৌতুকপ্রিয়তায় বিশ্বাসী, তাদের ব্যবহৃত অপশব্দে তাই হাস্যরসের ইশারা থাকে। অপরপক্ষে অপরাধীরা ধরা পড়ে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে পারস্পরিক শব্দ বিনিময়ের মধ্যে অর্থ গোপন করতে চায়। সেখানে কৌতুকের চেয়ে ভালগারিটির প্রাধান্য বেশি।

সাংকেতিক ভাষার শব্দকোষের লেখক সত্রাজিৎ গোস্বামী স্ল্যাং এবং ক্যান্ট দুটি শব্দেরই বাংলা করেছেন 'অকথ্যভাষা'। সেই শব্দকোষের বইটির ভূমিকায় ভাষাবিদ পবিত্র সরকার স্ল্যাং-এর পরিভাষা হিসেবে 'বদবুলি' বা 'বদকথা' ভেবেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন আড্ডার স্ল্যাংকে এর আগে উল্লেখ করেছেন 'ইতর শব্দ' হিসেবে। আমাদের এই আলোচনায় আমরা আড্ডায় ব্যবহৃত সাংস্কৃতিক শিষ্ট শব্দগুলিকেই উল্লেখ করব এবং যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অর্থে 'অকথ্যভাষা', 'বদকথা' (বদবুলি) বা 'ইতর শব্দ' পরিহার করার চেষ্টা করব, কারণ, শেষোক্ত তিনটি পরিভাষার মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে অশিষ্টতা ও যৌনতার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। আর সে কারণেই আমরা স্ল্যাংকে 'অপশব্দ' এবং ক্যান্টকে 'অমার্জিত শব্দ' হিসেবে গণ্য করব। আড্ডায় প্রচলিত কিছু চালু সাংকেতিক শব্দের (বর্ণানুক্রমিক) উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। অকুপায়েড— অক্কা পাওয়া, ২। অখাদ্য— কুৎসিত বা অপটু ছেলে অথবা মেয়ে, ৩। অয়েলিং— তোয়াজ করা, তেল দেওয়া, ৪। অলপ্লেয়ে— অল্পায়ু,গালাগালি বিশেষ, ৫। অ্যাবসার্ডস— শিখ, সর্দারজি। বিকল্প শব্দ— বাঁধাকপি, ৬। আখাম্বা— প্রকাণ্ড, বড়, ৭। আওয়াজ দেওয়া–রোয়াব দেখানো, ৮। আনন্দবাজার— সব খবর যে দিতে পারে। বিকল্প শব্দ— গেজেট, ৯। আলুর দোষ— পরকীয়া প্রেমে আসক্তি, ১০। আড়াই প্যাঁচ— বিড়ি (বিড়ির পাতা ও সুতো আড়াই পাক জড়ানো থাকে),১১। ইউ. এস. এ— উত্তম-সুচিত্রা অ্যাসোসিয়েশন (প্রেমিক-প্রেমিকা অর্থে), ১২। ইটালিয়ান সেলুন—ফুটপাথের চুল কাটার জায়গা, ইট পেতে বসতে হয় বলে), ১৩। উঠতি গুন্ডা— সবে যে বখাটে হতে চলেছে, মারপিট করে, ১৪। উলিয়া— অত্যন্ত মোটা, ১৫। এ.বি.সি. ডি— আমেরিকায় বর্ন কনফিউজড দেশি (প্রাচীন ভারতীয়দের দ্বিতীয় প্রজন্ম), ১৬। একথান— একশো টাকার নোট, ১৫। এল.এম.এফ— লেজ মোটা শেয়াল, ১৭। ও. জি.ও— বয়স্কা মহিলার তরুণী সাজা, ১৮। ক্যাট— ক্যাজুয়াল আমেরিকান টিনএজার, ১৯। কে.পি.কে— খাও পিও খিসকো, ২০। ক্যালকেশিয়ান— কলকাতাবাসী, ২১। কারবার কেরোসিন— গুপ্ত ব্যবসা ভেস্তে যাওয়া, ২২। কান্‌কি— এক চোখ বন্ধ করে ইশারায় কিছু বলা, ২৩। কুত্তি— বাজারের মেয়ে, সহজলভ্য মেয়ে (ইংরেজি বিচ শব্দ থেকে), ২৪। খচে বোম হওয়া— রেগে যাওয়া, ২৫। খদ্দর— বিশেষ রাজনৈতিক দল, কংগ্রেসি, ২৬। খাকি— বিড়ি, ২৭। খানদানি— ভারি, অভিজাত, ২৮। খাস্তা নিমকি— সুন্দরী মেয়ে, ২৯। খিঁচপার্টি— কৃপণ ব্যক্তি, ৩০। খুঁটি—ব্যাকিং, ৩১। গজ— বড়রকমের ছোরা, ৩২। গজব— আশ্চর্য, ৩৩। গাঁজা— মিথ্যে কথা বলা, ৩৪। গাড্ডু— পরীক্ষায় ফেল করা, ৩৫। গাবিয়েছে— প্রেমে পড়া, মুশকিলে পড়া, ৩৬। গুরু— ওস্তাদ, দলের পান্ডা, ৩৭। গুলোলজিস্ট— যে গুল মারতে বা মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ, ৩৮। গেঁড়াকল— ফাঁদ, বিপদ, ৩৯। গ্যারাজে পাঠানো— শিক্ষা দেওয়া, ৪০। ঘর মজানো— নিজের সর্বনাশ করা, কেলেঙ্কারী করা, ৪১। ঘুসকি— যে স্ত্রীলোক গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করে অথচ ভদ্রপল্লিতে বাস করে, ৪২। ঘেঁসো— অচল অথবা বাজে মাল, ৪৩। চলেবল— চলতে পারে, কাজে লাগতে পারে (মেয়ে), ৪৪। চাঁদা-চিংড়ি— গরিব, ৪৫। চাকা— সাইকেল, ৪৬। ঝামপু— চালাক, ৪৭। চিচিং ফাঁক— কেটে পড়া, ৪৮। চুকলি— এর কথা ওকে বলা, ৪৯। চৈতন— যে বুঝেও না বোঝার ভান করে বা যে সত্যিই বোঝে না (ন্যাকা

চৈতন!), ৫০। চোট— হারানো বা খোয়া যাওয়া, ৫১। জগ দেওয়া— কারও ঘাড় ভেঙে কিছু নেওয়া, ৫২। জরদগব— অকর্মণ্য, ৫৩। জাবরকাটা— একই কথা বারবার বলা বলা বা একই কাজ নিয়ে বসে থাকা, ৫৪। জালি— অত্যধিক চ্যাংড়া, ৫৫। জিওগ্রাফি— আকার, আকৃতি, ৫৬। জিলিপি— কুটিল ব্যক্তি, ৫৭। ঝুল হয়ে যাওয়া— ব্যাপার ভেস্তে যাওয়া, ৫৮। টাইট— জব্দ করা, ৫৯। টাকা— টাকওলা ব্যক্তি, ৬০। টালি— আধুলি, আট আনা, ৬১। টিকটিকি— গুপ্তচর, ৬২। টি-এম— টানা মুখস্ত, ৬৩। টেঁপি— অসুন্দরী মেয়ে, ৬৪। ঠুকে দেওয়া— আরম্ভ করা, ৬৫। ঠোলা— পুলিশ, ৬৬। ডবল-ডেকার— খুব লম্বা চওড়া বিরাট চেহারার মহিলা, ৬৭। ডবলিউ-টি— টিকিট ছাড়া, ৬৮। ড্রাগ লাইন— যে মেয়ের গলা লম্বা, ৬৯। ঢেপসি— অকর্মা মেয়ে, ৭০। ঢোল— বাকসো, কোষবৃদ্ধি, ৭১। ঢোলগোবিন্দ— বোকা নির্বোধ, ৭২। তালপাতার সেপাই— খুব রোগা লম্বা লোক, ৭৩। তিলুয়া— খুব বেশি চালাক বা কুচুটে, ৭৪। তেলানো— খোসামোদ করা, ৭৫। তেলমাখা— পালাবার পথ করা, ৭৬। তেড়েল— গুন্ডা (উৎপত্তি; যারা তেড়ে আসে), ৭৭। ত্যাঁদড়— পাজি লোক, ৭৮। থাপ্পড়— পাঁচ টাকার নোট, ৭৯। দর্জিপাড়ার ছেলে— চৌখস, চালাক চতুর, ৮০। দক্ষিণা— মার দেওয়া, ৮১। দাঁড়কাক—অত্যন্ত কালো ছেলে বা মেয়ে, ৮২। দাগি আসামি— বিবাহিতা মহিলা, ৮৩। দাবাই— মার দেওয়া, ৮৪। ধামা— গর্ভবতী স্ত্রীলোক, ৮৫। ধামাধরা— মোসাহেবি করা, ৮৬। ধিনিকেষ্ট— চঞ্চল প্রকৃতির, ৮৭। নন্দু-এগারো— কেটে পড়া, বিকল্প—ন-দো-গ্যারা, ৮৮। নথ ঝামটা— গালাগাল বা কথা শোনানো, ৮৯। নাং— উপপতি, ৯০। পি-পি-পি— প্রেম-পড়াশুনা-পলিটিকস, ৯১। পি এস পি— পিওর সেলফিশ পার্টি, ৯২। পাগলি— প্রেমিকা, ৯৩। পাঁয়তারা ভাঁজা— দীর্ঘ ভূমিকা করা, ৯৪। পেট কাটা— যার পেটে কথা থাকে না, ৯৫। পেটোয়া— মোসাহেব, ৯৬। পেঙা দেওয়া— কোনও জিনিস নিয়ে ফেরত না দেওয়া, ৯৭। পেঁয়াজি করা— ইয়ার্কি করা, ৯৮। প্রণামী— ঘুষ, ৯৯। প্রেসটিজ পাংচার— অপদস্থ হওয়া, ১০০। প্যাঁক দেওয়া— সশব্দে প্রতিবাদ জানানো, টিটকিরি দেওয়া, ১০১। ফর্টিচার— বাচাল, ১০২। ফাঁদ— প্রেম, ১০৩। ফান্টুস— যে ছেলে স্টাইল করে, ১০৪। ফুটে যাওয়া— পালানো, সরে পড়া, ১০৫। ফেকলু— হেলাফেলা, ১০৬। ফোর-টোয়েন্টি— চিটিংবাজ, ফাঁকি দেওয়া, ১০৭। বংগস— বাঙালি, ১০৮। বাঁধাকপি— শিখ, সর্দারজি, ১০৯। বক্তিয়ার খিলজি— যে অযথা বকবক করে, ১১০। বধ করা— কায়দা করে কিছু আদায়

করা, ১১১। বগোলিয়া— হাতকাটা জামা পরা। বিকল্প শব্দ— গুন্ডাহাতা, ১১২। বায়নাক্কা— আবদার, রিক্ত করা, ১১৩। বাঁশ—পেছনে লাগা, ক্ষতি করা, ১১৪। বি সি— বোক-চৈতন, ১১৫। বুকনি— চাল মারা, ১১৬। বুক-জুবিলি-ডায়মন্ড— বাংলা মানে বৈজয়ন্তীমালা (খাসা সাজগোজের তরুণীর প্রতি প্রযোজ্য), ১১৭। বোতল— মদ, ১১৮। বোর্ড— গোপন জুয়ার আড্ডা, ১১৯। বোল্ড আউট— সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া, ১২০। ভাগলপুরিয়া— মোটা মেয়ে, ১২১। ভুসি— বোকা, অসার বস্তু, ১২২। ভেটকি লোচন—কৃপণ ব্যক্তি, ১২৩। ভেকু— কান্না, ১২৪। ভেকো— সন্ন্যাসী, ১২৫। ভ্যাঁপু দেওয়া— ঠাট্টা করা, অপদস্থ করা, ১২৬। ভ্যাকা— ক্যাবলা, ১২৭। মস্তান— দলের পান্ডা, ১২৮। মহম্মদ করা— প্রেম করা (হিন্দি মোহব্বতের বিকৃত রূপ), ১২৯। এম এ— ম্যারেড এগেন, ১৩০। মধু—টাকাপয়সা, ১৩১। মার্ডার— নষ্ট হওয়া বা করা, ১৩২। মাছি— যে লোক কারও ভালো দেখতে পারে না, ১৩৩। মাকাল ফল— বোকা, অকর্মণ্য, ১৩৪। মিলিটারি— বিড়ি (খাকি রঙের কারণে), ১৩৫। মেড সারভেন্ট— গিন্নি, স্ত্রী, ১৩৬। ম্যাডাগাস্কার— নষ্ট হয়ে যাওয়া, ১৩৭। যন্ত্র— মার্কামারা ছেলে, ১৩৮। যন্ত্রী---অধ্যাপক, ১৩৯। রকেট— অত্যাধুনিক, ১৪০। রসিদ কাটা— মারা যাওয়া, ১৪১। রামপাঁঠা— একদম বোকা, ১৪২। রোমিও— প্রেমিক, ১৪৩। লম্বা দেওয়া— কেটে পড়া, পালিয়ে যাওয়া, ১৪৪। লাইনের মাল— সহজলভ্য মেয়ে, ১৪৫। লালটুস— গোলগাল ফর্সা বালক, ১৪৬। লে-হালুয়া— যা বাব্বা! ১৪৭। লিকিং— পেটখারাপ, ১৪৮। শয্যাগুরু— স্ত্রী, প্রেমিকা, ১৪৯। শালগ্রাম— অকেজো ১৫০। শিকেয় হাঁড়ি— গরিব, ১৫১। শুকসারি— প্রেমিক-প্রেমিকা, ১৫২। সিপাই— রোগা লোক, ১৫৩। সুরধনী— নাকে কাঁদা মেয়ে বা ছেলে, ১৫৩। সেঁকে দেওয়া— অবস্থা একেবারে খারাপ করে দেওয়া, ১৫৪। হরিণবাড়ি— জেলখানা, ১৫৫। হল্লা— পুলিশ, ১৫৬। হড়কে যাওয়া— পালিয়ে যাওয়া, ১৫৭। হাপু— হা-হুতাশ করা, ১৫৮। হালুয়া টাইট করা— মার দেওয়া, জব্দ করা, ১৫৯। হুলি করা— কাউকে বোকা বানানো, ১৬০। ক্ষীর— শাঁসালো, সলিড।

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কথাশিল্পীরা তাঁদের লেখায় মাঝেমধ্যেই এক ধরনের সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন আড্ডার মেজাজে, যার জন্মদাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বয়ং। তাঁদের সেইসব বাক্যবন্ধ আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

তার সামান্য কিছু নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে। বন্ধনীর মধ্যে লেখক যে বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি উল্লেখ করা হল। এই বিশেষ শব্দগুলি ক্রমশই আড্ডায় জায়গা করে নিয়েছে।

রাধাকান্ত দেব: ১৭৮৩ - ১৮৬৭

আগড়া ভাঙা (নিষ্ফল কর্ম করা), কাতলা পড়িয়াছে (ডাকাতে মানুষ কাটিয়াছে), চাকি ডুবিল (সূর্য অস্ত গেল), জনার্দন হয় নাই (ভোজন হয় নাই), পটোল তুলিয়াছে (পলায়ন করিয়াছে। বিকল্প অর্থ অক্কা পাওয়া), ফুল তোলা করিয়া লও (সর্বত্র হইতে কিঞ্চিৎ লওয়া), বাঘের মাসি হইলেন (পুনরায় গমন করিলেন), বাহাত্তরিয়া হইয়াছে (অজ্ঞান হইয়াছে), বেগুন তোলা (অল্প অল্প লওয়া), শ্রীহরি করো (গমন করো), হাত মারা (ফাঁকি দিয়া লওয়া)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা) ১৮৪০ - ১৮৭০

কোঁতকা (গোত্তা), খ্যাঁরা-গুঁপো (ঝাঁটার কাঠির মতো খোঁচা খোঁচা গোঁফ), ছুঁচোর কেত্তন (ফাঁকা বদমায়েশি), ডিবডিবে (রোগা), বব্বলে (যে বাজে কথা বলে), লক্কাই (বাবুগিরি), হাত বুলানো (ঠকানো), টেক-টেক-নো টেক-নো টেক একবার তো সি (নাও-নাও না-নাও না-নাও একবার তো দ্যাখো— দোকানির চিনা ইংরেজিতে খদ্দেরকে অনুরোধ)।

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) ১৮১৪ - ১৮৮৩

ইয়ার বকসি (আড্ডার বন্ধু), এগারো ইঞ্চি (ইট), কড়াংধুম (খুব ধুমধাম), কাগের ছা বগের ছা (হিজিবিজি করে লেখা), চান্দপো (বিশ্রাম করা), জলগোজা (জলে নাকানি চোবানি খাওয়ানো), ঢালসুমরে (আত্মরক্ষা), তুলতামাল (মারামারি), ত্রিপণ্ড (যে কাজ পণ্ড করে), বড়কট্টাই (চালবাজি), বিটলে (বদমায়েস), বুকদাবা (হতাশা), হালাত (হালচাল)।

দীনবন্ধু মিত্র (রায়বাহাদুর) ১৮৩০ - ১৮৭৩

আধাখ্যাচড়া (কাজের খানিকটা শেষ করা, খানিকটা বাকি রাখা), কমবক্তি (বোকা), কাঁঠালের আঠা (নাছোড়বান্দা), কাপটেবাবু (কাপ্তেনবাবু), নালায়েক

(নাবালক), পরজরি (পাপ বা অনিষ্ট), প্যাঁচপয়জার (পুরস্কার ও তিরস্কার), শ্যামচাঁদ (নীলকুঠির সাহেবদের ব্যবহৃত চামড়ার চাবুক)।

অমৃতলাল বসু ১৮৫৩ - ১৯২৯

অবতারি-হুজু (অবতার সেজে হইচই করা), কচ্ছং খলিতং (কাছা খুলে যাওয়া), খোঁয়ারি (কুড়েমি), চুলকনিক প্লেগ (চুলকানি রোগ), ছাগল-সৌরভ (বোকা পাঁঠার গন্ধ), ন্যাকরা করা (ফাজলামি করা), নোনাপানি (চোখের জল), পাঁঠার পো (পাঁঠার বাচ্চা), পলায়তঞ্চ (পালানো), পুলি-পোলাও (দ্বীপান্তর), বনিতা-বিকার (বউয়ের জন্য পাগল হওয়া), বরগা গণনা (বেকার হওয়া, বিরহ সহ্য করা), ম্যাট্রিমনিক প্লেগ (বিয়ে রোগ), সটকানো (পালানো)।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৮৬৩ - ১৯৪৯

ওল্ড চন্দ্রচূড় (ওল্ড ফুল, অসহায়), কড়া-কটাক্ষ (মেয়েদের চোখ রাঙানো), ফপ্লোর (ফাঁদ), ছারপোকার ধর্মশালা (যেখানে ছারপোকার প্রাচুর্য), পোদ্দার (পদ্যকার, কবি), পাশকরা পাগল (যে লোক বিদ্যা জাহির করে বেড়ায়), ভোজগোবিন্দ (যার কাছে ভোজনই আরাধ্য ব্যাপার), ভেরি ঠিক (খুব ঠিক), ষোল কড়াই মিথ্যে (ডাহা মিথ্যে), সদাইদাস (বিনয়াবতার), হালুমবাজার (আলমবাজার)।

সুকুমার রায় ১৮৮৭ - ১৯২৩

কুমড়োপটাস (মোটা কিম্ভূতকিমাকার লোক), টুঁশটাঁশ (গুঁতো মারা), প্যাখনা (ইচ্ছে, বাসা), হট্টমূলার গাছ (কল্পিত গাছ)।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ১৮৮০ -১৯৬০

ক্যাড (বিশ্রী), গুলজার (হইহই কাণ্ড), তুশ্চু (হেয়, উৎপত্তি 'তুচ্ছ' থেকে), ভ্যাঞ্চিবাবু (ড্যাম চিপবাবু, খুব সস্তা), রেডিওবাবা (যিনি স্পার্ক ছাড়েন), লব্জ (বিশেষ কিছু)।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ১৮৯৯ - ১৯৫৯

ইটিং-আপিস (হোটেল), খুজলু (জিনিস), খুজলানো (কষ্ট দেওয়া), গাড্ডা (বিপদ), চাম-চামটু (ওস্তাদ), চামটু (বাজে), থলথলে কাণ্ড (মজাদার ব্যাপার),



এক সন্ন্যাসীর 'আড্ডা': একটি আপাতবিস্মৃত রচনা

বিশ্বজিৎ রায়

কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী লেখক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সন্ন্যাসী ত্রিগুণাতীতের সাহিত্যনীতির মিল থাকার কথাও নয়, ছিলও না। 'কবিতা'[১] পত্রিকার সম্পাদক বু. ব. পাঠকমহলে কৃতী সাহিত্যিক হিসেবে যতটা পরিচিত, সেই পরিচিতি 'উদ্বোধন'[২] পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ত্রিগুণাতীতের কপালে জোটেনি। উনিশ শতকের একেবারে প্রান্তভাগে স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করে— রামকৃষ্ণশিষ্য, বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-গুরুভাই ত্রিগুণাতীত[৩] এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে পত্রিকাটির সংযোগ ছিল।[৪] সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ 'নীতিবাদ'-এ বিশ্বাসী ছিলেন পত্রিকা-পরিচালকরা। এই নীতিবাদকে 'হিতবাদ'ও বলা চলে। 'প্রচার' পত্রিকাব নেপথ্যে 'পরিচালক' বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে দেশের ও দশের মঙ্গলকে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনই 'উদ্বোধন' পত্রিকার নেপথ্য পরিচালক বিবেকানন্দও দেশ ও দশের

মঙ্গলার্থেই পত্রিকা প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ত্রিগুণাতীত যে সম্পাদকীয়কল্প রচনাটি (নববর্ষ প্রবেশ / উদ্বোধন / দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ মাঘ, ১৩০৬, পৃ ২-৬) প্রকাশ করেছিলেন তাতে ওই হিতবাদী প্রকল্পের স্পষ্ট ঘোষণা চোখে পড়ে। 'উদ্বোধনের উদ্দেশ্য কিছু নিম্নশ্রেণির নহে, আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য্য। প্রয়োজনীয় যে সকল গুণাবলী স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।' এই যে হিন্দু জাতীয়তাবাদপুষ্ট পরহিতব্রত, তাই নিয়ন্ত্রণ করত উদ্বোধনের রচনাবলিকে। 'ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক' যে রচনা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হত— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে— পরহিতসাধনই সেগুলির উদ্দেশ্য।

অপর দিকে বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যিকদের হিতবাদী প্রকল্পের ঘোর বিরোধী। প্রমথ চৌধুরী যেমন দেবী সরস্বতীকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করতে চান না, তেমনই বুদ্ধদেবও কোনওভাবেই সাহিত্যসরস্বতীকে হিতবাদলাঞ্ছিত করতে নারাজ। ফলে জাতীয়তাবাদী সাহিত্য থেকে মার্কসবাদী সাহিত্য তাঁর না-পসন্দ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের তির্যক উচ্চারণ, ছন্দের নূতন প্রয়োগ তাঁর ভাল লাগে বটে, কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের প্রচারমূলকতা তাঁর বিরক্তির কারণ। এই কলাকৈবল্যবাদী চেতনা এতটাই সূক্ষ্ম যে জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির' পর্বের কবিতার উদ্দেশ্যমূলকতা বু. ব.-র রুচির সমর্থন পায় না। বুদ্ধদেবের এই কলাকৈবল্যবাদী মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'আড্ডা' নামক রম্যনিবন্ধটিতে।

উনিশ শতকের জাতিয়তাবাদী বাঙালি ভদ্রলোকেরা দেশের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিশেষ চেতনায় উদ্বোধিত করে পাশ্চাত্য-গণতন্ত্রের আদর্শে নাগরিকদাবিমুখর পাব্‌লিকে (Public) রূপান্তরিত করতে চাইছিলেন। এজন্য গড়ে উঠছিল নানা গণসংগঠন সভা, সমিতি, ক্লাব, অ্যাকাডেমি, সোসাইটি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হচ্ছিল এই 'হিতব্রতী' উদ্দেশ্যবাদী গণসংগঠনগুলিকে। উনিশ শতকে গড়ে উঠেছিল রকমারি সভা, সমিতি, অ্যাকাডেমি, সোসাইটি। এগুলিতে ভদ্রলোকেরা জমায়েত হতেন— কোনও কোনও গণসংগঠনের সাহিত্য মুখপত্রও ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (তত্ত্ববোধিনী সভা) Bengal Academy of Literature (Bengal Academy of Literature,অধুনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) এমন

আরও নাম কার সম্ভব। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাতে এই উদ্দেশ্যবাদের যেমন বিরোধিতা করছেন তেমনই তাঁর 'আড্ডা' নামক রম্যনিবন্ধে উনিশ শতকীয় ও বিশ শতকীয় গণপরিষদগুলির উদ্দেশ্যবাদী কাঠামোর প্রতিবাদ করছেন। এই উদ্দেশ্যবাদী সংগঠনমূলকতার বিপ্রতীপে তিনি রাখছেন বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডাকে।

হইহই আড্ডা জনসমাবেশ নয়, আড্ডার লোকসংখ্যা সুনির্দিষ্ট হবে। নানা-বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তিগত মতামত পোষণ করা যাবে সেখানে। সব আড্ডাবাজই সেখানে কথা বলবেন— একজন বলছেন অন্যজন শুনছেন এমন কাণ্ড চলবে না। এই আড্ডায় খাদ্য ও পরিবেশের আনুকূল্য আবশ্যিক। বুদ্ধদেবের রম্যনিবন্ধটিতে যে মনোরঞ্জক, সাহিত্যসুরভিত, সংস্কৃতিমনস্ক, নির্দিষ্ট-উদ্দেশ্যবিহীন, জমায়েতের কথা বলা হয়েছে তাই বাঙালি সাহিত্যরসিকদের কাছে আড্ডার গ্রাহ্য সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে। হিতবাদী গণপরিসরকে নির্ধারিত ও নির্বাচিত উপায়ে কেমন করে ব্যক্তিগত পরিসরের মেজাজ দেওয়া যায় তাই আড্ডাকুশল কবি বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য।

খেয়াল করলে অবশ্য দেখা যাবে বুদ্ধদেবের এই রচনাটি প্রকাশের ঢের আগে 'আড্ডা' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন ত্রিগুণাতীত। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ত্রিগুণাতীতের 'আড্ডা' একটি বৃহৎ নিবন্ধের অংশ। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্পাদনায় উদ্বোধন পত্রিকার যে শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাতে রম্যরচনা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিল ত্রিগুণাতীতের 'আড্ডা' (পৃ ৫৩২-৫৩৫), উদ্বোধন পত্রিকার ২য় বর্ষ ১৯ সংখ্যা থেকে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত, সংকলন গ্রন্থে তা নির্দেশ করা হয়েছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলি মনোযোগ সহকারে দেখলে অবশ্য টের পাওয়া যায় 'আড্ডা' মোটেই স্বতন্ত্র 'একটি' লেখা নয়। উদ্বোধন দ্বিতীয় বর্ষের ১৯ সংখ্যায় (১অগ্রহায়ণ ১৩০৭) ৫৮৪-৫৮৮ পৃষ্ঠায় 'আড্ডা' শিরোনামে ত্রিগুণাতীতের যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার গোড়ায় প্রথম বন্ধনীর মধ্যে জানান দেওয়া হয়েছিল, 'পূর্ব্ব সংখ্যায় ৫৫৮ পৃষ্ঠার পর।' উদ্বোধন সম্পাদক ত্রিগুণাতীত, উদ্বোধন পত্রিকার ১কার্তিক ১৩০৭ সংখ্যায় অনাথ আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা (পৃ ৫২১-৫৩২) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটির একাধিক উপশিরোনাম ছিল। যেমন ১৫ কার্তিক ১৩০৭ সংখ্যায় দুটি উপশিরোনাম চোখে পড়ে— জাতীয়ত্ববোধ (পৃ ৫৪৭-৫৫৪) ও সৎ ইচ্ছা (পৃ ৫৫৪-৫৫৮)। ১লা অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সংখ্যায় 'আড্ডা' উপশিরোনামে এই রচনার পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হয়। 'শতাব্দীজয়ন্তী

নির্বাচিত সঙ্কলন'-এ সম্পাদক লেখাটির এই তথ্যসূত্র বিস্মৃত হয়েছেন, ফলে উপশিরোনামই হয়ে উঠেছে শিরোনাম— মূল লেখাটির চাল ঠিক রম্যরচনা নয়, তবুও সম্পাদকের আপাতবিস্মৃতি রচনাটিকে রম্যরচনা করে তুলেছে। ত্রিগুণাতীতের রচনা প্রসাদগুণে রম্য হতে পারে, তবে উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক কোনও রম্যতা সঞ্চারের জন্য এটি রচনা করেননি। অন্যান্য বহু রচনার মতো এই লেখাটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় ছিল দেশহিতব্রত।

২

বুদ্ধদেবপূর্ববর্তী ত্রিগুণাতীত 'আড্ডা' নামক অভ্যাসটিকে দেশহিতের কাজে প্রয়োগ করতে চান। উনিশ শতকীয় সভাসমিতির দেশহিতৈষী চাল-চলনের বিপরীতে বুদ্ধদেব স্থাপন করেছিলেন তাঁর আদর্শ 'আড্ডা'কে। আড্ডাধারীর ব্যক্তিগত মেজাজ ও মর্জি সেই আড্ডায় পূর্ণ মর্যাদা পাবে। এই ব্যক্তিগতের বিলাসে ও বিকাশেই বুদ্ধদেবের কাছে আড্ডা মোহনীয় ও লোভনীয়।

ত্রিগুণাতীতের আড্ডার চলনটাই শুরু হচ্ছে ভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। প্রচলিত উদ্দেশ্যবিহীন অলস জমায়েতকে বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতেই তিনি আগ্রহী। রচনাটি বহুপঠিত ও বহুল প্রচারিত নয় বলে সূত্রাকারে ত্রিগুণাতীতের উদ্দেশ্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

ক.

'ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ, ধনী নির্ধনী, পণ্ডিত মূর্খ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একটা আড্ডা আছে। আড্ডা মানে কোনও নিয়মিত প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক সভা, ক্লাব বা কোনওপ্রকার মিটিং বলিতেছি না। আড্ডা মানে— গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অযথা খেলার স্থান, অযথা ফুর্তির বা রগড়ের স্থান, যে স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের, কোনও নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই, যে স্থানে প্রত্যহ বা সর্বক্ষণই যাইয়া থাকি; যে স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন ত অতি অল্পক্ষণের জন্য।' (পৃ ৫৮৪)

ত্রিগুণাতীত যেভাবে আড্ডার লক্ষণ বিচার করেছেন পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু তাঁর সুখ্যাত 'আড্ডা' রচনাটিতে প্রায় সেভাবেই আড্ডার গোত্র নির্দেশ করবেন। তবে আড্ডার কাছ থেকে দুই লেখকের দাবি আলাদা। ত্রিগুণাতীত এরপর পুরুষদের আড্ডাকে ছয়ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) মজলিশি, আড্ডাগুবি

বা খোশগল্পের আড্ডা (২) খেলার আড্ডা (৩) গানবাজনার আড্ডা (৪) ফুর্তির আড্ডা (৫) নেশার আড্ডা (৬) মিশ্রিত আড্ডা। শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদের আড্ডার কথাও খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন ত্রিগুণাতীত। 'মেয়েদের আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাট ত এক প্রধান আড্ডা। গঙ্গা বা নদী যদি দূর হয়, ত নিদেন দিঘী বা পুষ্করিণী। সহর হইলে আড্ডা দিবার সময় একবার— প্রাতঃকাল; পল্লীগ্রাম হইলে, দুইবেলা— দুপুরবেলা স্নানের সময়ে, আর সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইবার সময়। সহরে, পুরুষরা আফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, আর একটি মস্ত আড্ডা দিবার সময়; মফঃস্বলে ত, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও একবার পাড়ায় বাহির হইয়া দুইটি কথা কহিয়া আসা যায়।'

লক্ষণীয়, শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েলি আড্ডার হালচালও সম্পাদকের জানা। তবে মেয়েদের আড্ডা সেই উনিশ শতকে পুরুষদের আড্ডার মতো প্রবল নয়। কারণ, 'এমন অনেক সম্ভ্রান্তা মহিলা আছেন, যাঁহারা আজও সূর্য্যদেবের দর্শন পর্য্যন্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।' পর্দানশীনরা তো আর আড্ডা দিতে পারেন না। উনিশ শতকে ত্রিগুণাতীত যখন রচনাটি লিখছেন তখন ছেলে-মেয়ের যৌথ আড্ডা বিরল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' বইতে যে পাঞ্চভৌতিক সভার কথা লিখেছিলেন তাতে তিনজন ছেলের/পুরুষদের পাশে দুই নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ে বটে তবে তা ঠাকুরবাড়ির বাস্তব, বঙ্গদেশের তৎকালীন বাস্তব নয়। 'কল্লোল' পত্রিকার উৎস হিসেবে যে চতুষ্কলা সমিতির কথা বলা হয় তাতে অবশ্য পুরুষ ও নারী উভয় সদস্যই ছিল, কিন্তু সে তো আরও কিছুদিন পরের কথা। আর ছেলেদের আড্ডায় মেয়েদের উপস্থিতি যে তেমন 'সহজ' নয় তা তো স্বাধীনতার পরেও বজায় ছিল। 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'বসন্তবিলাপ', তিন ভুবনের পারে'— এই তিন জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা ছেলেদের জমায়েতে মেয়েদের উপস্থিতির 'সংকট' নিয়ে শুধু কৌতুকই সৃষ্টি করেনি, বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ও অবস্থায় 'লিঙ্গ'-ভেদ কতটা প্রকট তাও তুলে ধরেছে।

ত্রিগুণাতীত অবশ্য ছেলে/ মেয়ে, নারী/পুরুষ এই দুই আড্ডাকেই দেশের শ্রীবৃদ্ধির কাজে লাগাতে চান।

খ.

'এই সকল আড্ডাও দেশের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কোনও নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, আড্ডায় যত শীঘ্র ও সহজে প্রবর্ত্তিত হয়, এত আর

কোথাও হয় কি না সন্দেহ।... অন্যান্য চর্চ্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, খেলা-ধূলার ছলে, দেশের যথাসম্ভব হিতচর্চ্চা, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা। সকলকার প্রতি শুভেচ্ছা, অনায়াসেই আড্ডায় প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশঃ অনেকের ভিতর সদ্বৃত্তি এবং সদুদ্যমের বিকাশ হইবে। বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে, এবং নিজের মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে।' (পৃ ৫৮৬)। এই যে 'হিতবাদী' আড্ডা, তার কথা শুনে কলাকৈবল্যবাদীরা বলতে পারেন ত্রিগুণাতীত আড্ডার মজাই মাটি করেছেন।

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে অবশ্য দেখা যাবে ত্রিগুণাতীতের পরিকল্পনাটি বেশ অভিনব। উনিশ শতকের ভদ্রলোকেরা পাশ্চাত্য নাগরিকতা, গণতান্ত্রিকতা ও রাজনৈতিকতার 'মডেল'কে আদর্শ করে বঙ্গদেশে যে আধুনিকতার আমদানি করতে চাইছিলেন সেই আধুনিকতার অন্যতম 'কারক' জনসাধারণ। এই জনসাধারণকে নানা উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইংরেজরা এদেশে আসার আগে গড়ে ওঠেনি—সভা, সমিতি, ক্লাব, সোসাইটি, অ্যাকাডেমি, অ্যাসোসিয়েশন সবই পাশ্চাত্য গঠনতন্ত্রের ফল।[৫]

দেশজ পরিসরগুলি নিয়ে উনিশ শতকীয় ভদ্রলোকদের নানা কুণ্ঠা আছে। বাংলাসাহিত্যকে যেমন তাঁরা আসর-সাহিত্য বা বাসর-সাহিত্যের সীমা থেকে মুক্ত করে Bengal Academy of Literature-এর অঙ্গ করে তুলতে চান তেমনি জনসাধারণকেও চণ্ডীমণ্ডপের আখড়া থেকে টেনে এনে সভা-সমিতির সচেতন সদস্য করে তুলতে চান। ত্রিগুণাতীত নিজে রামকৃষ্ণ মিশন নামক সভার সদস্য, তবে দেশহিতের জন্য তিনি এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মাপে কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছেন না। একটি পরিচিত দেশজ গণপরিসরের—আড্ডার—সংস্কার সাধন করতে চাইছেন।

'আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণত লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীভূত হয়। আড্ডাসকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলিস্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই একান্ত প্রার্থনা।' (পৃ ৫৮৭)

ত্রিগুণাতীতের এই প্রার্থনা আসলে নির্ধারণবাদী ও নিয়ন্ত্রণকামী। পাড়ার ক্ষুদ্র পরিসরটিকে দখল করে কৌশলী প্রচারের উপায় স্থির করেছেন তিনি। উনিশ

শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদকে স্বাধীনতাউত্তর পর্বের হিন্দুত্বের রাজনীতির পূর্বপুরুষ হিসেবে একমাত্রিকভাবে বিচার করলে ত্রিগুণাতীতের 'আড্ডা' প্রকল্প অহিতকর বলে মনে হতে পারে।[৬]

আবার জাতীয়তাবাদের আখ্যান, ব্যাখ্যানের জন্য সমর্যাদায় পড়া যেতে পারে রচনাটি। আর বাংলাসাহিত্যের আড্ডা[৭] বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে এই আপাতবিস্মৃত রচনাটি যে অন্যতম তাও স্বীকার্য। উনিশ শতকে আড্ডা নিয়ে আর কেউ এতখানি কলমপাত করেছেন কি না নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

টীকা

১. ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪২-এর আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)-এ।

২. পাক্ষিক উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ মাঘ, ১৩০৫।

৩. ত্রিগুণাতীত সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির জন্য পাঠক দেখতে পারেন; শঙ্করীপ্রসাদ বসু, "'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত," দ্র. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পা) উদ্বোধন ১০০ / শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০০।

৪. আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন, স্বপন বসু, "উনিশ শতকের ধর্ম ও তত্ত্বমূলক পত্রিকা", দ্র. স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন (সম্পা) দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫

৫. প্রতিষ্ঠানের বর্গ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্র. গৌতম ভদ্র, দীপা দে,"চিন্তার চালচিত্র; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" পুনর্মুদ্রিত, অবভাস, এপ্রিল-জুন, ২০০২

৬. আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন; শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, "পুনর্" বিষয়ে পুনর্বিবেচনা; 'হিন্দুত্ব'র সালতামামি, অবভাস, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৯

৭. 'আড্ডা' বাঙালির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা নির্মাণের ইতিবৃত্তের সঙ্গে কেমনভাবে নানা স্তরে যুক্ত তা নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন, দীপেশ চক্রবর্তী প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ, প্রিন্সটন। দীপেশ তাঁর রচনায় 'আড্ডা' সংক্রান্ত বহু বিস্মৃত বাংলা রচনার সন্ধান দিলেও ত্রিগুণাতীতের 'আড্ডা' সেখানে অনুল্লিখিত।



রক এখন প্রায় 'শহিদ বেদি'

কিন্নর রায়

রক ব্যান্ড, রক অ্যান্ড রোল— এ সব শব্দ আমাদের চেনা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে ভেসে উঠেছে গত পয়ঁত্রিশ-চল্লিশ বছরে। ইউরোপ থেকে আসা এই কথাদের আমরা নিজেদের অভ্যাস ও যাপনের অংশ করে নিয়েছি। রক, রকবাজি, রকের আড্ডা, তার থেকেও বহু পুরোনো শব্দ।

গত তিরিশ-পয়ঁত্রিশ বছরে, বাঙালি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ক্রমশ একটু একটু করে ফ্ল্যাট আশ্রয়ী হয়েছেন। ফলে তার জীবন-যাপনে বৈঠকখানা, বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, পায়খানা-বাথরুম, ঠাকুরঘর, চিলেকোঠা— সবই প্রায় অদৃশ্য, এমনকী এই সব শব্দমালাও। ফলে ড্রইংরুম, লিভিংরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন, টয়লেট,— এরকম নতুন নতুন শব্দাবলি ঢুকে পড়েছে আমাদের জীবনে। স্কোয়ার ফুটের হিসেবে বেঁচে থাকা মাপতে মাপতে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা অনেকেই। যৌথ পরিবার, বড় খাট, পালঙ্ক, ঢালা বিছানা, এ সবই রূপকথার গল্প।

ছোটকাকা, নপিসি, সোনামামা, ফুলকাকিমা, কুট্টি পিসি, কুট্টিমামা. রাঙা কাকিমা, সোনাকাকিমা এসব ডাকের কোনওটাই আর হিন্দু বাঙালি জীবনে অবশিষ্ট

নেই, আর ফিরেও আসবে না। এর জন্য হা-হুতাশ নয়, নেহাত অতীত-চারণাও নয়, বরং খানিকটা নিরাসক্ত, সমাজমনস্ক চোখ দিয়ে যদি গোটা ব্যাপারটাকে দেখা ও বোঝা যায়, তা হলে দেখব এই সব কিছুর মতো রকও হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের জীবন থেকে। গত পয়ঁত্রিশ-চল্লিশ বছরে— শহর কলকাতাতেই রক সরে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে।

সত্তরের নকশাল আন্দোলন, তীব্র ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনি, চারিদিকে সম্ভব-অসম্ভব নানা কীর্তিকথা, বীরত্ব ও অত্যাচার। তার পরে সত্তরের জমাট বারুদ শেষ হয়ে গেলে নতুন বাড়িতে রক তৈরি করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আসলে সামাজিক প্যাটার্ন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর-দোরেরও রদ-বদল হয়। রক-চর্চা, রকে বসে রকের আড্ডা তেমন করে নতুনভাবে আর দানা বাঁধতে চায় না হয়তো। তার কারণ হিসেবে বলা হতে থাকে, সকলেই খুব ব্যস্ত। সকলেরই অনেক অনেক কাজ। মূলত টাকা রোজগার, আরও বেশি বেশি টাকা রোজগারে নিজেদের ব্যস্ত করতে থাকেন সবাই। তার সঙ্গে নাইট ক্লাব, লেট নাইট পার্টি, এমন নানা অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারও ঢুকে পড়তে থাকে আমাদের জীবনে। আগে কেউ কিছু অর্জন করলে, প্রমোশন পেলে, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলে পরিচিতজন বা ঘনিষ্ঠজন দাবি মেশানো গলায় জানতে চাইতেন, কবে খাওয়াচ্ছিস? এখন জানতে চাওয়া হয়— কবে পার্টি দিচ্ছিস? আগে আগে ব্যথা লাগলে, চোট পেলে, বলা হত, উফ! ওঃ! ও রে বাবা রে! ও রে মা রে। এখন বলা হয়— আউচ!

এই পার্টিতে কখনও কখনও কেন, বেশির ভাগ সময়ই হার্ড ড্রিংকস অবশ্যম্ভাবী। আমি এ লেখায় কোনও হেরম্ব মৈত্রসুলভ নীতিবাগীশ কথা-বার্তা বলতে বসিনি। কিন্তু আমাদের শিকড় কি কাটা পড়ে গেল না?

অনেকে এসব শুনে জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, বাখতিন, লাকা আউড়ে বলতেই পারেন— উত্তর আধুনিক, উত্তর ঔপনিবেশিক কনসেপ্টে সবই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। গোটা বিষয়টা দেখতে হবে দৃষ্টিকোণ বদলে। আমি সেই তর্ক-বিতর্কে যেতে চাইছি না। বরং আবারও রকের কথায় ফিরি।

রক, রকবাজি, রকের আড্ডা, হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বেশ পুরোনো ঘরানা। কালীঘাটে এখনও 'রক ক্লাব' নামে একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবসংগঠন বারোয়ারি সরস্বতী পুজো করে। সদানন্দ রোডের 'তপন থিয়েটার'-এর উল্টো দিকে তাদের এই পুজোর আয়োজন।

রক বলতে তো মূলত উত্তর কলকাতার রক। শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাতিবাগান, ফড়িয়াপুকুর। তার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতাতেও আসে নেচে নেচে কালীঘাট, ভবানীপুর, চেতলা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জের রক।

বছর সাত-আট প্রয়াত হয়েছেন, আশি পেরোনো এমন একজন মানুষকে জানতাম, যিনি তাঁর চোখের সামনে দক্ষিণ কলকাতার লেক খোঁড়া দেখেছেন। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের পর তখন হোগলার জঙ্গল। দক্ষিণ থেকে আলিপুর কোর্টে মামলা করতে আসা লোকজন ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে তাড়াতাড়ি ফিরতে চান, পাছে পথে ডাকাত ধরে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নেয়— এই ভয়ে। টালিগঞ্জও তখন প্রায় শহর কলকাতার ভূগোলের বাইরে। বালিগঞ্জ গড়ে উঠতে চলেছে। নিউ আলিপুরও তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা। চেতলায় শেয়াল ডাকে। ওখানে কে আর যাবে! কালীঘাটে অনেক পুকুর। দক্ষিণ কলকাতার শেষ বিন্দু বলতে ভবানীপুর। তাও বেশ নতুনই গড়ে উঠল, এমনটি বলা যাবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বড়সড় বাড়ির আশেপাশে শিকড় গাড়তে চাইলেন বেশ কিছু নামকরা আইনজীবী ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন। শিক্ষাদীক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত মানুষরা ভবানীপুরকেই তাঁদের শেষ বিন্দু করে নিলেন প্রায়— অন্তত দক্ষিণ কলকাতার নিরিখে। কালীঘাটে নেহাত কালীমন্দির— বিশ্বাসীদের একান্ন পীঠের এক পীঠ, তাই লোকজন আসেন। যদিও কালীসেবায়েত হালদার ও তাঁদের দৌহিত্রবংশ মুখুজ্জেদের কোনও কোনও শরিকের কেউ কেউ গানবাজনা, থিয়েটার হয়তো বা লেখাপড়াতেও খনিকটা উৎসাহী, কিন্তু বলতে গেলে 'শিক্ষিত', 'আলোকপ্রাপ্ত', 'ইউরোপ ঘেঁষা', সেভাবে পুরো ইউরোপ নয় হয়তো, কিন্তু ইংরেজ সান্নিধ্যে থাকা হিন্দু বাঙালির দক্ষিণ কলকাতার শেষ সীমানা ছিল ভবানীপুরই।

এখন কথা হল এই, রক, রকে বসা, রকে বসে বসে গুলতানি করে রাজা-উজির মারা আড্ডাধারীরা অনেকেই তো ছিলেন রীতিমতো প্রবাদবিশেষ। কলকাতায় রূপচাঁদ পক্ষী, পক্ষীর দলের কথা, তাদের বিচিত্র জীবন-যাপন, নেশা করার পদ্ধতি, গান ইত্যাদি— সব নিয়েই তো কথা, লেখালেখি হয়েছে অনেক। কিন্তু কলকাতার রক, রকের ভাষা, রকের বুলি— এ সব নিয়ে তেমন করে কোনও গবেষণা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

ষাট-সত্তরে কলকাতা আর তার গা-লাগোয়া মফস্বলের এ রকম কিছু রকের ভাষা ও তার অর্থ দেওয়া গেল।

১। ফোট— যা-যা, ২। ফুটে যা--চলে যা, ৩। পাগলি ক্ষীর খা— দারুণ বলেছিস ভাই, কখনও আবার অবজ্ঞা বোঝাতেও বলা হয়, ৪।— উড়, উড় পাখি— যা, যা, চলে যা ৫। চাপলুসি— গোপনে,৬। মওগা— মেয়েলি পুরুষ, ৭। লেডিজ— মহিলাভাবসম্পন্ন পুরুষ, ৮। খার খাওয়া— রেগে যাওয়া, ৯। খোসা— মুখ, ১০। থোবড়/ থোবড়া---মুখ ১১। থোবড়া বিলা করে দেব— মুখ ভেঙে দেব, ১২। যন্তর— চাকু, ১৩। বিষ খোসা— কুৎসিতদর্শন মুখ,১৪। চামর— দারুণ, ১৫। রোকড়া— টাকাপয়সা, ১৬। মাল্লু— টাকাকড়ি, ১৭। পার্টি— মহিলা সঙ্গিনী, ১৮। ভাতি— মহিলা সঙ্গিনী, ১৯। পার্টি তোলা— মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে তাকে কবজা করা, ২০। পার্টি ফিট করা— প্রায় একই অর্থ, ২১। লাগদাই— জোরদার, ২২। রুস্তমি— মাস্তানি, ২৩। ছপ্পর— আড়াল, ২৪। চাপলুসি— গোপনে, ২৫। ঠেক নেওয়া— লুকিয়ে থাকা, ২৬। ঠেক্— আড্ডাস্থল, যেখানে বসা হয় (মালের ঠেক), ২৭। বৈঠকি— বিশ্বাসঘাতকতা, ২৮। বৈঠকবাজি— একই অর্থ, ২৯। চামর— স্বাস্থ্যবতী, যৌনতা উদ্দীপক নারী, ৩০। শান্টিং— বসে যাওয়া, ৩১। মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেওয়া— মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া, ৩২। ক্যালানো— মারা, ৩৩। প্যাঁদানো— মারা, ৩৪। বিলা— ঝামেলা, ৩৫। শুড্ডা— বুড়ো, ৩৬। কিচাইন — ঝামেলা, ৩৭। চুদুর বুদুর— বাড়াবাড়ি/ট্যাঁ ফোঁ, ৩৮। টানটু— মদ খাওয়া, ৩৯। মাল প্যাঁদানো— মদ্যপান, ৪০। গ্যাস খাওয়া— মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলে কোনও কাজে ঝাঁপানো, ৪১। বার খাওয়া— একই অর্থ, ৪২। গ্যাস দেওয়া— মিথ্যে কথা বলা, ৪৩। ধুর— বোকা, ৪৪। ডবকা— উভিন্নযৌবনা, ৪৫। মাল— টাকা, ৪৬। মাল— মদ, ৪৭। মাল— মেয়েমানুষ, ৪৮। মাল ফিট করা— মহিলা জোগাড় করা, ৪৯। বাতেলা— বড় বড় কথা, ৫০। বিগ বিগ টক— বড় বড় কথা, ৫১। বাপের লালু ছেলে— ক্যাবলা, ৫২। দুদুভাতু— এলেবেলে, ৫৩। ঠেক মারছি— অপেক্ষা করছি, ৫৪। কান্নিক মার— ঠিক করা, ৫৫। খোচড়— পুলিশ,৫৬। খোচড় বিলা— পুলিশি ঝামেলা, ৫৭। ভরপুর— পুরোপুরি, ৫৮। ছক্কা— হিজড়ে, ৫৯। সাদা কাঠি— সিগারেট, ৬০। ঢুকু— মদ্যপান করা, ৬১। চশমুদ্দিন— যার চোখে চশমা আছে (মলত হিন্দি বলয়ে এটি চলে),৬২। পেটো— হাতবোমা, ৬৩। গ্যানা— হাতবোমা, ৬৪। মাল টপকানো— হাতবোমা ছোঁড়া, ৬৫। গজ— চাকু— পেটে গজ ভরে দেব, ৬৬। চেম্বার— রিভলভার, ৬৭। সাদা— পটাশ, ৬৮। লাল— মোমছাল, ৬৯। মোয়া— বোমা, ৭০। নাড়ু— হাতবোমা, ৭১। টমটম— অণ্ডকোষ, ৭২। ছিপলি— সুন্দরী মেয়ে, ৭৩। যন্তর— চাকু/পুরুষাঙ্গ, ৭৪। সোন— পুরুষাঙ্গ,

৭৫। পাখি— পুরুষাঙ্গ, ৭৬। ডব— পুরুষাঙ্গ, ৭৭। ঢপ— মিথ্যে কথা,৭৮। ঢপবাজি— মিথ্যে কথা বলা, ৭৯। চেপে যা— চুপ কর, ৮০। চেপে বস— থেমে যা, ৮১। ফাওয়া— যৌন সঙ্গম করা, ৮২। খাররা— তাড়াতাড়ি, ৮৩। ঢবলবাজি— মিথ্যে আচরণ, ৮৪। সেয়ানাগিরি— চালাকি, ৮৫। সাত সেয়ানার এক সেয়ানা— অতি চালাক, ৮৬। কেয়া দিস— কী দিল, ৮৭। পাগলি— প্রেমিকা, ৮৮। চাপ, চাপ— থাম, ৮৯। চুলবুলি— ছটফটে, ৯০। ভেড়ানো— অ্যাকসিডেন্ট, ৯১। যন্তর ভেড়ানো— চাকু বা রিভলভার ঠেকানো, ৯২। অন্দর— জেলখানা, ৯৩। মামাবাড়ি— জেলখানা. ৯৪। নোট— অর্থ/টাকাকড়ি, ৯৫। রসগোল্লা— অপদার্থ, ৯৬। খিলি হাসা, ৯৭। খেঁড়ি— যার হাতের টিপ খুব ভালো, ৯৮। খতরা— বিপদ, ৯৯। নকশা— কায়দা, ১০০। নকশাবাজি— কায়দা করা,১০১। ছুপা— লুকোনো, ১০২। চমকানো— ভয় দেখানো, ১০৩। চামাকি— দারুণ, ১০৪। চুল্লু— চোলাই মদ, ১০৫। মামা— পুলিশ/টিকিট চেকার, ১০৬। মামু— একই অর্থ, ১০৭। গুরু— সম্বোধন, ১০৮। ওস্তাদ— সম্বোধন, ১০৯। কানকি মারা— আড়চোখে দেখা/ইশারা করা, ১১০। লাই দিও না— হ্যাঁ-তে হ্যাঁ করা। ১১১। কী দিল, আট আনা কিলো, ১১২। পগেয়া— বদমাইশ (পগেয়া খচ্চর), ১১৩। টাক দুম্বা— টেকো লোক, ১১৪। ধুনকি— মদের নেশা, ১১৫। ফোকটাই— বিনে পয়সায়, ১১৬। চোখ দেখানো— বকাবকি করা, ১১৭। পালিশ, পুলটিশ দেওয়া— জোড়াতাপ্পি মারা। এ রকম বহু বাক্যাবলি ও সুভাষিতাবলি রক মারফতই পৌঁছয় আমাদের কাছে।

পি পিপ পি পিক— প্যাঁক প্যাঁক করে প্যাঁক মারা— কোনও মন্তব্য বা কথাকে অস্বীকার করতে, উড়িয়ে দিতে তো কলকাতার রকই শিখিয়েছে আমাদের।

এর সঙ্গে ইদানীং গত দশ বছরে রক প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেলে আর নতুন কোনও রক তৈরি না হলেও এই সব কথার সঙ্গে যা জুড়েছে তা হল—

১। বিন্দাস, ২। এক ঘর, ৩। ভাও নেওয়া, ৪। ভাও খাওয়া, ৫। ঝাড়ি কথা, ৬। ঝাড়ি মারা, ৭। ল্যাথ, ল্যাথার্জি (আলসেমির সংক্ষিপ্ত রূপ). গুনস (গুন্ডা), ৯। ফিদা, ১০। টিউবলাইট (সহজে কথা বোঝে না), ১১। পেটি, ১২। খোকা. ১৩। লাফড়া, ১৪। কাল্লাস,১৫। সুপারি, ১৬। ভাই— বা এ রকম আরও কিছু। ১১ থেকে ১৫ নম্বর শব্দের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে মুম্বইয়া সিনেমার দৌলতে।

এসব কথা যেমন রকে চলে, আবার সব সময়ে চলেও না। কারণ এক এক রকের মেজাজ এক একরকম। তার আড্ডাধারী, লোকজন, পাড়ার পরিবেশ— সব আলাদা আলাদা। সেই মতো ব্যবহারও হয় থাকে রকবুলির।

রক, সে তো ছিল ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী কালচারের সঙ্গে তাল মিল রেখে বেড়ে ওঠা পরগাছা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষেরই ছবি। যদিও রকে বসে বসে শুধুই পাড়ার মেয়েদের 'আওয়াজ' দেওয়া, তাদের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস, পোশাক-আশাক, হেয়ার স্টাইল ইত্যাদি নজর করা ছাড়াও কংগ্রেস, সি পি আই (এম), সি পি আই, নকশাল, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, চুনী, পি কে, বলরাম, ঋত্বিককুমার ঘটক, সত্যজিৎ রায়, বিলায়েত, রবিশঙ্কর---সবই এসে যেত। মৃণাল সেনের সিনেমা, লিটল ম্যাগাজিন, বিটল্‌সদের গান, নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ— সবই রকের আলোচনার বিষয় ছিল।

আড্ডাধারীরা সবাই নিজেদের মধ্যে বেশ কিছু অলিখিত আইনকানুন মেনে চলতেন। যেমন, যাঁর যেটি নির্দিষ্ট জায়গা রকে বসার, সেখানেই তিনি বসতেন, এমনকী দেরিতে এলেও। দিনশেষে অফিস ফেরত ঘেমেচুমে বাড়ি ফিরে, তারপর গরমের দিন হলে, গা ধুয়ে, টেরি বাগিয়ে, ঘাড়ে-গলায়-বগলে পাউডার দিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে রকে এসে বসা। শীত হলে অবশ্য ঘাম নেই। কিন্তু অফিস বা কর্মক্ষেত্র-ফেরত ক্লান্তি আছে, সে এক মুহূর্তে উড়ে যায় রকের আড্ডার প্রাণপরশে। শ্যামবাজারের শশীবাবুরা এভাবেই সমৃদ্ধ করেন রককে। ষাট দশকের শেষ থেকেই পুলিশের চোখে বিষ হয়ে ওঠে রক। সংগঠিতভাবে তোলতাই করা হতে তাকে রকের ছেলেদের। সন্ত্রস্ত হতে থাকেন রকে বসা রকবাজরা। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট ভাঙা ও বরখাস্তের প্রতিবাদে নানা গণ আন্দোলনে কলকাতা যখন মুখর, তখন রাষ্ট্রশক্তির সংঘবদ্ধ আক্রমণ নেমে আসে রকের উপর। তারপর নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহের পর যে বিশাল সমর্থন মূলত ছাত্র যুবকদের মধ্যে উঠে আসে, তার একটা বড় বিনিময়কেন্দ্র— মতামত দেওয়া, কথাবার্তা বলার জায়গা ছিল রক। উর্দি আর সাদা পোশাকের পুলিশ ক্রমশ টার্গেট করতে থাকে রককে। তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই চায়ের দোকান। মনে রাখতে হবে, কলকাতার বেশির ভাগ চায়ের দোকানই ছিল বাম ও নকশাল আন্দোলনের আঁতুড়ঘর। শ্যামবাজারে তো 'মস্কো কেবিন' নামে বিখ্যাত চায়ের দোকানই ছিল। সেখানে 'বাম', 'ডান', 'অতিবাম', সব শেড ও রঙের কমিউনিস্টরাই আসতেন, বসতেন, তর্ক করতেন। ষাট-সত্তরের পর এ ধরনের চায়ের দোকান প্রায় হাপিস হয়ে গেছে। এখন বাংলা ব্যান্ডের গানে শুধু রয়ে গেছে 'বিজনের চায়ের কেবিন'। চায়ের দোকানে বসে ষাট-সত্তরের ঝোড়ো দিনগুলিতে মস্কো, পিকিং, না কি হাভানা অথবা লাল

তিরানা— এই তর্কের ছবি এখন শুধুমাত্র স্মৃতিচিত্র। বা, দুটো চা চেয়ে তার সঙ্গে একটা 'সিদ্ধার্থ'—ফলস্ ফাঁকা ভাঁড় চাওয়াও গল্পকথাবিশেষ।

কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সময়েই পুলিশের রক অভিযান শুরু হয় নানা রাজনৈতিক কারণে। নজর পড়ে চায়ের দোকান, ক্লাব সংগঠনগুলিতেও। সাদা পোশাকের 'রাষ্ট্রীয়' নজরদাররা সতর্ক চোখ রাখতে থাকে এই সব জায়গায়। কয়েক বছরের সাময়িক বিরতির পর আশির দশকে রক আবার নতুন করে জাগার চেষ্টা হলেও সামাজিক পরিস্থিতি, পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রকের চারপাশ ঘিরে বেড়া দেওয়া— নতুন পাঁচিল, নয়তো বোতল ভাঙা কাচের টুকরো বসানো শেষ করেন বাড়ির কর্তা। অথবা মধ্য কলকাতায় রক বোজাতে বাড়ির কর্তারা শুরু করলেন সিমেন্ট করে তাতে উল্টো পেরেক পুঁতে দেওয়া, যাতে কেউ বসতে না পারে। রকের সমাধি। গাড়িবারান্দা, রক, বৈঠকখানা সবই প্রায় অতীতের 'সোনালি সাক্ষী' হয়ে থাকে। মাথা চাড়া দেওয়া ফ্ল্যাটবাড়ি বা নতুন নতুন তৈরি হওয়া বাড়িতে রক রাখার যে কোনও প্রশ্নই থাকছে না, সে কথা তো আগেই বলে এসেছি।

রক নিয়ে নানা গল্প তো আছেই, তার কয়েকটা শোনাই এখানে।

প্রথম গল্পটা কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের। ভাড়া ঘরে একা থাকা একজন পশু চিকিৎসক, তাঁকে ঘিরে কিছু সকার ও বেকারজন। তাঁদের গড় বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ। তাঁরা ডাক্তারবাবুকে নানা রকম প্রভোক করতেন তাঁর বাসাটির সামনের রোয়াকে বসে। যেমন—

১। এখন যা চিকিৎসা পদ্ধতি হয়েছে, তা কী আর বলব। গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে, ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। তা, উনি বললেন, পেট কাটতে হবে। আমি বললাম, কাটতে যখন হবেই তখন কেটে দিন। সার্জন তখন আমায় একটা চেয়ারে বসতে বললেন। সেদিনের স্টেটসম্যান পড়তে দিলেন। তারপর এক কাপ চা আনতে বললেন ওয়ার্ডবয়কে। আমি বসে বসে স্টেটসম্যান পড়তে পড়তে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হেডিং দেখছি। এর মধ্যেই কখন যেন উনি কেটে দিলেন পেট। আচমকাই। টেরও পেলাম না। এরপর উনি আমার পেট থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি বার করে এনে ধুয়ে, ভেতরের পাথর-ফাতর, ময়লা-ফয়লা বার করে এনে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে সিম্পল ফেভিকল দিয়ে জুড়ে দিলেন।

সেই ভেটেরনারি ডাক্তার— এখনকার ভাষায় 'ভেট' তখন তাঁর শিকপাল্লার দরজা খুলে গুটি গুটি বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়ালেন। তার আগে দেখে নিলেন

পরিস্থিতি। তারপর বললেন, বড় বড় কথা কইস না নিতাই। চালমারা কথা কইস না। এই পশুচিকিৎসকটির আদি বাড়ি ঢাকায়। তিনি নিজেকে একই সঙ্গে বোমা-পিস্তল লাইনের বিপ্লবী, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, ভালো ফুটবল খেলোয়াড়, কুস্তিগীর, চমৎকার চোরধরিয়ে ও রায়টে ইসলাম ধর্মের মানুষকে কচুকাটা করার নিধনকারী হিসেবে দাবি করতেন।

খর্বকায়, গাট্টা-গোট্টা এই ডাক্তারবাবু অকৃতদার। বেশ ভালো খেতে পারেন নিমন্ত্রণ বাড়িতে। নিজে রান্না করে খান। এই রোয়াকে যাঁরা রাতের আড্ডা বসাতেন তাঁরা হলেন, নিতাই দাস— যিনি নিজের পেট কেটে ফেভিকল দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরে। সবিতাব্রত দত্ত— গীতা দত্তদের 'রূপকার' গোষ্ঠীর অভিনেতা, আবার বাংলা সিনেমাতেও ছোটখাটো মুখ দেখান। আর ছিলেন শংকর হালদার, তিনি ছিলেন বেকবাগানের কাছে একটি প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক। এর সঙ্গে সারা দিনই প্রায় টিউশন করতেন। ছিলেন ধ্রুবেশ্বর হালদার— স্থানীয় একটা প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ করতেন, তিনি আবার শংকরবাবুর বড় ভাই। ছিলেন নাদুকাকু— প্রাক্তন ব্যায়ামবীর ও কুস্তিগীর। বর্তমানে ফিজিওম্যাসাজ করেন। হিরন্ময় ভট্টাচার্য—ডাক নাম বাপ্পা— একদা ভারত ও পশ্চিমবাংলার ফুটবল দলের অধিনায়ক, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের প্রাক্তন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের মেজদা। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য (বাবলা) বিশ্বজিতের বড়দা, দুলু দাস— নিতাই দাসের ভাই— এ রকম আরও অনেকে। কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে, কালীমন্দিরের কাছাকাছি এই আড্ডার ঠেকটি ভেট-ডাক্তারবাবু ও শংকর হালদারের মৃত্যুর পর কানা হয়ে যায়। এখন সেখানে বছরখানেক হল ফ্ল্যাটবাড়ি তোলার প্রস্তুতি চলছে, পুরনো দোতলা বাড়ি ভেঙে। সেখানে আর রক থাকবে না, আড্ডাও থাকবে না।

দ্বিতীয় গল্পটা বালি গোস্বামীপাড়ার একটি রকের। সময়টা ষাট দশকের শেষ। সেখানে রঙিন লুঙ্গি ও হাফশার্ট পরা কচিদা স্বঘোষিত নকশাল ও প্রাক্তন ব্যায়ামবীর হিসেবে সর্বদা দম বন্ধ করে বুক ফুলিয়ে থাকতেন, পাছে না তাঁর বুকের খাঁচা আচমকা ভেতরে ঢুকে যায়। তিনি ব্রহ্মচর্য, ব্যায়াম, গীতা পাঠ, নকশাল আন্দোলন বিষয়ে নানা বাণী দিতেন। বলা বাহুল্য তিনি অকৃতদার। আড়চোখে মেয়ে দেখতেন, বিশেষ করে স্কুলটাইমে। তাঁর এই রকবাজি ও নকশাল বুলি থমকে যায় সত্তর দশকে ব্যাপক পুলিশি নিপীড়ন শুরু হওয়ার পরে।

এমনই তো ছিল কলকাতা বা তার গা ছোঁওয়া মফস্বলের নানা রক। সেখানে সবাই ঘড়ি ধরে আসত। বসত। তারপর গজালি। নানা রকম কথাবার্তা। আর বেশির ভাগ সময়েই তা প্রখ্যাত আড্ডাধারী রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তথা আর পি-র ভাষায় কোনও অ্যাজেনডা ছাড়াই চলতে থাকত। মহা সময়ের স্রোত কোথা দিয়ে যে গড়িয়ে যেত, কেউ টেরও পেত না। চা, ডালমুট, তেলেভাজা, মুড়ি— এ সবই ছিল এই রক-চর্চার অন্যতম উপাদান।

এখন নন্দন চত্বর আছে, স্ব-ভূমি, আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু রক প্রায় নির্বাসিত সময়ের নিষ্ঠুর সেন্সরশিপে। আছে তন্ত্রসহ অন্য অনেক নিশিনিলয়, কিন্তু রক, রকের আড্ডা নেই। নাহ্, এর জন্য হা-হুতাশ নেই কোনও, কিন্তু বেদনা তো আছেই।

রক নেই বলেই ঐতিহাসিক নিয়মে ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির সেই 'মেসোয়া' ঘনশ্যাম দাস—আমাদের সবার প্রিয় ঘনাদা আর নতুন করে জন্ম নেবেন না। তাঁর পারিষদ ও গল্প শোনার সঙ্গী শিবু, শিশির, গৌরদের সঙ্গে বিগড়ি হাঁসের খোঁজ আনা বাপী দত্ত, মেসের ঠাকুর রামভুজ— এরাও চলে গেছে নির্বাসনে। যাবেই। কারণ রকের সঙ্গে সঙ্গে মেসবাড়িরও তো আকাল। ঢাকা মেস, বরিশাল মেস, ফরিদপুর মেস— এ সবই তো দূর আকাশের নক্ষত্র। ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের টঙের ঘরে ঘনাদা আর নতুন করে আবির্ভূত হবেন না। পটলডাঙার রোয়াকে আর কখনওই বসবেন না গোরা-পেটানো টেনিদা। যিনি 'পুঁদেচ্চরি', 'ডি লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফেলিস-ইয়াক-ইয়াক' বলে হুঙ্কার ছেড়ে কাঁপিয়ে দেবেন না পটলডাঙা স্ট্রিট-সহ সমস্ত মধ্য কলকাতার আকাশ-বাতাস। তার কারণ গুলুরাজ বা গুলবাহার 'টেনিদা'দের তৈরি হওয়ার মতো সামাজিক পরিস্থিতিটাই তো বদলে গেল। এখন আর পটল দিয়ে শিঙিমাছের পাতলা ট্যালটেলে ঝোল খাওয়া প্যালারাম, বাঙাল হাবুল সেন, ক্যাবলা— সবাই কোনওভাবে জুটে যাবে না টেনিদার আশেপাশে।

'এক চড়ে কান কানপুরে পাঠিয়ে দেব। নাক পাঠিয়ে দেব নাগপুরে।' এ সব বলা-কওয়ার জীবনরসিক লোকেরাও চলে গেলেন। ফলে 'চালিয়াত চন্দর', 'পাগলা দাশু', 'সাধু কালাচাঁদ', 'ব্রজদা', 'পিন্ডিদা' আর বোধহয় ঘুরে আসবে না বাঙালির সাহিত্যভাবনায়। তাঁরা এখন উত্তর-আধুনিক সময়ের স্রোত আর প্যাঁচ-পয়জারে প্রায় ব্রাত্য। তাঁদের জীবনস্রোতও গেছে শুকিয়ে।

কলকাতার রকই শিখিয়েছে দীর্ঘ দীর্ঘ আড্ডায় নানা বিষয় তুলে আনতে। তার বৈচিত্র্য, গতানুগতিকতাহীন গতিবেগ মুগ্ধ করেছে আমাদের অনেককেই।

রক নিয়ে রকের আড্ডা নিয়ে গল্প আরও আছে। সে সব কথা বলতে গেলে মহাকাব্যের সুতো খুলতে হবে একটু একটু করে। রকের জীবন, রকে শুয়ে থাকা, রকে বসে প্রেম, প্রেমে পড়া, প্রেম ভেঙে যাওয়া— এ সবও এখন আর সেভাবে ঘুরে ঘুরে আসে না আমাদের সামনে। রকে শুয়ে জীবন কাটিয়ে দিতেন পাড়ার বহু চেনা-অচেনা পাগল-পাগলি, ভবঘুরে-ভিখিরি, আশ্রয়হীন-আশ্রয়হীনা। রকে বসে বসে ঘুড়ি জোড়া, বিশ্বকর্মা পুজোয় ওড়াতে হবে বলে ঘুড়ি সাজানো, গুছিয়ে রাখা, তড়পা করে বেছে বেছে ডাঁই করে রাখা, সবই তো স্মৃতিমাত্র। বহু রকে আগেকার দিনে ষোলো ঘুঁটি মোগল-পাঠান, বাঘবন্দির ছক কাটা থাকত, সিমেন্ট করানোর সময়ই। বাড়ির কাজের লোক, দারোয়ানরা, পাড়ার ছেলেরা— সবাই অংশ নিতেন সেই খেলায়। এও আড্ডার অংশ।

রকে মেয়েরা সেভাবে বসতেন বা বসেন এমন নজির খুব একটা নেই। রোয়াকের সঙ্গে উঁচুমতো সিমেন্ট বাঁধানো বসার জায়গা, সেখানে ঠেস দিয়ে বসা— সবই এক সময় মধ্যবিত্ত কেতার মধ্যে পড়ত। রকের লাল সিমেন্টের পাশে চওড়া কালো বর্ডার, সেও তো বেশ ডিজাইন বিশেষ। তার চারটি কোণের গায়ে গায়ে ডিজাইনের কালো কালো অর্ধবৃত্ত। এ সবই তো পিরিয়ড-পিস। কলকাতার প্রোমোটারি রাজের কল্যাণে সে সব কিছুই এখন ভ্যানিশ।

শেষ করব রকের আরও একটি গল্প দিয়ে। এ গল্পটি নেহাতই আমার তৈরি। ধরা যাক রূপকথা।

সেখানে রক নয়, রকের মানুষদের গুল-গপ্পোই প্রধান হয়ে ওঠে। এমন রকে হয়তো এসে বসেন বাঙালির হৃদয় ও মননের রাজা রবীন্দ্রনাথ। এসে বসেন সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর মশাই, রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকবাবু, এমনকী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বসতে পারেন রকে। কিন্তু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ? তিনি কেমন করে বসবেন রকাসনে? অথবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র? ঋত্বিককুমার ঘটককে রকে বসা ভাবলেও ভাবতে পারি। কিন্তু সত্যজিৎ রায়? তিনি কি তাঁর ব্রাহ্ম ও এলিটসুলভ চিন্তা নিয়ে পারতেন রকবাজি করতে? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

মহামহিম কিশোরকুমার একটি গান গেয়েছিলেন বহু বছর আগে- - 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ/ ডিম নেই তবু অশ্বডিম্ব।' গানটির একটি লাইন ছিল এই রকম— 'গুলবাজি রকবাজি চলে'। কিশোরকুমার তাঁর স্বর ও সুরে গুলবাজি

ও রকবাজিকে মান্যতা দিলেন অনেক, অনেক বছর আগেই। সেই গুলবাজি, রকবাজি আটকে রইল নেহাতই কিশোরকুমারের গানে গানে। বাংলা সাদা-কালো সিনেমায়— পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকে— সাড়ে চুয়াত্তর, আপনজন, প্রথম কদম ফুল, তিনভুবনের পারে— এই রকম কোনও কোনও চলচ্চিত্র-অভিলাষে রক রয়ে গেল হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রবল নস্টালজিয়া আর দীর্ঘশ্বাসের ভেতরে। রক-এর সঙ্গে বকবক আর আড্ডার সঙ্গে গাড্ডার একটা ধ্বনিগত মিল থাকলেও আসলে আড্ডা দিয়ে, নিছক আড্ডাবাজি করে গাড্ডায় যায়নি কেউই। পড়েনি গাড্ডার গভীরে। হয়তো বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আয়, রোজগার, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এ সবে না হলেও অন্তত জীবনযাপন করার ব্যাপারে তাঁরা অনেকেই এগিয়ে থেকেছেন অনেকের থেকে শ' কদম।



আড্ডার বিবর্তন-বিচিত্রা

ভব রায়

'আড্ডা'-র সেকাল ও একাল অর্থাৎ 'আড্ডার বিবর্তন' প্রসঙ্গে আলোচনায় ঢোকার আগে 'আড্ডার সংজ্ঞা, তার রূপ ও রেখা, এক কথায় আড্ডার একটি 'বস্তুনিষ্ঠ' ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমরা তো এ-ও জানি, আড্ডার কোনও সুনির্দিষ্ট বস্তুগত সত্তা নেই, যেমন নেই কোনও ছকমাফিক আকার বা সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ। মানুষের সভ্যতার ঠিক কোন পর্বে, কোন দেশে আড্ডার উদ্ভব ঘটেছিল, ইতিহাসের পাতা ওলটালে তার হদিশ হয়তো মিলতে পারে, অথবা না-ও মিলতে পারে।

প্রাচীন গ্রিসে বা মিশরে, ইতালি বা ইরানে, ইংলন্ডে বা ফ্রান্সে— সব দেশেই সব কালে আড্ডার যা চলন ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। তাই আমাদের ধরে নিতে অসুবিধা হয় না, বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষেও সমাজের বিভিন্ন লোকবৃত্তে অতীতে, এমনকী দূর অতীতেও স্বমহিমায় প্রবহমান ছিল আড্ডা-সংস্কৃতি।

তাই আড্ডার এই ট্র্যাডিশন ও সর্বজনীন চারিত্র-বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে তার প্রকৃত স্বরূপকে খোঁজার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। পাশাপাশি আবার এটাও

ঠিক যে, ধরন-ধারণে বা পরিবেশে-পটভূমিতে বিভিন্ন কালপর্বে বহিরঙ্গে আড্ডার অসংখ্যবার রূপবদল ঘটলেও অন্তরঙ্গে বা গুণগত অভিজ্ঞানে তার পরিবর্তন ঘটেনি বললেই চলে। দেড়শো-দুশো বছর আগেও আড্ডার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য লেখক-সাংবাদিক লিখেছেন, "Always good natured and social, he would take part, at commencement in any sort of tattle or twaddle. The talk might be of 'beeves' and he could grapple with them if expected to do so. But his musical cadences were not in keepimg with such work, and in a few minutes (not without some strictly logical sequence) he could escape at once from beevers to butterflies and thence to the soul's immortality, to Plato and Kant, and Fichte to Milton's early years, and Shakespeare's sonnets to Wordsworth, Coleridge to Hommers."

আশা করি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ হয়েও কী অসাধারণ চিত্রসংজ্ঞা ফুটে উঠেছে আড্ডা তথা আড্ডাবাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটিতে, যার সঙ্গে অনায়াসেই মিলে যেতে পারে 'আমার বাংলা' বা স্বদেশভূমির বিভিন্ন বর্ণবাহারি আড্ডা-ঐতিহ্যের।

তবু, একথাও অনস্বীকার্য যে, আমাদের চেনা মহলের বা বঙ্গীয় ঘরানার আড্ডার যেমন 'সেকাল' ছিল, তেমনই 'একাল'ও রয়েছে। অন্তত সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের নিরিখে, আড্ডার ভবিষ্যৎকালের পূর্ব-সমীক্ষাও অসম্ভব অবাস্তর নয়। এক কথায়, 'আড্ডার বিবর্তন' নামাঙ্কিত একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী সরণি-রচনাও দুরূহ নয়, এবং সেই বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণে শুধুই যে আড্ডারই কালানুক্রমিক প্রতিবিম্ব দেখা যাবে, তা-ই নয়, যে বিশিষ্ট খণ্ড-সামাজিকতায় সংশ্লিষ্ট আড্ডা সচরাচর দৃশ্যমান হয়ে থাকে, তারও বহুলাংশ প্রতিভাস দৃশ্যমান হতে পারে সেখানে— অনেকটাই যেন কাকতালীয়ভাবে।

তা, কেমন ছিল আজ থেকে একশো বছর, কী দেড়শো বছর আগেকার সেই আড্ডা-বিচিত্রা? বর্তমান প্রয়োজনীয় পটভূমি হিসেবে স্বচ্ছন্দে 'বাংলা ও বাঙালি'কে আমরা রাখতে পারি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নাতি-দূর বা দূর অতীতে আড্ডা গ্রামেও ছিল, শহরেও ছিল এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক পরিমাণে ছিল মহানগরী কলকাতায়। আবারও বলা প্রয়োজন, গ্রামের আড্ডা ও শহর তথা কলকাতার আড্ডার রূপবৈশিষ্ট্যে ছিল মৌলিক তফাত। গ্রামবাংলায় আড্ডার

মূল ভরকেন্দ্রে ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিকল্প যার ভূমিকা, সেটি হল 'চণ্ডীমণ্ডপ', শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার ভূরিভূরি প্রমাণ মেলে। কিন্তু কলকাতায় সেই অর্থে আড্ডার কোনও একক বা অখণ্ড ভরকেন্দ্র ছিল না, বরং শতপুষ্পের নিত্য-নতুন বিকাশমান বৈচিত্র নিয়ে সেদিনের নাগরিক আড্ডা যেন বহুল পরিমাণেই ছিল বিকেন্দ্রায়িত। আবার, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে যদি আড্ডার উৎসমূলে একটিমাত্র 'নিউক্লিয়াস'কে চিহ্নিত করতে হয়, অনিবার্য কারণেই সেই তকমাটিও কম-বেশি চণ্ডীমণ্ডপেরই প্রাপ্য। তবে, আড্ডার সনাতন ধারক ও বাহক এই যে চণ্ডীমণ্ডপ, তার কপালে আমজনতার তরফ থেকে শুরু করে বিজ্ঞজনেদের তরফেও যতখানি প্রশংসা জুটেছে, সমালোচনার পাল্লাটিও বিশেষ হালকা থাকেনি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথও এ প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাও যথেষ্ট তাৎপর্যময় ও অস্বস্তিকর। তাঁর মতে, বাঙালির চিরন্তন স্বভাব চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিবেশীর নিন্দা। আজ আর সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না— রবীন্দ্রনাথ যে আড্ডাকে বলেছেন চিরন্তন স্বভাব, তাই অবশেষে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালির অচ্ছেদ্য জাতি-বৈশিষ্ট্য।

তাই এ সবেরই ঐতিহ্যগত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, তাঁর অননুকরণীয় রম্যভঙ্গিতে দ্ব্যর্থহীন ব্যঞ্জনায় এই সাহসী পর্যবেক্ষণের ঘোষণা করেছিলেন গোপাল হালদার— 'আমরা বুঝব শাহেদ সুরাবর্দির কথা কত খাঁটি—বাঙালির বৈশিষ্ট্য কি? যা আর কারও নেই— 'আড্ডা'।' রবীন্দ্রনাথ থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত কিংবা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, বিভিন্ন মতাবলম্বী সবাই এ কথা মানবেন। কারণ, বাঙালির যত দলাদলি থাক, এঁদের যত মতভেদ থাক, এঁরাও কেউ আড্ডার অতীত নন। সমস্ত বাঙালির মধ্যে এই একটিই মিল আছে— আড্ডা।

সেকাল থেকে একাল, গ্রামে অথবা নাগরিক বৃত্তে, আড্ডার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে রয়ে গিয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট কালচিহ্নের ছাপ। সেকালের আড্ডার পটভূমিটিকে— কী গ্রামে কী শহরে— আমরা যদি 'পেট্রনের যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করি, তাহলে কি অসঙ্গতি হবে? চণ্ডীমণ্ডপকেন্দ্রিক আড্ডার গোড়ার দিকে জমিদারতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের প্রক্ষিপ্ত অবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তার সর্বাঙ্গে। তারই পাশাপাশি, উনিশ শতকের বাবু কালচারের পৃষ্ঠপোষকতায়

গড়ে ওঠা বিভিন্ন আড্ডাতেও ফুটে উঠেছিল ক্ষয়িষ্ণু দেশীয় অভিজাত বা ধনিকতন্ত্রের নানা অভিঘাত। বলা বাহুল্য, পরজীবী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ঢিলেঢালা, দায়হীন, কর্মহীন অবসরের ফাঁকে-ফোকরে ইতিউতি গজিয়ে উঠেছিল গ্রামীণ পারিষদবর্গীয় ও ইংরেজ শাসকদের প্রসাদধন্য মধ্যশিক্ষিত বাঙালি কেরানিবর্গীয় আড্ডার বিচিত্র বহুরূপী শাখা-প্রশাখা।

তাই শুধুই তৎকালীন চণ্ডীমণ্ডপ কেন, জমিদারবাবুর বৈঠকখানায়, কখনও বা ঠাকুরদালানে কতিপয় গ্রামবাসীর নিত্যদিনের 'নাম-কীর্তন', কখনও বা পালাগানের মহড়া, এমনকী নিছক 'গুড়ুক খাওয়া'র (হুঁকো সহযোগে তামাকু সেবন) লোভেই জড়ো হত কত গ্রামবাসী।

কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে পৃষ্ঠপোষণ বা পেট্রনের যুগে ক্রমশ এক সময় দাঁড়ি পড়ল। আর ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই, গ্রামে ও শহরে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমশ আড্ডাব স্বত্ব ও মালিকানা চলে গেল বহুস্তর আমজনতার হাতে। আর সেই সঙ্গে সর্বত্রই বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে গেল আড্ডা-বিচিত্রার। নিজেদের মধ্যে থেকে যৌথ পৃষ্ঠপোষণের এই স্বতঃস্ফূর্ত পালাবদলও আড্ডার বিবর্তনে একটি বিশেষ মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে অবশ্যই। এরই সূত্র ধরে, শুধুমাত্র চণ্ডীমণ্ডপের ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ রইলো না গ্রামের আড্ডা। এপাড়ায়-ওপাড়ায় নানা ঘরানার, রকমারি বৈশিষ্ট্যের আড্ডা গড়ে উঠল; দিনভর কাজ সারার পরে। সন্ধের পর শুরু হত এইসব আড্ডা, চলত দেড়-দুঘন্টা।

দৈনন্দিনের এই সব গ্রামীণ আড্ডায়, কখনও-সখনও মিশে যেত লোকসংস্কৃতির বিনোদনের টুকরো-টাকরা আয়োজন। কোনও সচ্ছল গৃহস্থের বৈঠকখানায় টুকিটাকি সুখ দুঃখের গল্পের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ নামগান, অন্য কোনও পাড়ায় আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে চলছে যাত্রাপালার মহড়া, আবার ছেলেবুড়োর কোনও সান্ধ্য আড্ডা হয়তো জমে উঠেছে তাস-পাশার দৈনন্দিন উপচারে। গ্রামীণ পটভূমিতে শুধুমাত্র মহিলাদের নিজস্ব আড্ডার অবকাশ হয়তো বা ততটা ছিল না কোনওকালেই। তবুও, দিনভর ঘর-সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খামারে, পুকুরঘাটে, ঢেঁকিশালে আড্ডার ঐতিহ্যও বজায় ছিল গ্রামের মহিলাদের নিজেদের মধ্যে। এপাড়ার বৌদির সঙ্গে ভিনপাড়ার ননদ-শাশুড়ি, জেঠিমা, কাকিমার সঙ্গে ভাইঝি বা নাতনি, এরকম নিত্যদিনের আলাপচারিতা বরাবরই গ্রামের মহিলাদের একচেটিয়া আড্ডার ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। গ্রামীণ মরসুমি আড্ডার মধ্যে অনায়াসেই জায়গা করে নিতে পারে মাসভর টুসুভজনা ও ভাদুবন্দনা

গ্রামের আড্ডার পট বদলের যখন এই ছবি, কলকাতা তথা নাগরিক আড্ডাও 'বাবু কালচার' বা রাজদরবারের বিলীয়মান প্রভাব ছিঁড়ে দিনে দিনে বেশি সাধারণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছিল। বিশেষ করে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে অন্তত টানা দুটি দশক ধরে কলকাতার আড্ডাবৈচিত্রের বহুমাত্রিকতায় আক্ষরিকভাবেই যেন বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। অবশ্যই কয়েক দশক ধরে কলকাতার আড্ডা-নৈবেদ্যের শীর্ষে 'বাতাসা' হয়ে আজও বিরাজমান কফিহাউস। এছাড়াও কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, এমনকী নাতি-দূরের শহরতলিতেও ভিন্ন ভিন্ন জাত গোত্রের আড্ডার শিকড় ছড়িয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব-নিকেশ করে ওঠা হয়তো কোনওদিনই সম্ভব হবে না। বড় রাস্তার ফুটপাথে অথবা গলিতে নিছক গাল-গল্প, রাজা-উজির বা বাঘ-সিংহ মারার বকবকানি, শানবাঁধানো রকে এক টুকরো জায়গার জন্য বন্ধুর সঙ্গে লড়ালড়ি— গুল্পবাজ বা রকফেলার তথা নির্ভেজাল আড্ডাবাজ— মহানগরীর সেই বহুল পরিচিত ছবি আজও পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। এ ছাড়াও নাগরিক আড্ডার ছিল আরও হরেক বর্ণবাহার— তাসের আড্ডা, গ্রুপ থিয়েটারের আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, মদ্যপানের আড্ডা, সমাজসেবার আড্ডা, সর্বোপরি খ্যাত-অখ্যাত-খ্যাতিলিপ্সু লেখক-সম্পাদক-প্রকাশকের 'সারস্বত আড্ডা'।

বাঙালির আড্ডা কেন এতটা বর্ণময় হয়ে উঠেছিল, তার বিবর্তনে ও বিভিন্ন সময়ের সন্ধিক্ষণে কেনই বা জড়িয়েছিল নানা রঙ ও রস, এই ঐতিহ্যের পিছনে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের কোনও রসায়ন সক্রিয় ছিল কি না, এসব নিয়ে কোনও বিস্তারিত সমীক্ষা বা গবেষণা আজও হয়নি। তবুও প্রাসঙ্গিক কারণেই আমরা আর একবার স্মরণ করতে পারি সেই অনন্য গোপাল হালদারকে, যিনি যথেষ্ট বিতর্কের ঝুঁকি নিয়েও এইরকম একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন, '...উপরতলার আলস্য ও নীচের তলার নৈরাশ্য— এ দুয়ের মাঝখানে যেখানে ডেরা বাঁধবার সুযোগ মেলে সেখানে জন্মে মধ্যবিত্ত, আর গড়ে উঠতে পারে আড্ডা। ...এ আড্ডা হচ্ছে ইংরেজের কলেজের আর কেরানিশালার দান। সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই, স্বপ্ন আছে কিন্তু সাধনা নেই— বাঙালি মধ্যবিত্তের এই বিধিলিপি। আর সে বিধিলিপির জীবন্ত পরিচয় বাঙালির আড্ডা। এ আড্ডা কি আর কোন জাতির আছে? আর কোন জাতির আছে এমন 'কলোনির কেরানিজীবনে'র বিড়ম্বনা— তার স্বপ্নপ্রয়াণ আর বাস্তববিমুখিতা? ভারতের অন্য রাজ্যেই বা কোথায়? এমন

জমিদারি-তন্ত্রের আওতায় গড়া বাঙালী মধ্যবিত্তের মতো ঢিলেঢালা জীবন—আছে কোথাও আর ভারতবর্ষে? কাজের সঙ্গে অবকাশে সন্ধি, আপিসের মধ্যে আয়েসিয়ানার প্রশ্রয়, কথা দিয়ে কাজের ফাঁকি বাড়ানো আর ফাঁক বোজানো—আছে কোথাও ভারতবর্ষে? এই হল বাঙালী মধ্যবিত্তের আর্ট—তার আর্ট অব লাইফ। তারই সামাজিক রূপ হল আড্ডা...।'

অনিবার্য কারণেই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, এই অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত-পোষণের খুব বেশি অবকাশ আছে কি? একথাও তো অস্বীকার করা যায় না— গোপাল হালদারের কথার প্রেমে বাঙালির আড্ডা-ঐতিহ্যের কার্যকারণে ও প্রায় শতাধিক বছরের বিবর্তন বিচিত্রার সারাৎসার যেন ধরা রয়েছে। নাগরিক আড্ডার একটি প্রধান শাখা— লেখক-সম্পাদক-প্রকাশকের আড্ডা। সেকালেও ছিল, এখনও আছে, তবে সেদিনের সোনালি জৌলুস হয়তো নেই এখনকার এইসব আড্ডায়। যমুনা, ভারতী, প্রবাসী, এইসব সাহিত্যপত্র ঘিরে আড্ডার দিনগুলি তো আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবেই আড্ডার সঙ্গে গলাগলি সম্পর্ক নয়, যে-কোনও লেখক বা সৃজনশিল্পীর আড্ডাপ্রবণ মানসিকতাই যেন তার পরিকৃত স্ব-ধর্ম।

দুই

প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন বাংলা ও বাঙালির আড্ডায় ছন্দপতনের বা তাল কাটার শব্দ একটু একটু করে শোনা যাচ্ছিল ১৯৫০-এর দশক থেকেই। কিন্তু কী গ্রামে, কী শহরে খুব জোরালো ধাক্কাটা সম্ভবত এল ষাট দশকের মধ্যপর্ব থেকে। ঠিক এই সময় থেকে প্রায় টানা এক দশক ধরেই সারা বাংলাই উত্তাল হয়ে থাকত নানা দলের, নানা মতের রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। বিশেষ করে, কলকাতা ও শহরতলিতে বাম ও নকশাল আন্দোলন, পাশাপাশি নানাবিধ পুলিশ-প্রশাসনিক সক্রিয়তা, সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে হিংসার লাগামছাড়া বহিঃপ্রকাশ— এসব ঘটনা আড্ডার ঐতিহ্যে চরম প্রতিকূল প্রভাব রাখতে শুরু করল। ফলত, সব আড্ডাই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, কোথাও বা শুনশান রূপ নিতে শুরু করল।

ঠিক এই সময় থেকেই, গ্রামবাংলার মাটি থেকে যেন হারিয়ে যেতে শুরু করল সেই চিরায়ত পল্লিগাথা,'আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা।'

এর সঙ্গে এক সময়ের নিতান্ত ছোটখাটো গ্রাম্য দলাদলির ওপরে জাঁকিয়ে বসল বিভিন্ন সমকালীন রাজনীতির দাপট। রাজনীতি পালটা রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে সরলপ্রাণ, স্বভাবশান্ত গ্রামীণ আড্ডার সুর, তাল, মৌতাত সবই যেন সঙ্কুচিত হতে হতে শামুকের খোলের ভিতরে আশ্রয় নিতে চাইল। গ্রামের মাটিতে আবির্ভাব ঘটলো আর এক অনুষঙ্গের। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চিৎপুরের থিয়েট্রিকাল যাত্রাদলের পেশাদারি প্রদর্শন, মাইকে হিন্দি, বাংলা গান, এক কথায় সস্তা মনোরঞ্জনী শহুরে বিনোদন ক্রমশই গ্রামের মানুষকে আকর্ষণ করতে লাগল। এ সবেরই সম্মিলিত ফলে গ্রামীণ আড্ডার চিরকালীন মেজাজ ও স্ফূর্তিতে দেখা দিল অনিবার্য ভাটার টান।

কলকাতা তথা নাগরিক আড্ডার চালচিত্রে ততদিনে আর একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের ইঙ্গিতও ফুটে উঠেছিল। ষাট দশকের মধ্যপর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে নানা রঙের রাজনীতির চর্চায়, দলমত নির্বিশেষে আদর্শবাদ ও মূল্যবোধের চর্চাটিও খানিকটা উঁচু তারেই বাঁধা ছিল— অন্তত বর্তমানের উদভ্রান্ত, উন্নাসিক অথচ ছিন্নমূল সামাজিক বাতাবরণের তুলনায়। তাই, রাজনৈতিক দল বা আদর্শ যা-ই হোক না কেন, নিজ নিজ রাজনীতির সফলতার অনুশীলনে সংগঠন, শৃঙ্খলা ইত্যকার বিষয়গুলি ছিল আবশ্যিক শর্ত। এ ধরনের শৃঙ্খলানিষ্ঠ দায়বদ্ধতা আড্ডার অনেক মানুষকেই স্থানান্তরিত করে তুলে নিয়ে গেল নিজ নিজ সংগঠনের অন্দরমহলে। আর, কে না জানে, সংগঠনসুলভ নিয়মতন্ত্রিকতার সঙ্গে আড্ডার মানসিকতার সম্পর্ক তো প্রায় বিপরীত মেরুতে। আড্ডা নিয়ম জানে না, কেন্দ্রিকতা মানে না, আড্ডা জানে শুধু অবাধ, শর্তহীন গণতন্ত্র।

এর পরের দিনগুলিতে, অর্থাৎ মধ্য-সত্তর বা আশির দশকের গোড়া থেকে পরবর্তী দু'দশকের বেশি সময় ধরে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনিবার্যতায়, বা 'যুগের হাওয়া'র দাপটে আড্ডা যেন ক্রমশই এক অবান্তর, অবাঞ্ছিত বিষয়রূপে গণ্য হতে হতে তার প্রাসঙ্গিকতাই হারাতে শুরু করল। এই সময়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতও বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি, ধনতন্ত্রের অবাধ পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান শরিকের ভূমিকা নিয়ে খোলা মাঠে নেমে পড়ল। এবং এ ধরনের সামাজিক অর্থনীতিবাদের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য হল— মুনাফা বাড়াও; আমজনতার কাছে এর অর্থ হয়ে দাঁড়াল, 'টাইম ইজ মানি'। অবসর, আড্ডা— এসবই অবান্তর, অর্থহীন! দৌড়, দৌড়, টাকার পিছনে অষ্টপ্রহর, চব্বিশ ঘণ্টা দৌড়নোই হল

আধুনিক মানবজীবনের সারসত্য; এমনকী যে কোনও আদর্শ বা মূল্যবোধ— এসবই পুরোনো দিনের বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট। কেননা মাও-উত্তর নয়াচিনের শীর্ষ নেতৃত্বও প্রায় তিন দশক আগেই দৃপ্ত, গর্বিত ঘোষণা করে দিয়েছে,'...টু বি রিচ ইজ গ্লোরিয়াস।' এহেন যুগের 'হাওয়ার দাপটে' আমাদের চিরপরিচিত আড্ডারও পিছু হটতে হটতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে— এটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য আর্থ-সামাজিক পটভূমির এহেন চরিত্র বদলের পাশাপাশি বিগত কয়েকটি দশকে সংঘটিত প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সুবাদেও বেশিরভাগ মানুষের জীবনে তার বিনোদন তথা অবসর যাপনের চিত্রবিন্যাসটাই বদলে গিয়েছে। বিশেষ করে, প্রথমে টেলিভিশন, তারপরে ইন্টারনেট ও মোবাইল যূথবদ্ধভাবে আড্ডার ভুবনের ডানা ছেঁটে নিয়ে এসেছে ঘরবন্দি, মূলত দ্বিপাক্ষিক 'একান্ত ব্যক্তিগত',কখনও বা পরস্মৈপদী সংযোগচারিতার বৃত্তে। ফলে, পরস্পরের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যগতভাবে আড্ডার মধ্যে মানবীয় সম্পর্কের যে অদৃশ্য সুতোর বন্ধনটি ছিল, তাও যেন আধুনিক সময়পর্বে অতি দ্রুত তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে লাগল। শুধু আড্ডা কেন, আধুনিক জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই 'সম্পর্ক' বা রিলেশনও ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। সম্পর্ক যদি রাখতেই হয় তবে তা হবে সর্বতোভাবে কাজের সম্পর্ক, সংক্ষেপে 'গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি' অথবা 'র‍্যাপো' বা অ্যাপো'র চৌহদ্দিতেই সেই সম্পর্ককে আটকে রাখতে হবে, তার বাইরে নৈব নৈব চ। সেই সঙ্গে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বহুবর্ণ পাবলিসিটির ওপর ভর করে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে হবে অবিরাম আত্মপ্রচারের তরঙ্গমালার ওপরে, যেখানে মুহুর্মুহু সরবে ঘোষিত হবে'আমাকে দেখুন, শুধু আমাকেই দেখুন', যা বলা বাহুল্য আড্ডার ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমরা জানি, আড্ডায় যেমন নিজের গলাবাজির সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, তেমনই অপরের গলাবাজি শোনার বাধ্যবাধকতা থাকে।

এইভাবে, কুড়ি ও একুশ শতকের সন্ধিলগ্নে আড্ডা যেন এক বিকলাঙ্গ অথচ প্রক্ষিপ্ত আধুনিক সামাজিকতায় রূপ নিয়েছে।

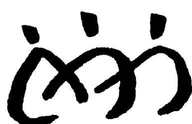
তিন

তা হলে কি বাঙালির আড্ডা তথা আড্ডার ঐতিহ্যের অবলোপ ঘটেই গেল শেষমেশ? অবশ্যই তা নয়। আপ্ত-পর্যবেক্ষণে বহুকাল আগেই যে আড্ডা বাঙালির

জাতিবৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত হয়েছে, কোনও দিনই তার চিরতরে অবলুপ্তি ঘটতে পারে না। এ কথা ঠিক, গতি— আরও গতি আধুনিক জীবনের মূল মন্ত্র।

আসলে এই আত্মপ্রবঞ্চনার মোহজাল যত দিন সক্রিয় ও বিস্তৃত থাকবে, তত দিন আড্ডা'ও হয়তো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফল্গুর মতো নীরব ও গোপন প্রবাহিনী হয়ে থাকবে। তাই, আগামী দিনে মানুষ যখন নিজেকে নিজের কাছে, নিজের মতো করে প্রকৃতই খুঁজে পাবে, তখন আপন-পরের মিলনসন্ধানী আকুল হৃদয় আবার আড্ডাকেই আঁকড়ে ধরবে। সঙ্গত কারণেই আমরা আশা রাখতে পারি, হারিয়ে যাওয়া আড্ডার দিনগুলি, অন্তত বহুলাংশেই আবার ফিরে আসবেই আসবে।

তথ্যসূত্র:
আড্ডা: গোপাল হালদার
নববাবুচরিত: বিনয় ঘোষ
চণ্ডীমণ্ডপ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



গ্রামীণ মহিলাদের আড্ডা

তুলিকা মজুমদার

আড্ডা বলতে নাগরিক মানুষের যে ধারণা হয়েছে সেই অর্থে গ্রামীণ মেয়েদের জীবনে আড্ডা বিষয়টি কোনও কালেই স্থান পায়নি। দীর্ঘ পয়ঁত্রিশ বছর ধরে একটি গবেষণার কাজে আমাকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা থেকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বাঘমুণ্ডি পর্যন্ত ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই একথা বলতে পারছি।

তবু অন্যভাবে গ্রামীণ মেয়েদেরও আড্ডা আছে। তবে প্রথাগত আড্ডা অর্থে নয়। নারীরাও সমাজে বাস করে,তাদেরও সংস্কৃতি অতি উন্নত। মিলেমিশে থাকবার প্রবণতা পুরুষের চেয়ে বেশি, বাইরে বা দূরে যাওয়ার তেমন সুযোগ না থাকাতে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়, হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে মনকে আনন্দময় রাখতে জানে নারী— এই আড্ডা-মানসিকতা অন্য ধরনের, অন্য মাত্রার।

যে সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছি, তার সবই গ্রামীণ মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ও দিনরাত যাপনের সুবাদে।

যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘোরেননি, যাঁরা গ্রামের পরিবারগুলির সঙ্গে মনের আদান-প্রদান করেননি, তাঁরা গ্রামীণ সমাজ বিষয়ে কিছু কিছু রোমান্টিক ধারণার শিকার হন। বিশ শতকের শেষেও আমাদের গ্রামজীবন, বিশেষ করে নারীদের যে কয়জনকে পারিবারিক-সামাজিক অবস্থানে দেখেছি, তাতে যন্ত্রণা পেয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। আবার এই কুড়ি বছরে পরিবর্তনের সামান্য ছোঁয়াও দেখেছি। এসব দেখেছি নারীদের 'প্রথাবহির্ভূত' আড্ডায়।

গত শতকের সাতের দশকের শেষ বছর গিয়েছি বাঁশপাহাড়ি। বাঁকুড়া স্টেশন থেকে বাসে ঝিলিমিলি পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে নেমে মাইল দুয়েক হেঁটে সেই গ্রাম। তার পর বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মেয়েদের 'আড্ডা'র শরিক হয়েছি। প্রাণ খুলে মিশেছি, জেনেছি তাঁদের যন্ত্রণা ও অনন্য আতিথেয়তার সোনালি উষ্ণতা।

মধ্যযুগের একটি বাক্যকে ঘিরে আমাদের আবেগের শেষ নেই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। দেবীর কাছে দরিদ্র গ্রামবাসীর আকুল প্রার্থনা। কৃষক জমিতে ফসল ফলান, গোয়ালে হাল-বলদ ও গাভী থাকে। তা হলে চাল রয়েছে, দুধও রয়েছে। দুধ-ভাত খাওয়ার কোনও অভাব নেই। তা হলে এই প্রার্থনা কেন? এই দুই বস্তু গ্রামের মানুষের কাছে দুর্লভ, স্বপ্ন, তাই সামান্য স্বপ্নপূরণের জন্য করুণ আকুতি। শুনতে পাই সেই কালে নাকি প্রতি গৃহস্থের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ ছিল। তাই যদি সত্যি হবে, তবে, দুধ-ভাতের জন্য এই আবেদন কেন?

এ তো অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের চিত্র। আর উনিশ শতকের শেষে বাংলার কৃষকের কেমন অবস্থান ছিল? বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' বইতে লিখছেন,'হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলায় উহারা ভাঙ্গাঁ পাতরে রাঙ্গাঁ রাঙ্গাঁ বড় বড় ভাত নুন লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, নাহয় ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না।'

কত শতাংশ গ্রামবাসীর এই দুর্দশা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তা জানাননি। তবে অধিকাংশেরই ছিল এই অবস্থা। আজ সেই সংখ্যা অবশ্যই কমেছে। কিন্তু এখনও সরকারি হিসেবে পঁয়ত্রিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। এই সীমার সংজ্ঞা সকলেই জানেন। আর সরকারি পরিসংখ্যান? মিথ্যে আর তঞ্চকতার ফুলঝুরি। এই গ্রামকেই আমি দেখেছি, আর সর্ব অর্থে 'দরিদ্র' গ্রামীণ নারী কীভাবে এই সব পরিবেশে 'আড্ডা' দিতে পারেন তা অনুভব করা কঠিন নয়। তবু তাঁরা 'আড্ডা'য় বসেন, আলোচনার বিষয়ও থাকে।

দিনযাপনের গ্লানি কেমন? গ্রামীণ নারী সমান তালে পুরুষের সঙ্গে পরিশ্রম করেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেন, অনেক বেশি ঝক্কি সামলান ঘরে-বাইরে। গ্রামীণ গরিব মেয়েদের পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা অধিক সন্তানের জননী। সন্তানকে তিন-চার বছর পর্যন্ত বড় করার সময়কালের পরিশ্রম কতটা তা আমরা জানি। আবার বর্ষাকালে ধানের বীজতলা তৈরি, কাদাজলে ধানের চারা পোঁতা, ধান পেকে গেলে কাটা— এসব কাজও তাদের করতে হয়। ধনী গৃহস্থের ঘরণীর সংখ্যা তো গাঁয়ে কম।

এই যখন দিনযাপনের পঞ্জিকা, তখন আড্ডার অবকাশ কোথায়? তবু তাঁরা আড্ডা দেন, অন্য নারীর সঙ্গে ভাব ও মনের আদান-প্রদান হয়। সেই অনাবিল মুহূর্তে তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি।

আড্ডা হয় উৎসবের অঙ্গনে। লৌকিক দেবতার কাছে সাপ্তাহিক-মাসিক-বাৎসরিক বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানে। দুপুরে পুকুরে স্নান করবার সময়। ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। কোনও পরিবারে ছেলে-মেয়ের বিয়ের দিন। সাধ-ভক্ষণের দিন। গাঁয়ের কেউ প্রয়াত হলে সেই বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানানোর সময়। কোনও মায়ের সন্তান প্রসবের দিনে। নতুন জন্মানো সন্তানের ষষ্ঠী কিংবা একুশের দিনে। গাঁয়ের কোনও মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে পাকাদেখার সময়। অর্থাৎ আমাদের মতো শুধুমাত্র সময় কাটানোর যে কোনও অবসর সময়ের আড্ডা তাঁদের জীবনে নেই। আর আড্ডার বিষয়? না, সেখানে কাব্য-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-যাত্রা-রাজনীতি-দলীয় রাজনীতি-সংকীর্ণ কুৎসা-ঈর্ষাকাতরতা, এসব বিষয় থাকে না। আড্ডার বিষয়ে থাকে দারিদ্র-স্বামীর অবহেলা,-শারীরিক অসুবিধা, শাশুড়ি-ননদের জুলুম, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা, একটু ভালভাবে থাকবার কামনা, ছেলেমেয়ের অসুখ, লৌকিক দেবদেবীর কাছে মানত, ছেলের বিয়েতে একটা ভালো বউমা

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, খরা বন্যায় ফসলহানির আতঙ্ক— সামনের পরবের প্রস্তুতি— এইসব প্রাত্যহিকতা আড্ডার বিষয়।

আবার একই সঙ্গে গ্রামীণ উৎসবের দিনগুলির আড্ডায় এইসব 'তুচ্ছ' বিষয় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তখন সব দীনতা-হীনতা-যন্ত্রণা-প্রতিকূলতা-ব্যক্তিগত অভাব- অভিযোগ সব ভুলে এক উদার উচ্ছল প্রাণময়তায় ভরা আড্ডার পরিবেশ। প্রতিদিনের সাংসারিক-পারিবারিক সব তুচ্ছতা ভুলে এক আনন্দ-সঙ্গমে উত্তীর্ণ হওয়া।

দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে টুসুব্রত উদযাপন অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় 'চাঁউড়ি' থেকেই টুসু সঙ্গীত গাওয়া শুরু হয়। চলে সারা পৌষ মাস ব্যাপী। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুসু গান গায়। সে এক আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ত মেয়েলি গানের আমেজ। সব পরিবারে টুসুব্রত পালনের আয়োজন। এ আসে ওর বাড়িতে, ও যায় তার বাড়িতে। গান চলে, সেই সঙ্গে চলে আড্ডা। সামর্থ্য অনুযায়ী খাবারের আয়োজন। এই অমল দিনগুলিতে সব সংকীর্ণতা আর গ্লানি ভুলে পরম তৃপ্তিতে চলে আড্ডা।

ভাদুপরব। ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি পর্যন্ত পুরো মাস জুড়ে ভাদুব্রতের উদযাপন। এই পরবেও মেয়েদের আড্ডার মেজাজ থাকে সক্রিয়। বিশেষ করে সংক্রান্তির রাতে 'জাগরণ দিনে' নিশি জাগরণে মেয়েদের আড্ডা সত্যিই তুলনারহিত। এখানেও নেই কোনও দীনতার চিহ্ন।

এমনিভাবে চড়ক উৎসবে, বাহা-সোহরাই-করম পরবে, তিস্তামাঈয়ের উৎসবে কিংবা পরিবারের কোনও কোনও আনন্দ-অনুষ্ঠানে আড্ডার মেজাজে থাকেন নারীরা।

পৌষসংক্রান্তির দিন বিকেলবেলা পুরুলিয়ার কুমারী বাঁধে টুসুধনকে বিসর্জন দিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে মেয়েরা। সবার মন খারাপ। এক মাসের আনন্দের অবসান। গানের জোয়ারে, ব্রতের নিয়ম পালনের মধ্যেও একমাস ধরে যে সুন্দর অনুভূতি সব কিছু ভুলিয়ে রেখেছিল তা আজকেই শেষ হল।

সন্ধ্যাবেলা প্রবল শীতের মধ্যেও মেয়েরা দাওয়ায় বসে টুসুব্রতের স্মৃতিচারণ করছেন। কিন্তু কাল থেকেই তো আবার প্রাত্যহিকতার যন্ত্রণা, বাস্তব সংসারের মুখোমুখি হওয়া। গল্পগুজব চলছে, হাসি-আনন্দ-টুসুর জন্য বেদনাও।

সেই আড্ডায় এক করুণ অভিজ্ঞতা হল। একজন পড়শি বললেন,"অতসী, তোর মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে?"

অতসী বললেন,"হ্যাঁ দিদি, পাকাদেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু...কিন্তু..." বলেই গান গাইলেন অতসী,"বিটি বিকা হল দায়/ ছেলে সাইকেল ঘড়ি আংটি চায়/ ও যে কী করে এসব কিনবে/ ধান বেচতে হবে, অনেক ধান/ ক'মাস পরে তো টান পড়বে সংসারে।"

চুপ করে গেলেন অতসী। বড় মর্মান্তিক এই গ্রামীণ আড্ডার ধরনধারণ, নাগরিক চিন্তার সঙ্গে মেলে না।

আড্ডার পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই পারিবারিক শান্তি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। পরিবারে যে অশান্তি হয় না তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া সেগুলি সাময়িক। আবার সহজ হয়ে আসে সম্পর্ক।

কিন্তু পারিবারিক পরিবেশে প্রতিদিন যদি অশান্তি বহমান থাকে, তা হলে মন খারাপ থাকে। উচ্ছল মন হারিয়ে যায়। আবার মেয়েরা যেহেতু বেশি আবেগপ্রবণ, তাই অশান্তি তাঁদের আরও মর্মাহত করে।

আমরা শুনতে পাই, সামন্তশাসন শেষ হয়ে আমাদের দেশে স্বাধীনতার কিছুকাল পর থেকে পুঁজিবাদী সমাজের পত্তন হয়েছে। অর্থনীতিতে হয়তো এই সব তত্ত্ব সঠিক কিন্তু গ্রামীণ নারীর পারিবারিক জীবনে পুরুষের দাপট আর সামন্তসমাজের মানসিকতার প্রভাব যে কত সর্বব্যাপী তা অভিজ্ঞ মানুষই জানেন।

পুরুষ বাইরের কাজ করেন। নারীও বর্ষা ও শীতে বাইরের মাঠে কাজ করেন। আবার রান্নাঘর, ছেলেপুলে সামলানো, ঘর নিকানো, ঝাঁট দেওয়া, গোবর দিয়ে উঠোন লেপা এ সব কাজও করতে হয়। সবাইকে পরিবেশন করা, এঁটোর জায়গা পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মেলে দেওয়া, তুলে রাখা— এসব তো আছেই। কিন্তু পুরুষ ভাবে তার কতই না কাজ, 'মেয়েছেলেদের' ও সব আবার কাজ নাকি ! এ পর্যন্ত না হয় মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বাপ রে, পুরুষের দাপট! পান থেকে চুন খসা তো কথার কথা, খালি খুঁত ধরা। পুরুষের যেন ভুল হয় না। রান্নায় নুন কম হলে বকাবকি, খেতে দিতে দেরি হলে মুখঝামটা, শিশু একঘেয়ে কাঁদছে বলে বিরক্তি, সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলেই কটু কথা,— আর সবেতেই বউয়ের খুঁত ধরা। ঝগড়া যেন পুরুষেরই অধিকার। পড়শির সঙ্গে গল্প করলে কথা শুনতে হয়— গুলতানি মারা হচ্ছে। বিয়ের পরে হয়তো কয়েক দিন নতুন নতুন প্রেম থাকে, তারপর থেকে এই সব জ্বলুনিধরা অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াতে হয়। স্বামী বলে কথা, কিছু তো করার নেই! এই যখন পারিবারিক

সামন্ত মানসিকতার অবস্থান, তখন উৎসবের দিনগুলি ছাড়া জীবনে আড্ডার স্থান কোথায়?

কিন্তু মেয়েরা অন্য ধাতে গড়া। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী এইসব অত্যাচার-জুলুম-তাচ্ছিল্য-অপমান-কটূক্তি-দৈহিক নির্যাতন-না-মেটা শখ— সব কিছুকে সহ্য করতে নারী অন্য ভুবনের স্বপ্ন দেখে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মনকে সজীব রাখতে আড্ডা দেয়। এ যে কতবড় মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় তা নারী বোঝে, পুরুষের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। তাই যুগ যুগ ধরে পারিবারিক জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও নারী অনন্যা, অজেয়া। হোক না সে নারী দারিদ্র-লাঞ্ছিত পরিবারের একজন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান নারীসমাজে সেই স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী আড্ডা দেখেছি। পিতৃদেব ছিলেন বহরমপুর আদালতের ফৌজদারি আইনজীবী। এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামধর্মের। বনেদি পরিবার-ধনী পরিবার অনেক থাকলেও অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র। আর ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েন দরিদ্ররাই। বাবারও অনেক মক্কেল ছিলেন গাঁয়ের দরিদ্র পরিবার। এই জেলার মেয়ে হয়ে পারিবারিক আমন্ত্রণে মুসলমান বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছি কিশোরীবয়স থেকে। হিন্দু ও মুসলমান বিয়ের মতো এমন আন্তরিক উচ্ছল অনুষ্ঠান পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে। বহুবার দেখেছি মুসলমান বিয়ের অনুষ্ঠান। মুসলমান রীতিতে হিন্দুরীতির মতোই কিছু শাস্ত্রীয় বিধান পালন করা হয়। কন্যার এজেন আনা, দেনমোহর, কবিলনামা, বিয়ে পড়ানো প্রভৃতি প্রথাগত ইসলামি শাস্ত্রাচার সম্পর্কিত বিষয়। আর নব্বই শতাংশ স্ত্রীআচারকেন্দ্রিক ও শাস্ত্রাচারের বিপরীতে একান্তই লৌকিক উৎসব। হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুরীতির প্রভাবও সুস্পষ্ট।

বিয়ের সময় শাস্ত্রাচার পালনের সময় মুসলমান মেয়েরা চুপচাপ থাকে। সেসব হয়ে গেলে যখন তাঁদের হাতে লোকাচারের দায়িত্ব পড়ে তখন থেকেই শুরু নির্ভেজাল মেয়েলি আড্ডা।

মুসলমান বিয়েতে হলুদের ডালা, দধিমঙ্গল, সোহাগ মাগা বা বাটার মাগন, দুধের দাবি বা বত্রিকানালের দাবি, বউ মুছিয়া লওয়া বা বধূবরণ প্রভৃতি লোকাচারে মেয়েদের একাধিপত্য ও কনেকে ঘিরে আড্ডা। এসব সময়ে মেয়েরা আর পুরুষকে পাত্তা দেয় না।

তখন তো কিশোরী নই, কলেজের শেষ ধাপে পড়ছি। বড় হয়েছি। সেই বয়সে 'কাপের' সময় মেয়েদের যে আড্ডা দেখেছি তাতে বিস্মিত হয়েছি। 'কাপ'-এর গান যখন গাওয়া হয়, তখন সেখানে কোনও পুরুষ উপস্থিত থাকতে পারবে না। এ শুধুই মেয়েলি বিষয়, মেয়েলি আড্ডা। এ এক অনাবিল নির্ভেজাল মেয়েলি আড্ডা। অনেক অনেক কথা থাকে, অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, আড্ডার মেজাজ থাকে পুরোপুরি,— আর সঙ্গে বাড়তি থাকে গান, সে গানও যেন আড্ডার অঙ্গীভূত প্রাসঙ্গিক বিষয়।

'কাপের' আড্ডা কেমন? পারিবারিক-ব্যক্তিগত-সামাজিক বিভিন্ন ভণ্ডামিকে উদ্‌ঘাটন করাই এই আড্ডার উদ্দেশ্য। নারীসমাজ যেসব কপটতা দেখে, কিন্তু সহ্য করতে পারে না, সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে এসবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারে না, পারা সম্ভব নয়,— তখন শুধুমাত্র মেয়েদের উপস্থিতিতে সে সব কথা বলা চলে। আর সেই কাপের আড্ডায় সব মেয়েরই তো অভিমান একই ধরনের। মনের যখন এত মিল, তখন আড্ডা তো জমবেই। গ্রামীণ সামন্তসমাজে নারীসমাজ পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় পক্ষপাতমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব আড্ডায় এভাবেই সোচ্চার হয়। এই সমাজে নারী পরিণত হয়েছে দাসীতে। কিন্তু সামাজিক-ধর্মীয় শৃঙ্খল নারীকে দাসীতে রূপান্তরিত করলেও নারীর মনকে তো আর খাঁচায় বন্দি করা যায় ন। তাই মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ-যন্ত্রণা তারা উগরে দেন এই আড্ডায়।

একটি কাপের উল্লেখ করছি। এর মধ্যে নারী-হৃদয়ের অবদমিত না-মেটা ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজে নারী যে অবস্থানে থাকে তাতে কাপের এই ইচ্ছাগুলি কোনওভাবেই বাস্তবরূপ পেতে পারে না। কিন্তু অবদমন কোন পর্যায়ে পৌঁছলে নারী এমন সব উক্তি করতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। হয়তো যৌন-অতৃপ্তির ক্ষোভও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সেই কাপে আড্ডাচ্ছলে হালকা মেজাজে বলা হয়েছে,—আবদুল্লার বাবা অর্থাৎ আমার স্বামী মারা গিয়েছে, ভালই হয়েছে। কেন? এত দিন যেসব শখ আমি পূরণ করতে পারিনি; এবার তার পূরণ হবে। আমি কুঁচকে শাড়ি পরব, পাতা কেটে চুল বাঁধব, সোনাবাঁধা চুড়ি পরব, চপ্পল পায়ে দিয়ে সিনেমায় যাব, সোনার নথ পরব, পরপুরুষের পিরিতিতে বাধা থাকবে না, পরপুরুষের বিছানায় শুতে পারব— না, এ সব কিছুই বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু আড্ডার মেজাজে থাকলে সব মানসিক উচ্ছলতাই প্রকাশ করা যায়। এমন আড্ডা সত্যিই দুর্লভ।

মধ্যযুগের কবি মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নারীরা পুরুষবর্জিত আড্ডায় পতিনিন্দার যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন তার আর এক রূপ কি বর্তমান গ্রামীণ সমাজের মেয়েলি আড্ডায় প্রকাশিত হচ্ছে না? যে নারীসমাজকে আমরা সর্ববিধ বিষয়ে বঞ্চিত করে এক নিদারুণ বঞ্চনা ও যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখেছি দীর্ঘ সময় ধরে, তাদের সীমাবদ্ধ আড্ডায় যদি এ সব 'সংকীর্ণ' বিষয় প্রকাশিত হয়, তাতে খুব কি বিস্মিত হওয়ার কারণ থাকে? 'ইচ্ছাপূরণের তাগিদ' তো মনে মনে থাকেই— সকলেরই।

আড্ডা হল অবকাশের বিনোদন। কর্মময় দিনযাপনের ফাঁকে যে সময়টুকু পাওয়া যায়, সমচিন্তার বন্ধুবান্ধব সঙ্গী হলে আড্ডায় মগ্ন হওয়া যায়। কত বিচিত্র বিষয়ই না সেখানে আলোচিত হয়। আমাদের দেশের গ্রামীণ দরিদ্র বহুসন্তানবতী সূর্যাস্ত পর্যন্ত গৃহকর্মে সদাব্যস্ত শীর্ণদেহী আজীবন শখ-না-মেটা কূলবধূর সামন্তনির্যাতিত জীবনে আমরা আড্ডার পরিবেশ সৃষ্টি করতে দিইনি। সেই আনন্দময় জীবনের কোনও সুযোগই তাদের নাগালের মধ্যে নেই। তবু, যেহেতু তাঁরা অজেয়া নারী, হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রাণময়তা সৃষ্টিতে সক্ষম, বুক ফাটলেও মুখের হাসি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে কেউ কেড়ে নেবে, এ তারা হতে দেয়নি। এই দর্শন বোধহয় দৃঢ়তর হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে নারীত্বের সাধনায়। নারী কখনও ভুলে যায়নি সে মা-বোন, দিদি, সন্ততি, মাসিমা, পিসিমা, কাকিমা, জেঠিমা, বউমা স্ত্রী এবং সর্বোপরি নারী। আর তাই আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় গ্রামীণ নারীর জীবনে যেমন 'আড্ডাকে' দেখিনি, আবার অন্য অর্থে সেই সব নারীকে অনুকূল পরিবেশে আড্ডা দিতেও দেখেছি। এ এক অনন্য বৈপরীত্য, আর এই বিপরীতমুখী পারিবারিক অবস্থানে একমাত্র নারীরাই পেরেছে সামান্য অবসরকে অসামান্য জীবনরসে সঞ্জীবিত করতে। একেও আড্ডা বলতে পারি। তবে নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে তার মিল নেই। সব কিছু কি সরলরেখায় বিশ্লেষণ করা যায়!

এখানেই যদি গ্রামীণ মেয়েদের আড্ডা বিষয়ে আলোচনার ইতি টানতে পারতাম তবে বড় ভালো হত। কিন্তু পুরনো অভিজ্ঞতায় আড্ডার যে চিত্র তুলে ধরেছি সেসব আজ অতীত। সামাজিক ইতিহাসের নথি হিসেবেই তার কিছু গুরুত্ব রয়েছে।

বছর পনেরো আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন সবসময় অভিপ্রেত। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হবে, শিক্ষার সুযোগ ঘটবে, স্বাস্থ্যপরিষেবা সহজতর হবে, পরিবারকল্যাণ বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসবে, চিন্তার মুক্তি ঘটবে, পারিবারিক

পরাধীনতা শিথিল হবে,— এ সবই আমাদের সকলের কাম্য। অবশ্য এ সব পরিবর্তন এসেছে অনেক গ্রামীণ এলাকায়, যদিও তা খুবই অপ্রতুল। তবু বহু গ্রামে আজ অন্য রকম পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এ সব দেখে ভালো লাগে। এসব গ্রামে নারীরা অনেক সপ্রতিভ হয়েছে। প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গত কয়েক বছরে ঘুরে দেখেছি, সেসব গাঁয়ের অবস্থা আগের মতো একই রকম রয়েছে। কোনও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন নেই। তাই সেখানকার মেয়েদে র সঙ্গে আলাপচারিতায় অনুভব করেছি তাদের সামাজিক আড্ডা প্রথম অংশে বর্ণিত অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। পরবের সময়েই যা একটু অন্য চেহারা নেয়, যেমন আগেও ছিল।

কিন্তু মহকুমা গঞ্জ কিংবা মফস্বলের কাছাকাছি যেসব গ্রাম রয়েছে সেখানকার পরিবর্তন চোখে পড়বার মতো। এসব এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, যদিও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুব কম সময়েই বিদ্যুৎ থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, যদি গ্রামের পাশ দিয়ে হাইওয়ে যায় তাহলে তার দু'পাশে দোকান, ধাবা। দূরদর্শন সহজলভ্য— যাদের বাড়িতে নেই তারা দল বেঁধে সন্ধ্যাবেলা বিশেষ বাড়িতে যায়। মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ-ম্যাক্সি পরে—খেতেও এসব পরে কাজ করে, সংকোচ তেমন নেই। খেতমজুর বা প্রান্তিক চাষিদের অবস্থা খারাপ, কিন্তু যাদের ফসলের জমি আছে, তারা আগের চেয়ে অনেকে ভাল অবস্থায় রয়েছে। উর্বর জমি হলে বছরে তিনবার ফসল হচ্ছে, মাঝখানে নানা শাকসবজি লাগানো হয়। অর্থাৎ? খরা বন্যা না হলে আর্থিক দিক থেকে অনেক নিশ্চিন্ততা এসেছে পরিবারে। আর, এসবের পরিণতিতে মেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে, চিন্তায় বিবর্তন এসেছে,— আর একসঙ্গে গল্পগুজব করার সময়ে মনের ভাবও প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। আগের মতো গ্রামীণ সমাজের মেয়েদের একঘেয়ে কথাবার্তা এসব এলাকায় আর তেমন শোনা যায় না।

যে সব কুমারী মেয়ে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আলোকিত হয়েছে, তাদের আড্ডার কথা অন্যেরা তেমন জানতে পারে না। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষার সুবাদে তাদের সঙ্গে মেশার সুযোগে মায়ের বয়সিরা আমাকে সে সব কথা জানিয়েছেন। কিশোরীরা কি আর বেশিক্ষণ তাদের মনের ভাবনা চেপে রাখতে পারে? অনেক কুমারী মেয়েই আধা শহরে গিয়ে দু'একবার সিনেমা দেখেছে। কিন্তু আজকাল তো হলে গিয়ে সিনেমা দেখার রেওয়াজ অনেক কমে গিয়েছে।

কিন্তু সিনেমা দেখার অন্য পথ খুলে গিয়েছে। টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে সারা দিনরাতই সিনেমা দেখানো হয়। ব্যতিক্রম ছাড়া সে সব সিনেমা এক অন্য জগৎ, অন্য নরনারী, অন্য পরিবেশ, ধনগৌরবের কদর্যতা, অবাস্তব প্রেম, নারীনিগ্রহ এবং সন্ত্রাস দেখায়। বাংলা সিনেমাও তাই। কিশোরীমনে নায়িকার রূপ-প্রেম-রোমান্টিকতা-বৈভব-বিলাস আলোড়ন তোলে। তাদের আড্ডায় এসবই আলোচনার বিষয়।

তারা প্রথমত নারী, গ্রামীণ ছায়াস্নিগ্ধতা সরলতা রয়েছে, তাই প্রচারমাধ্যমের ব্যবসায়িক দিক তারা বুঝবে কেমন করে? কোন নায়কের সঙ্গে কোন নায়িকা এখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কে কাকে ছেড়ে গেল, নায়ক-নায়িকার বিয়েতে কত খরচ হল, নায়িকার বিয়েতে পূর্বতন প্রেমিকের কী প্রতিক্রিয়া— এসবই তাদের আড্ডার বিষয়বস্তু। তারা যেন এসব গুজব আর প্রচারে আরব্যরজনীর মানসিকতায় বাস করছে। দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সটাই তো অবাস্তব স্বপ্ন দেখার বয়স।

অপ্রাসঙ্গিক হবে কি না জানি না, একটা ঘটনার কথা বলি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে শুনেছি, গত তিরিশ-চল্লিশ দশকের কথা। পাবনা জেলার ঈশ্বরদি স্টেশনে তিনি তখন রেলের আধিকারিক। সমাজসেবাও করেন। সবাই মান্য করে। ঈশ্বরদি মূলত রেলওয়ে শহর। ছোট শহর, গায়ে গাঁয়ের গন্ধ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বড় কৃষকের ছেলে ঈশ্বরদি হাই স্কুলে পড়াশোনা করে পাবনা শহরের এডওয়ার্ড কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে রেলে চাকরি পায়। তার সঙ্গে প্রেম হয় ঈশ্বরদি স্কুলের পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের। মেয়েটি খুব সুন্দরী। বাড়িতে কিছু লেখাপড়া করেছে বাবার কাছে।

একদিন সেই সম্পন্ন কৃষক ছেলেকে ধরে এনেছেন শ্বশুরমশায়ের কাছে। তিনি বললেন, "বাবু, আমার পোলা প্রেম করছে, আপনি ধমক দেন তো, আয়ো জেবন বায়োস্কোপ না, দেন তো দারোগাবাবুর কাছে নালিশ করে।"

জীবনটা যে বায়োস্কোপ নয়, তা কি কিশোর-কিশোরীরা বুঝতে পারে! এতে দোষের কিছু নেই।

এই সব গ্রামের কিশোরীর মায়েদের সঙ্গে আন্তরিকঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সমবয়সি বলে মন খুলে সব জানিয়েছেন। যেরকম সামাজিক-পারিবারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার সঙ্গে তাদের মেয়েদের মানসিকতার কোনও সম্পর্ক নেই।

কিশোরীদের আড্ডার অভিজ্ঞতার কথা তাদের মায়েদের বলেছি। শুনতে পেলাম, মায়েরা সে সব জানেন। তাদের উদ্বেগও লক্ষ করেছি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মায়েদেরই বা কি করার আছে?

এইসব কিছুটা আলোকিত মায়েদের আড্ডার বিষয় সেই সনাতন ছেলে-মেয়েকে ঘিরে। অবশ্য পাল-পার্বণের আড্ডা অন্য রকম, সে কথা পরে বলছি।

পরিবার পরিকল্পনার কথা রাজ্যসরকার থেকে খুব প্রচার করা হয়। সাফল্যও দাবি করা হয়। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় এসব তথ্য যে কতটা হাস্যকর তা সন্তান সংখ্যার পরিসংখ্যান থেকেই আমরা জানতে পারি। লিখিত ভুয়ো পরিসংখ্যান হয়, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। হিন্দু-মুসলমান, সব মায়েদেরই অনেকগুলি সন্তান হয়,— হাম দো হামারা দো— একটা মিথ। আমি 'দো' দেখিনি। মায়েদের কাছে শুনেছি, পুরুষরা এসব বিষয়ে উদাসীন। মায়েদের আড্ডায় তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বললেও পুরুষের অনিচ্ছায় তা যে সম্ভবপর হচ্ছে না সেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়।

অধিক ছেলে-মেয়ের মা হওয়ার কারণেই সন্তানের লেখাপড়া বিষয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। এসবই আলোচনা হয় আড্ডায়। আরও উদ্বিগ্ন তাঁরা যাঁদের কন্যাসন্তান আছে। একুশ শতকের সমাজে এ যে কী মর্মান্তিক সত্য তা মায়েদের আড্ডায় প্রত্যক্ষ করেছি। মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, অনেক বাবা-মা ছেলেদের মতো করেই মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেন। তবু বিয়ের সময় বরপণ ছাড়া মেয়ের বিয়ে হয় না। কলকাতা শহর এলাকায় এই ব্যাধি আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে, বোধহয় চক্ষুলজ্জা। কিন্তু মফস্‌সল ও গ্রামীণ এলাকার এই ব্যাধি শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই যন্ত্রণা যদি পরিবারে থাকে, মায়েদের আড্ডায় সেসব কথা তো আসবেই। জীবনকে ঘিরেই তো আড্ডা বিবর্তিত হয়।

মফস্‌সল ও আধা গঞ্জ-লাগোয়া গ্রামগুলিতে কিছু মেয়ে আছে যারা অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে লেখাপড়া করে। মাধ্যমিক পাশ করে বাবার সামর্থ্য থাকলে দূরের শহরেও কলেজে পড়তে যায়। বাসে যাতায়াত করে। অনেকে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে কিংবা বি এড পড়ে। এদের সংখ্যা কম হলেও পনেরো-কুড়ি বছর আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নগরের পরিবেশে এইসব মেয়ে অনেককিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ছুটিতে নিজের পরিবেশে ফিরে গেলে সমবয়সিদের সঙ্গে মধুর আড্ডা জমে ওঠে। তাব একটি বিষয় রূপচর্চা। ইদানীং টি ভি চ্যানেল এবং পত্রপত্রিকায় বহুল আলোচিত হওয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। আর, কে-ই বা নিজেকে সুন্দর করতে না চায়। এতো নারীর আবহমানকালের কামনা। সংস্কৃত সাহিত্যে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে তার পুরনো ঐতিহ্য রয়েছে।

যদি একটু সমৃদ্ধ গ্রামে ঘোরা যায়, দেখা যাবে মুদির দোকানে শ্যাম্পু, লিপস্টিক, অন্য প্রসাধনী পাওয়া যায়। যদিও বেশ সস্তার জিনিস। আড্ডাতে আলোচনা হয় বলেই মেয়েরা এ বিষয়ে সচেতন হয়। গ্রামের আড্ডায় পারস্পরিক আলোচনা শুনেছি রূপচর্চা বিষয়ে, তাই একথা বলতে পারছি।

বছর সাতেক আগে অনেকে মিলে গিয়েছিলাম চিলকিগড়ে। ঝাড়গ্রামের কিছুটা দূরে এই গ্রাম। গ্রাম না বলে গঞ্জ বলাই ভাল। চিলকিগড়ের রাজাদের একসময় খ্যাতি ছিল। এখনও রয়েছে বিশাল প্রাসাদ এবং জঙ্গলে আবৃত ডুলুং নদীর তীরে কনকদুর্গা মন্দির। পনেরো-ষোলোজন মিলে ছিলাম রাজার প্রাসাদে রাজকুমার জয়ের অতিথি হয়ে।

দিনটা মনে নেই, সেদিন চিলকিগড়ে বড় রাস্তার ধারে হাট বসে। আমরা গেলাম সন্ধেবেলা। হাটের যেমন চেহারা হয়, এ হাটও তাই। এসব হাট তো মেলা, মিলবার জায়গা। শুধু বাণিজ্য নয়, নানান কথাবার্তা মেলামেশা ও আনন্দে সবাই ঘুরছে হাটে। মাঝখানে তেলেভাজা-চা খাওয়া হল। এক জায়গায় দেখি, একজন প্রৌঢ় বেশ বড় একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিক শিট বিছিয়ে তার সওদা নিয়ে বসেছেন। কাচের-প্লাস্টিকের চুড়ি, সোনার রঙের অল্প দামের গয়না,— আর নানা প্রসাধনদ্রব্য। নেলপালিশ, পাউডার, লিপস্টিক, মুখে মাখার ক্রিম, শ্যাম্পুর পাউচ, সুগন্ধী তেল। বউরা সে দোকান ঘিরে জিনিস কিনছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। লজ্জা লজ্জা চোখে তাকিয়ে তারা হাসল। আমিও তো কম ছলনা জানি না, এ সব শিখেছি দীর্ঘ সময় ধরে। তাদের পাশে ঘাসের ওপর বসলাম। বললাম,— কেন, দিদির সামনে লজ্জার কী আছে?

এত সস্তায় যে প্রসাধন পাওয়া যায়, জানা ছিল না। সেগুলো চামড়ায় ব্যবহার করলে কি সর্বনাশ হতে পারে তাও আমি জানি। কিন্তু একদিনের দেখায় তাদের নিষেধ করবার মতো উজবুক আমি নই। চার-পাঁচজন বউকে রঙিন কাচের চুড়ি কিনে দিলাম। কিছুতেই নেবে না। বললাম,— "দিদি দিলে নিতে হয়।" আর আপত্তি করল না।

বললাম,— "চল, ওই গাছতলায় ফাঁকায় বসি, গল্প করি। জানতে পারলাম— এরা মাইলখানেক দূরে গাঁয়ে থাকে। জমিতে কাজ করে, উপার্জন করে। সবার সঙ্গে সবার খুব ভাব। আড্ডা শব্দটি বলেনি। বলল, আমরা খেতিতে কাজ করার সময় নানা গল্প করি। নিজেদের নানা কথা বলি। ঘর-সংসার, বরের মহুয়া খাওয়া; শরীরের অসুবিধে, সাজগোজ আর এক সপ্তাহ বাদ দিয়ে পরের

সপ্তাহে হাটে এসে কী কী কিনব— এসব কথা বলি। এও তো এক সুন্দর আড্ডা, মিলেমিশে মনের আদান-প্রদান ও সকলের সঙ্গে একমত হয়ে সুন্দরী হওয়ার জিনিসপত্র কেনা।

হতদরিদ্র সেইসব বউ, সামান্য চাওয়া, বাইরের জগতের মোহময়তা তাদের জানা নেই। অত্যন্ত সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবন। তবু সেদিন ভাল লেগেছিল, এদের মধ্যে অন্যরকম আড্ডা রয়েছে, হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যেও রসসিক্ত জীবনকে ধরে রেখেছে, সবাই মিলে একইভাবে চলবার মানসিকতা অর্জন করেছে। এখানেই তাঁদের জীবনধারণের জোর, এই জোর গ্রামীণ পুরুষের চেয়ে বেশি রয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের।

নিকট অতীতে এবং সাম্প্রতিককালে মেয়েদের যেসব গ্রামীণ আড্ডার অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, সেগুলি আড্ডার সংজ্ঞায় নির্ভেজাল আড্ডা নয়। আড্ডা তো আনন্দময় বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু গ্রামের মেয়েদের এসব আড্ডার মধ্যে প্রকাশিত হয় নানান প্রতিকূলতার কথা, সাংসারিক যন্ত্রণা, স্বামীদের অবুঝপনা, অনেকসময় স্বামীদের মহুয়া সিক্ত অবস্থায় নির্যাতন, প্রেমহীনতা, মেয়েলি রোগ, রুগ্‌ণ সন্তান, মেয়ের বিয়ের সমস্যা,— এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সমস্যা।

কিন্তু গ্রামীণ মেয়েদের নির্ভেজাল আনন্দময় প্রাণময়তা ও গীতিময়তায় ভরা আড্ডার অভিজ্ঞতা হয়েছে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি এলাকার গ্রামে। লেপচা-ভূটিয়া-দ্রুকপা-ঠিমাল-রাভা-মেচ নেপালি মেয়েদের আড্ডা এক অন্য ভুবনের সন্ধান দিয়েছে। এরাও গরিব, আর্থিক প্রতিকূলতা প্রবল, কিন্তু সারা দিনের কাজের শেষে পাহাড়ি গাঁয়ে সন্ধেবেলা আধো-আঁধার, আধো-আলোতে তারা যে আড্ডায় বসে তা অনন্য। আলো নিভে আসার পরেও চলে সেই আন্তরিক আড্ডা।

এইসব মেয়ে পরম ধর্মভীরু। এরা বৌদ্ধ এবং হিন্দু। কিন্তু শাস্ত্রীয় বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্মের আচার বিষয়ে এরা অজ্ঞ। এরা লৌকিক আচারকে কেন্দ্র করে যে বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্ম রয়েছে তারই আরাধনা করে। তাদের মনে রয়েছে পরম শান্তি। শত বিরুদ্ধ ঢেউ তাদের মুখের হাসি আর প্রাণের গান কেড়ে নিতে পারেনি।

কালিম্পং থেকে উত্তরে ডাঃ গ্রেহামস্ হোম স্কুলের পাশ দিয়ে অনেকটা গিয়ে একটি গ্রাম, যেখানে প্রায় সবাই তুঁতগাছে রেশমকীট চাষ করে। রাজাভাতখাওয়া থেকে বনভূমির মধ্য দিয়ে গিয়ে নদীর ধারে জয়ন্তী গ্রাম, তিস্তাবাজার থেকে পেশক যাওয়ার পথের পাশের গ্রাম, অর্থাৎ তিস্তা ও রোংনিয়া নদী যেখানে মিশেছে, সেই 'হোয়ার লাভার্স মিট' গ্রাম, লাভাবাজার থেকে বৌদ্ধমন্দিরে যাওয়ার বাঁদিকের

গ্রাম, লোলেগাঁওয়ের গ্রাম, বিশপের চারপাশে আট-দশটি গ্রাম,— যেখানে থাকেন নেপালি-লেপচা-ভুটিয়া গ্রামবাসী,— সে সব গ্রামে গিয়ে মেয়েদের অনাবিল আড্ডার সন্ধান পেয়েছি।

এ সব পাহাড়ি গাঁয়ে কিশোরী-বিবাহিতা-প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাদের আলাদা কোনও আড্ডা নেই। সকলের সম্মিলিত আড্ডা। মেয়েদের সে সব আড্ডায় দিনযাপনের গ্লানি নেই। সবাই দরিদ্র ঘরের মেয়ে-বউ-মা-শাশুড়ি,— কিন্তু সারা দিনের পরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যখন মিলিত হন তখন শুধুই আনন্দ আর গীতিময়তা।

প্রতিদিনের জীবনে অনেক প্রতিকূলতা আছে, পাহাড়ি নারীর অনেক সমস্যা। কী হবে সে সব গাওনা গেয়ে? সূর্য ওঠার পর থেকেই হাজারও কাজ, সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত অনেক কাজ, অবসর নেই। এই তো চলছে পাহাড়ি মানুষের জীবনে। সন্ধের পরে যখন সবাই একসঙ্গে হচ্ছি, কী হবে এ সব ধানাই-পানাই করে? তার চেয়ে মন কীভাবে ভাল থাকে, রাতের শেষে নতুন উদ্দীপনার জীবনকে নতুনভাবে যাতে দেখা যায় তা করাই তো উচিত। এই দর্শন হল মোঙ্গোলীয় পাহাড়ি জনজাতির।

গল্প করো গান গাও, সবাই মিলে নাচো— মন ভাল হয়ে যাবে। কষ্ট তো আছেই। থাকবেও। তাই বলে হাসবে না, গান করবে না? আমরা আমাদের মেয়েদের সমস্যার কথাও বলব, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আনন্দের কথাও বলব। জীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, কিন্তু তবু জীবন আনন্দের। একমাত্র এই সব পাহাড়ি মেয়ের আড্ডাতেই আমি এমন জীবনরসসিক্ত দর্শনের কথা শুনেছি। তারা এ সব কথা দার্শনিকের মতো বলেনি, বলেছে প্রাণময়তার সঙ্গে, সহজভাবে। বাংলার গ্রামীণ মেয়েরা খুব কম কথা বলে। পরিবার-সমাজ তাদের কথার কোনও মূল্য নেই। এখনও গ্রামীণ এলাকায় পুরুষই শেষ কথা বলে, নারীরা শুধু শোনে, মেনে চলে। 'দাপট' দেখাবার কোনও অবকাশ নেই। তাই অবদমিত হৃদয় একমাত্র প্রকাশ পায় শুধুই যেখানে মেয়েরা থাকে। তাই যেভাবেই হোক মেয়েলি আড্ডায় মেয়েদের মনের দুয়ার শত দিকে উন্মুক্ত হয়। বিশেষ কোনও বিষয় নয়, হাজারও বিষয় নিয়ে কথা হয়। সমাধানের পথ খোঁজা নয়, ভেতরের রুদ্ধ আবেগ প্রকাশিত হওয়াই বড় কথা। আজও বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের হৃদয়ের কথা শুনবার কেউ নেই, বলার সাহস নেই তো শুনবার লোক পাওয়া যাবে কোথায়? একমাত্র ঝরনাধারার পরশ রয়েছে সীমিত আড্ডার মধ্যে। সামাজিক হাজারো অনুশাসন থাকলেও মেয়েদের আড্ডা কিন্তু চিরজীবী হয়ে থাকবে, চিরায়ু হবে মনের দেওয়া-নেওয়া।



গান-ভুবনের আড্ডাপাখি

স্বপন সোম

'জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন গানগুলাকে পিয়ানোর যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির একএকটি অপূর্বমূর্ত্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে. এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।— এখানে জ্যোতিদাদা মানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অক্ষয়বাবু' অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী আর 'আমি' রবীন্দ্রনাথ।'

'জীবনস্মৃতি'তে পারিবারিক আবহে সংঙ্গীতচর্চার এই যে আন্তরিক ছবিটি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাকে এক অর্থে 'গানের আড্ডা' বলা যেতে পারে। এই আড্ডাতেই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি,' আড্ডা মানে

একটা শাসনহীন খোলামেলা পরিমণ্ডল, তার মধ্যে একটা সিরিয়াসনেসও থাকে। অবশ্য এই সিরিয়াসনেস নির্ভর করে আড্ডার কুশীলবদের ওপর।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদে প্রায়শই গানের আড্ডা কেমন জমে উঠত তার একটা বিবরণ পাই অবনীন্দ্রনাথের লেখনীতে,'...গান হত ও বাড়িতে, তেতলার ছাদে নতুন কাকিমার ঘরে। একদিকে জ্যোতিকাকামশায় পিয়ানো বাজাচ্ছেন, আর একদিকে রবিকা গাইছেন, সেই অল্পবয়সের রবিকার গলা, সে যেমন সুর তেমনি গান। মাত করে দিতেন চারদিক।'

এই ছবিটিই ফুটল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কলমে তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে: 'ছাদের ঘরে এল পিয়ানো।....এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা।.....বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাৎলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান।'

অনেক সময় দেখা গেছে সাধারণ আড্ডাও রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে গানে গানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণ সেরে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন চার অক্টোবর। এক জায়গায় কবিকে ঘিরে বসেছেন কালিদাস নাগ, মনোমোহন ঘোষ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছে। তারই মধ্যে সকলে মিলে কবিকে অনুরোধ জানালেন একটা গান করার জন্য। কবি গেয়েছিলেন,'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'। কালিদাস নাগ এ-ঘটনার সূত্রে জানাচ্ছেন যে:—'কবি কেন যে গেয়েছিলেন "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" তা অনেক পরে বুঝেছি।' পরের বছরের আর একটি ঘটনার কথাও পাই কালিদাস নাগের জবানিতে: '১১ই মাঘ ভোরবেলা চিৎপুর রোডের উপরকার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবিকে ঘিরে বসেছি--তিনি তন্ময় হয়ে একা গেয়ে গেলেন— "ভোরের বেলা কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে"। টৌড়ি ভৈরবীর মিশ্র আলাপে সেদিনকার সকাল যেন এক অভিনব তাৎপর্যে ঝলমল করে উঠল।'

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন রামগড়ে, উঠেছেন সদ্য কেনা বাড়ি 'হৈমন্তী'তে। সেখানে এলেন সুহৃদ অতুলপ্রসাদ সেন। তারপর একে একে রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ। সকলে মিলে আড্ডা বেশ জমে উঠল। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখছেন:—'মনে পড়ে একদিন অতুলপ্রসাদ বাবাকে অনুরোধ করলেন—"আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার

বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ঐ গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন"। বাবা গাইলেন,"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর..."। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে বারবার গানটি গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয় তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর একবার শোনার জন্য আকুল হয়ে পড়েন।... সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ— এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ।'

যেখানে একসঙ্গে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর মতো সংগীতজ্ঞ, সেখানে এক বনভোজনের আড্ডাও পরিণত হয় গানের আড্ডায়। সীতা দেবীর লেখনীতে ফুটে উঠেছে সেই ছবি:—'শ্রীপঞ্চমীর দিন ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুরুলে বনভোজন করিতে চলিল।....সুরুলে তখন একখানি মাত্র বড় দোতলা বাড়ি। ...কবি...নিজের দুই একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার পর শুরু হইল গানের পালা। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী কয়েকটি হিন্দী গান করিলেন, তাহার পর 'ফাল্গুনী' উজাড় করিয়া বসন্তের গান চলিল। 'আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূণ্য হাতে" গানটি কবি সেইদিনই রচনা করিয়াছিলেন বোধহয়, সর্বশেষে সেই গানটি তিনি একলা গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।'

গানের আড্ডায় তো শুধু গানই হয় না, সঙ্গে গল্পগুজবও থাকে। একবার গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের বেণুকুঞ্জে সারাদিন গানে-গল্পে-আড্ডা জমিয়েছেন কালিদাস নাগ আর অমল হোম। অমল হোম লিখছেন: বৈকালিক চা-পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময়ে ঘোর কালবৈশাখী মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ।.....দিক্‌দিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি দাঁড়িয়ে বারান্দায়। হঠাৎ দিনদা চেঁচিয়ে উঠলেন— "ঐ দ্যাখো রবিদা আসছেন— দেখি সেই ঝড়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন— তাঁর বেশবাস, তাঁর শ্মশ্রুকেশ উড়ছে, জোব্বাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁ হাতে আর ডানহাতে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা।... আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম গলা ছেড়ে তিনি গাইছেন— মেঘমন্দ্রের মতো তাঁর কণ্ঠ উঠছে গর্জে— যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি— বারান্দাতে উঠেই বললেন,–'দিনু এই নে'— ঘরে এসে বসে পড়লেন দিনেন্দ্রনাথের ফরাসে।... তারপর নামল বৃষ্টি মুষলধারে— আর নামল অজস্র ধারায় কবির ও দিনেন্দ্রনাথের গান।'

শন্তিনিকেতনের কোনার্কে আর-এক আড্ডার কথা জানিয়েছেন অমিতা সেন: 'কোনার্কে সেদিন সন্ধ্যায় জমজমাট আসর। ভীমরাও শাস্ত্রী, নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন

আরও কতজন উপস্থিত। গান নিয়ে নানা আলোচনা চলছে ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। আলোচনার সূত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতের এক-একটি সুর ভেঁজে চলেছেন ভীমরাও শাস্ত্রী— কখনো কথার সঙ্গে কখনো বা শুধুই সুর। হঠাৎ একটি গানের সুরে মেতে উঠলেন কবি। শুরু হয়ে গেল ভীমরাও শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ— দুজনের সুরের খেলা। এক একটি কলি গাইছেন ভীমরাও শাস্ত্রী, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাতে বাংলা কথা বসিয়ে গেয়ে উঠছেন গান। সুরের খেলায় মেতে ওঠা দুজনের সে কী উত্তেজিত মূর্তি। লাল হয়ে উঠছে ভীমরাও শাস্ত্রীর মুখ আর তরঙ্গে তরঙ্গে উছলে পড়ছে তাঁর কণ্ঠে হিন্দী গানের সুর। তিনি থামছেন তো রবীন্দ্রনাথ ধরছেন, আবার রবীন্দ্রনাথ থামছেন তো ভীমরাও শাস্ত্রী ধরছেন গান। তখন বাইরে ঝরছে অবিরাম বৃষ্টিধারা।... অবর্ণনীয় পরিবেশ। সেদিন সৃষ্টি হল গান— সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না'। গানের আড্ডা থেকে তাহলে জন্ম হতে পারে এক অসামান্য গানেরও!

কবি-নাট্যকার-সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুবই রসিক, আড্ডাপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁর বাড়ি 'সুরধাম'ও মাঝে মাঝেই মেতে উঠত গানে-গল্পে-আড্ডায়। দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমার জানাচ্ছেন: '...মনে পড়ে, খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা। সুরধামে তিনি মাঝে মাঝেই এসে পিতৃদেবের হাসির গানে দোয়ার দিতেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। বন্ধু তো নয়, যেন দোসর— নিত্যসঙ্গী। উভয়েই শালীনতায় নিখুঁত, বেশভূষায় অনবদ্য, কথালাপে প্রিয়ংবদ, রসবোধে জনপ্রিয়'। দিলীপকুমার তাছাড়া 'ডাকাতে ক্লাব'-এর কথা বলেছেন। এর সদস্যদের নোটিস জারি করা হত— অমুকদিন তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি হবে। সর্বপ্রথম গগনঠাকুরকে এই চিঠি দেওয়া হয়। ডাকাতে ক্লাবের এই আড্ডা নির্ভেজাল গানের আড্ডা ছিল না, তবে গানই ছিল এর মূল আকর্ষণ। আর, গল্প ছাড়া কি গানের আড্ডা জমে? কবি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দিলীপকুমারের আলাপচারিতায় ডাকাতে ক্লাবের দুরন্ত এক আড্ডার ছবি কি চমৎকার ফুটে উঠেছে! অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বলছেন,— 'জানো দিলীপ, ডাকাতে ক্লাবে--উঃ, সে কী হল্লাই করতাম আমরা...। একদিন হল কী, তোমার বাবার উর্বরমস্তিষ্কে খেয়াল গজালো সারারাত সভা বসাতে হবে...। রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ) সেদিন সভাপতি হলেন বাধ্য হয়ে।... রাত তিনটে পর্যন্ত রবিবাবু আমাদের গানে গল্পে আবৃত্তিতে মজিয়ে রাখলেন। কিন্তু তারপরে করযোড়ে বললেন,'এবার আমাকে মাফ করতেই হবে— দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কে পেরে

উঠবে? আমি বাড়ি যাই, চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এহেন আসরে এক রঙীন দ্বিজেন্দ্রবাবুই সভাপতির দায়িত্ব বহন করার যোগ্য'। তোমার বাবা 'জো হুকুম' বলে সভাপতির আদেশ শিরোধার্য করে এগিয়ে এলেন ও রবিবাবুর প্রস্থানের পর একাই একশো হয়ে কখনো গান কখনো গল্প কখনো আষাঢ়ের কবিতা আবৃত্তি করে চললেন।"

একবার পাটনায় এক বাড়িতে এক আড্ডায় উপস্থিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ। কথায় কথায় দেশবন্ধু দিলীপকে বললেন,'দিলীপ তুমি তোমার বাবার ভক্তির গান, স্বদেশী প্রেমের গান তো শোনালে, কিন্তু তাঁর হাসির গান? গাও না কোথাও? ' দিলীপকুমার বললেন: 'গাই, কোনটি শুনতে চান?' দেশবন্ধু বললেন,' প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম বাহা বাহারে— গানটি জানো?' জানি বলে গানটি শোনালেন দিলীপকুমার সরসভঙ্গিতে।

শুধু বাবার নয়, অতুলপ্রসাদের গানেরও এক বড় প্রচারক ছিলেন দিলীপকুমার। লক্ষ্ণৌতে প্রথম গেছেন অতুলপ্রসাদের বাড়িতে, সঙ্গে আছেন আর এক নামী সঙ্গীতবোদ্ধা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদ দারুণ খুশি, বারবার বলছেন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সঙ্গীতময় দিন কাটানোর কথা। যাইহোক, সেদিন সেই ঘরোয়া আড্ডায় প্রথমে গাইলেন দিলীপকুমার। তারপর অনুরোধে অতুলপ্রসাদ— পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। দিলীপকুমার লিখছেন.'চলতি ভৈরবী কিন্তু তাঁর গানের একটা বিশিষ্ট ঢং ছিল— বিশেষ করে ঠুংরি-ভঙ্গিম গানে। এরপরেই তিনি গাইলেন, রুমক ঝুমক রুম ঝুম। ধূর্জটি সমঝদার তো— বলে উঠলো: 'ইউরেকা। এরই তো নাম সৃষ্টি।' আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম: শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর আগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার আমদানি হয়েছে— কেবল ঠুংরি বাকি ছিল। আপনিই তার অভাব প্রথম পূর্ণ করলেন।' তারপর অতুলপ্রসাদের কাছে বেশ কিছু গান শেখেন দিলীপকুমার।

শুধু লক্ষ্ণৌ নয়, অন্যান্য জায়গাতেও অতুলপ্রসাদকে নিয়ে গানের আড্ডা জমিয়ে তোলেন দিলীপকুমার। একবার শিমুলতলায় বোন মায়ার বাড়ি নিয়ে গেছেন অতুলপ্রসাদকে। বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই— যাকে দিলীপকুমাররা বলতেন মণিমামা— তাঁকে টেনে আনা হল ভাগলপুর থেকে। জমে উঠল গানের আড্ডা।

একবার শিষ্যা উমা বসুকে কাশীতে নিয়ে গেছেন দিলীপকুমাব। কাশীতেই থাকেন মোতিবাঈ, যাঁর গানের কথা বহুবার শুনেছেন উমা দিলীপকুমারের কাছে।

কাশী পৌঁছতেই উমা আবদার ধরলেন মোতিবাঈয়ের গান শোনাতে হবে। তখন তাঁরা গেলেন মোতিবাঈয়ের কাছে। মোতিবাঈ নানা গান শোনালেন। এমনকী দিলীপকুমারের কাছে শেখা দুটি বাংলা গানও। পরে উমার গানের কথা বলতে মোতিবাঈও উমার গান শুনতে চাইলেন। উমা ভয়ে ভয়ে দিলীপকুমারের কাছে শেখা 'বুলবুল মন ফুল সুরে' গানটি শোনালেন। মোতিবাঈ মুগ্ধ। দিলীপকুমার বহু সঙ্গীতগুণীর সঙ্গ করেছেন, স্বভাবতই নানা গানের আড্ডার শরিকও হয়েছেন।

কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ আর সঙ্গীতরসিক যদি এক জায়গায় একত্র হয়ে গান নিয়ে কথাবার্তা বলেন, তার থেকে বেরিয়ে আসে নানান মণিমাণিক্য। আর সেই সঙ্গীতজ্ঞদের একজন যদি হন কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাহলে তো কথাই নেই, তাঁর ঝুলিতে কতই না গল্প! কুমারপ্রসাদের সঙ্গে রয়েছেন কিরানা ঘরানার অপেশাদার শিল্পী শীলা ধার— কুমারপ্রসাদের কথায়— 'যাঁর গল্পের বিষয়বস্তু এবং পেশ করার কায়দার মধ্যে এমনই বারিকি ও মুনশিয়ানা আছে যে ঘন্টার পর ঘন্টা হাতজোড় করে শুনতে হয়'। শীলা ধার বলছেন সিদ্ধেশ্বরী বাঈয়ের প্রথম গান শোনার অভিজ্ঞতার কথা। শীলা ঠাকুরদার সঙ্গে গেছেন পুরনো দিল্লির এক জায়গায়। শামিয়ানা ঢাকা জায়গায় একটি বিরাট লাল কাশ্মীরি কার্পেটের চারপাশে অনেকগুলি সোফাসেট সাজানো। আর সেই কার্পেটের একপ্রান্তে বসে আছেন একটি লাল শাড়ি পরা ভদ্রমহিলা, একটি শুঁটকো চেহারার হারমোনিয়াম বাজিয়ে— তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বোতাম টিপলেই সে প্যাঁ পোঁ করতে শুরু করবে, আর একটি ততোধিক ক্ষয়াটে চেহারার সারেঙ্গিবাদক এবং তার চেয়েও খেঁকুরে একটি লাল ফেজ পরা তবলিয়া। ভদ্রমহিলা হেসে হেসে সকলের সঙ্গে কথা বলছেন বসে বসে। দু-চারজন তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে সিদ্ধেশ্বরীর রঙ ময়লা হতে পারে, যাই বলো, কিন্তু কী ফিগার আর চেহারায় কী নামক!... গান শুরু হল। সিদ্ধেশ্বরী বাঈ চোখ বুজে বাঁ কানে হাত রেখে ডান হাতটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে সুর লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল। সে বয়সে আমি রাগ-টাগ বড় একটা বুঝতাম না, আর ঠুম্‌রিও ইতিপূর্বে শুনিনি। কিন্তু ওই জোরালো আওয়াজে সাচ্চা স্বর লাগানোর প্রভাব আমিও এড়াতে পারলাম না। যশোদার মুখে 'সাঁঝভরি ঘর আ জা', একই ফ্রেজের ভিন্ন ভিন্ন এক্সপ্রেশন, ভাও বাতলানো শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে কিরকম করতে লাগল। Her music conveyed a genuine feeling of worth and passion which never left me whenever I heard her in later years"— একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে

কুমারপ্রসাদ বলেন— "ওইটেই থান কথা। যে গানে ইমোশনাল কনটেন্ট নেই শুধু হরফৎই আছে, তা মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে না। জেনুইন ইমোশন। সেন্টিমেন্টালিটি বা মেলোড্রামা নয়।" শীলা তারপর বলে চলেন— "... ইতিমধ্যেই লগি শুরু হয়ে গেছে। উনি বসে আছেন, ওঁর শরীরের উপরিভাগ লয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে, কিন্তু সে দোলা এমন যে মনে হচ্ছে যেন উনি সত্যি সত্যিই নাচছেন। চতুর্দিক থেকে তারিফ শোনা যাচ্ছে 'ওয়াহ্ ওয়াহ', 'কিয়া কহনা'।... ইতিমধ্যে উনি দাদরায় 'ঝমাঝম পানি ভরোলি' ধরে নিয়েছেন। এ তালটা আমার কাছে নতুন, আর পূরবের ভাষাও আমার বোধগম্য হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে মুদ্রা ও গলা দিয়ে বাইজি দেখাচ্ছেন কিভাবে একটি সুন্দরী দেহাতি গ্রামের মেয়ে জল ভরে কলসি মাথায় নিয়ে হাঁটছে, তার হাঁটার অলস ছন্দ, নৃত্যের ভঙ্গিমা, তার লাসতার নাজ, সৌন্দর্যের গর্ব ও অহঙ্কার সব কিছুই আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না, এমনই সেই গানের ভাও বাৎলানোর মহিমা।"

গত শতকের সত্তরের দশকে নয়না দেবীর বাড়িতে দারুণ গানের আড্ডা বসত। দীপালি নাগকে সেই আড্ডাতেই নয়না দেবী এক জব্বর গল্প শুনিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর গান নিয়ে। দীপালি জানিয়েছেন কুমারপ্রসাদকে। সিদ্ধেশ্বরী বাই কাশী থেকে লক্ষ্ণৌতে এসেছেন রেডিওতে গান করতে। সেসময় লাইভ ব্রডকাস্ট হত। প্রোগ্রামের আগে সব শিল্পীই একটু গলা গরম করে নিতেন। সিদ্ধেশ্বরী বাইও সারেঙ্গী তবলা মিলিয়ে নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছেন। গান করতে করতে 'বুকের আঁচলটি বুঝি খসে গেছে। ওঁর খেয়াল নেই। পাশেই সারেঙ্গীবাদকের চোখদুটো শুধু যে সেঁটে গেছে তাই নয়, হাতও মনে হচ্ছে আর চলছে না। থাকতে না পেরে সিদ্ধেশ্বরী বাই তাঁর ব্লাউজের পুটপুটি বোতাম এক টানে খুলতে খুলতে চেঁচিয়ে উঠলেন,'দেখনা হো তো দেখ্, মগর কম্‌সে কম্ সুর সে তো বাজা।' এই হচ্ছেন সিদ্ধেশ্বরী বাঈ। এমন কত চমকপ্রদ গল্প আমাদের জানিয়েছেন কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের নামী শিল্পীদের কথা, তাঁদের গানের আড্ডার কথা আরও আমরা পেয়েছি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (তহজিব এ মৌসিকি), সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর (স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা) কাছে।

সাবেক কলকাতায় নানা উৎসবে, যেমন দোল-দুর্গোৎসবে, বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে 'ইনফর্ম্যাল' গানের আসর বসত, যাকে গানের আড্ডা বলাই সঙ্গত। বসত কারোর বৈঠকখানায়, কারও বা নাচমহলে। এমনতর নানা আসরে অংশ-নেওয়া নব্বই-উত্তীর্ণ শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে

স্মরণ করা যেতে পারে। রামকুমার জানাচ্ছেন: ' পুজোর ঠিক আগের আসরগুলোতে ধরা হত আবাহনী, আগমনী গান। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী— প্রত্যেক দিনেই আলাদা আলাদা গান গাওয়া হত সে সব আসরে। নবমীকে কেন্দ্র করে যত বাংলা গান সে সময় লেখা হয়েছিল তার সংখ্যাটা ছিল বিশাল। আর বিজয়া দশমীকে স্মরণ করে লেখা গানের তো শেষ নেই। ঠাকুর চলে গেল, ঘট নিয়ে ফিরে আসা হল। কোলাকুলি গলাগলি চলল। সিদ্ধি সরবৎ বিলোনো হল। ব্যস তার পরই শুরু হল বিজয়ার গানের আসর। ঢালা ফরাসের ওপর বসলেন রসিকেরা। মাঝে হোতা বাবুটি। হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা, তামার বাঁয়া, কখনও কখনও সারেঙ্গী মজুত থাকত আসরে। কালোয়াতির ঢঙে গাওয়া হত— 'সত্যি নাকি যাবি উমা পাষানপুরী শ্মশান করে।' গাওয়া হত 'এসো মা এসো মা উমা বোলো না কো যাই' কিংবা 'রজনী জননী তুমি পোহায়ো না ধরি পায়'। কখনও কোনটা টপ্পা আঙ্গিকের হয়ে যেত। গাইতেন বিজয়লাল মুখুজ্যে মশাই, কালীপদ পাঠক, কেষ্টদা— কৃষ্ণচন্দ্র দে। উদাত্ত ভরাট কণ্ঠে গমগম করত। বিষণ্ণ বিজয়া অন্য মাত্রা পেয়ে যেত। একবার এরকম এক বিজয়া দশমীর আড্ডায় রামকুমার চাটুজ্যের গান শুনে আয়োজক বাবুটি কেঁদেই ভাসালেন। রামকুমার লিখছেন, 'বাবু বিজয়া দশমীর রাতের আসরে আমার ওই গান শুনে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। বাবুর কান্না দেখে মোসায়েবরা কেমন মিইয়ে গিয়েছিল। সে রাতে বাবু মোসায়েব কেউই কোনও খাবার আর মুখে তোলেননি মায়ের শোকে। অথচ বেশ মনে আছে প্রচুর খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।'

দোলে বউবাজারের আঢ্যিদের বাড়িতে কিংবা পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে, পাইকপাড়ায় লালাবাবুদের বাড়িতে গানের আড্ডা বসত। রামকুমারের জবানিতে: 'সকাল থেকেই বাবুদের বাড়িতে মানুষজনের আনাগোনা। সাদা ধপধপে শান্তিপুরী ধুতির ওপর পাঞ্জাবি বা বেনিয়ান। বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই পিতলের পিচকিরি থেকে রঙ ছোঁড়া হত কর্তামশায়ের হুকুমে। সাদা বসন রঙীন হয়ে উঠল। তবে তাতে আক্ষেপ নেই। যারা রঙীন হল তারা জানে হোলীর আসর শেষ হলে লাট বেধে বৈঠকখানায় চলে আসবে ধুতি বেনিয়ান। সবই নতুন। সেসব আসরে গানের জলসা জমাতে কে না আসতো। কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞান গোঁসাই, জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব, এনায়েৎ খাঁ সাহেব, আবিদ হোসেন কে নয়! সকালের রঙের মোচ্ছব মিটলেই দুপুর থেকে বসে যেত সেসব আসর।'

কখনও কখনও গানের ক্লাসও যে হয়ে ওঠে গানের আড্ডা আর সেখানে জন্ম নেয় নতুন নতুন গান, তারও বৃত্তান্ত মিলল রামকুমার চাটুজ্যের স্মৃতিকথায়— 'কাজীদার গান লেখার একটা জায়গা ছিল হাতীবাগানের বাসন্তী বিদ্যাবীথি। কলকাতার প্রথম গানের ইস্কুল। এটি ছিল সাবেক চিত্রা সিনেমার কাছে। চালাতেন মোনাদা। আসল নাম মনোরঞ্জন সেন।... ঐ বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে গান শেখাতে গিয়েই আড্ডার খোশগল্পে জমে যেতেন কাজীদা। চা আসত। মুড়ি তেলেভাজা। আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ কী ভেবে চুপ করে যেতেন কাজীদা। তারপর মোনাদাকে বলতেন লেখার কাগজ এনে দিতে। তারপর সত্যি সত্যি তিনি লিখতে বসে যেতেন। পছন্দ না হলেই সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজটাকে মুঠো করে মুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন মেঝেতে।..কাজীদা চলে যাওয়ার পর মোনাদা ওইসব দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজগুলোকে তুলে আনতেন মেঝে থেকে। পরে ওইসব গান কাজীদাকে মোনাদা দেখাতেন। তখন আবার কিছু কিছু গান দেখে খুশি হয়ে উঠতেন কাজীদা, হেসে বলতেন,"বাঃ, বেশ হয়েছে তো। সেদিন কেন ভাল লাগল না বল্ দিকিনি!"

এইচ এম ভি-র রিহার্সাল রুমকেও নজরুল প্রায় গানের আড্ডায় পরিণত করেছিলেন। সেসময় এইচ এম ভি-র রিহার্সাল রুম ছিল উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের কাছে নলিন সরকার স্ট্রিটে। সেখানে দোতলার ছাদের একটা ঘরে নজরুল প্রতিদিন সকালে ১১-১২টায় এসে বসতেন। তারপর চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে সেখানে গান-গল্প-আড্ডা-গান লেখা- সুর দেওয়া চলত। নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন গিরীন চক্রবর্তী, চিত্ত রায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কোনও কোনও দিন কালীপদ সেনও।

বাংলা গানের এক যুগান্তকারী স্রষ্টা সলিল চৌধুরী। সুরের স্বর্গীয় আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন ছোটবেলায় মেজ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি— ২১ নম্বর সুখিয়া স্ট্রিটে। সে বাড়ির একতলায় বৈঠকখানায় ছিল 'মিলন পরিষদ অর্কেস্ট্রা' ক্লাব। তাঁর ছোড়দা ননী অর্থাৎ নিখিল চৌধুরী ছিলেন বাদ্য পরিচালক। ঘরের মধ্যে ছড়ানো হরেক রকমের যন্ত্র: বেহালা-পিয়ানো-ক্ল্যারিওনেট-সেতার-তবলা-পাখোয়াজ আরও কত কী! সন্ধেবেলা এখানে গানবাজনার চর্চা হত। একদিন দোতলার দালানে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে পড়তে হঠাৎ সলিল শুনতে পেলেন এক মায়াবী সুর,— 'পিয়ানো বেহালা ক্ল্যারিও নেটে তবলায় বাজানো এক অপরূপ অর্কেস্ট্রার সুর'। সলিলের নিজের কথায় সে সুর, 'এক বিস্তীর্ণ মাঠের সামনে এনে খোলা হাওয়ায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। সে মুক্তির আস্বাদের তীব্র আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না'। এই ছোড়দাই ছিলেন তাঁর সঙ্গীতজীবনের প্রথম ও

শেষ গুরু। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকালে প্রয়াত ছোড়দা সলিলের 'সলিল চৌধুরী' হয়ে ওঠা দেখে যেতে পারেননি। এক পুরনো স্যাঁতসেঁতে বাড়ির এক কোণে নিছকই মনের আনন্দে গানবাজনার চর্চায় মেতে-ওঠা কয়েকজন মানুষের এক মিলনকেন্দ্র সলিল চৌধুরীর মতো সঙ্গীতস্রষ্টার মনে সুর-অমৃতের বীজ রোপন করে দিয়েছিল। পাঁচের দশকে সলিল চৌধুরী তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি নিয়মিত আড্ডায় বসতেন তাঁর তিন শিষ্য— প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই ত্রয়ীও তখন আস্তে আস্তে নাম করছেন গীতিকার-সুরকার হিসেবে। একদিন আড্ডায় সলিলদা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান একটা সুর শুনিয়ে প্রত্যেককে বললেন ওই সুরের ওপর গান তৈরি করতে। সলিলদা নিজে করলেন— ধিতাং ধিতাং বোলে— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিখ্যাত। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন— 'ও পারুল পারুল পলাশ পলাশ'— গেয়েছিলেন সে সময়ের প্রতিভাময়ী গায়িকা গায়ত্রী বসু। আর একটি গান তৈরি হল যৌথ উদ্যোগে: অনল চট্টোপাধ্যায় লিখলেন কথা— 'জীবনের এই বালুবেলায়'-— সুর দিলেন প্রবীর মজুমদার, গেয়েছিলেন সুকণ্ঠ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। এক আড্ডার উৎস থেকে তিনটি অসামান্য গান সৃষ্টি হল।

প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর আঙিনা হয়ে উঠত এক রম্য গানের আড্ডা— সে এক সঙ্গীতজ্ঞের বাড়িতে— পার্কসার্কাসে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে বিভিন্ন সময়ে হাজির হতেন লতাফত হুসেন খাঁ, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রশিদ খাঁ, কবি গোলাম কুদ্দুস, সলিল চৌধুরী, থাকতেন সৌরীন রায়, সুগত মার্জিত প্রমুখ। নির্মল আড্ডা আর গান। এর স্বাদই আলাদা— এই অভিজ্ঞতা কেষ্টবাবুর অন্যতম ছাত্র কাজী কামাল নাসেরের। সলিল চৌধুরীর কিছু পরে পরেই সঙ্গীতজগতে এসেছিলেন সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত। ১৯৫৩ সালে তাঁর সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ বেচু দত্তের এক রেকর্ডে। সিঁথিতে সুধীনদার ডি. গুপ্ত লেনের বাড়িতে প্রায় প্রতি রবিবার এক জবর গানের আড্ডা বসত। নিয়মিত যেতেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, অশোক রায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাছাড়া আসতেন সুনীলবরণ, সুকুমার মিত্র, আশিসতরু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 'প্রতি রবিবার যেন নতুন করে বাঁচার রসদ পেতাম আমরা সে আড্ডায়। সঞ্জীবনী ছিল সে সভা'— বলতে বলতে সুখের স্মৃতিতে ডুব দেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বলেন, "সে সব দিনের কথা কোনওদিন ভুলব না, কত কিছু শিখতাম, জানতে পারতাম সে আড্ডায়। সুধীনদা সুর করছেন হারমোনিয়ামে বসে—আমাকে

তুলতে বলতেন— তা ছাড়া কর্ড নিয়ে, কর্ড প্রগ্রেসন নিয়ে, সুরের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তার ফাঁকেই আসত নানান খাবার, চা। সেসব সুখের দিন কোথায় হারিয়ে গেল রে"!

'সাতের দশকের শেষদিকে শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে এক সঙ্গীতরসিক মানুষের আগ্রহে, ব্যবস্থাপনায় গড়িয়াহাটের কাছে 'সুরতীর্থ'নামক এক প্রতিষ্ঠানে মাসে একবার এক শুক্রবার গানের আড্ডা বসত'— জানালেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। 'নিয়মিত আড্ডায় আসতেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, গান-লিখিয়ে সুবীর হাজরা, সুরকার জয়দেব সেন, অমর ঘটক, অনীতা মজুমদার প্রমুখ। আমি তো যেতাম, তখন একটু একটু করে আমার নাম হচ্ছে, তা সেই আড্ডায় কত নতুন গান শুনেছিলাম, শিখেছিলাম। মনে পড়ে, জয়দেব সেন তখন নতুন, একদিন এসে শোনালেন 'এই বাংলার মাটিতে মাগো'— নির্মলাদি রেকর্ড করেন। অচিরেই তা বিখ্যাত হয়। সে আড্ডা অবশ্য বেশিদিন চলেনি। আর এখন এই সময়ে নির্ভেজাল গানের আড্ডা তো তেমন দেখি না। সকলেই আমরা বোধহয় বড্ড ব্যস্ত অথচ এর দরকার আছে মনে হয়।"

"আমাদের লিন্টন স্ট্রিটের বাড়িতে মাঝেমধ্যেই ইনফর্মাল গানের আসর বসত, যাকে গানের আড্ডা বলা যায়।"— বলছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী-তনয় উৎপলেন্দু চৌধুরী। "এক আসরে শান্তিদেব ঘোষের ৬০তম জন্মদিবস পালিত হল, উপস্থিত ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ। শান্তিদেব নানা আলাপচারিতার সঙ্গে শুনিয়েছিলেন নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র গান।

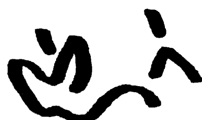
এক আসরে এসেছিলেন জসীমুদ্দিন সাহেব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওয়াহিদুল হক এক ঝাঁক বাংলাদেশের শিল্পী নিয়ে এসে গানবাজনা করে গেলেন। মানবকাকা, শ্যামলকাকা আসতেন বিশেষত পুজোর আগে আগে— পুজোর গান নিয়ে আলাপ আলোচনা হত, গানবাজনা হত। এখন অবশ্য এ ধরনের মেলামেশা, আড্ডা প্রায় বন্ধ"। উৎপলেন্দুর এই কথারই প্রতিধ্বনি শ্রীকান্ত আচার্যের কথাতেও— "এখন সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত বোধহয়। অনেকে মিলে গানের আড্ডা আর হয় না বললেই চলে, সকলের সঙ্গে যোগাযোগটা নেহাতই কাজের খাতিরে, দরকারে। অথচ অতীতে গানের আড্ডা নিয়ে আমার দারুন স্মৃতি রয়েছে যা কোনওদিন ভুলব না। কবীর সুমন তখন সুমন চট্টোপাধ্যায়। সুমনদার বৈষ্ণবঘাটার বাড়িতে মাঝেমাঝেই দল বেঁধে হাজির হতাম, সঙ্গে থাকত মৌসুমী ভৌমিক, তৃণাঞ্জন এমনই কেউ কেউ। সুমনদার গলায় তাঁর নতুন নতুন গান

শুনে আমার বিমোহিত— বুকের গভীরে এসে ঘা মারত, 'এক একটা দিন ছিল মসৃণ', 'আমার দু'বাহু প্রসারিত করে', 'দশরথ গেলেন মৃগয়ায়', 'খাতা দেখে গান কোরো না' কিংবা সেই 'তোমাকে চাই'— গিটার হাতে নেহাতই কথার ছলে গাওয়া এই সমস্ত গানে আমরা নতুন দিনের ইশারা পেতাম। এখনও ভাবলে রোমাঞ্চ হয়। নাঃ, এখন আর সে রকম কিছুই হয় না"— খেদোক্তি শ্রীকান্তের। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্যের কথায় একটা জিনিস পরিষ্কার, গানের আড্ডার সে দিন নেই। পেশার তাগিদে নির্ভেজাল গানেব আড্ডা কি তবে হারিয়েই গেল!

গানের আড্ডা নিয়ে এতক্ষণ এই যে সাতকাহন তা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়, এক প্রস্তাবনা মাত্র। এই স্বল্প পরিসরে গানের আড্ডার মেজাজ, চরিত্র কিছুটা তুলে ধরার নম্র প্রয়াস এখানে রইল।

তথ্যসূত্র

জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী
ছেলেবেলা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী
পিতৃস্মৃতি: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী
স্মৃতিচারণ: দিলীপকুমার রায়। এ মুখার্জী এন্ড অ্যাসোসিয়েসন
মজলিস: কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স
তহজিব এ মৌসিকি: জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বাউলমন প্রকাশন
স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা: সুরেশ চক্রবর্তী। আনন্দ পাবলিশার্স
গায়ক রবীন্দ্রনাথ: পার্থ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স
কোমলগান্ধার: ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ। নির্মল বুক এজেন্সি
জলসাঘর: রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
জীবন উজ্জীবন: সলিল চৌধুরী। প্রতিক্ষণ



এক বনেদিবাড়ির আড্ডা

সুস্মেলী দত্ত

সময়টা শরতের মাঝামাঝি। স্বচ্ছ নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। শিউলির গন্ধ আর বাতাসে পুজো পুজো আমেজ। গত এক মাস ধরে যে পাঁচটি দিনের জন্য তোড়জোড়, সাজ সাজ রব, সে দিনগুলি অনতিদূরেই। ...''লাহাবাড়ির পুজো কম কথা কী! সেই কবে বরশূল নিবাসী লাহাদের আদি পুরুষ বনমালী লাহা এই পূজার প্রথম প্রবর্তক, তারপর মধুমঙ্গল লাহা চুঁচুড়ায়, ক্রমে দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ, জয়গোবিন্দ, ভগবতীচরণ, দেবীচরণ, রামচরণ লাহা কলকাতায় এসে কলুটোলার জ্যাকোরিয়া স্ট্রিটে প্রথম ভাড়াবাড়িতে দুর্গাপুজো করেন প্রায় ১৬০ বছর আগে। ১৮৫৭ সালে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, শ্রীকৃষ্ণ লাহা, শ্যামাচরণ লাহা ও ভগবতীচরণ লাহা বর্তমান ও সর্বাংশে আদিনিবাস বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই বাসাবাড়ি ক্রয় করেন ও দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন।''

এইপর্যন্ত বলে একপ্রস্ত দম নিলেন প্রয়াত প্যারীচরণ লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপ্রফুল্লচরণ লাহা, আমার বড় জ্যাঠামশাই।

অবিকল আমার দাদুর মুখের আদল পাওয়া এই বড় পুত্রটি আমাদের যৌথ পরিবারের এখন সর্বময় কর্তা। সাতাশি বছরের অশীতিপর বৃদ্ধ, প্রকারান্তরে যুবক ভদ্রলোকটি কিন্তু এখনও যথেষ্ট সপ্রতিভ। লাহাবাড়ির আড্ডা সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে ওঁর অস্থিচর্মসার দুর্বল হাতের মুদ্রায় বেজে উঠল 'পরজ' রাগ।

বড় জ্যাঠামশাই তখন অনেকটাই ছোট, বছর দশ-পনেরো হবেন বোধহয়। সালটা আন্দাজমতো ১৯৩০-৪০-এর মাঝামাঝি। যতদূর মনে পড়ে দু'মহলা বাড়িটির বাহিরবাড়িতেই প্রায়শই বসত গানবাজনার আসর। প্রয়াত প্যারীচরণ লাহা জমিদারবংশীয় হওয়ায় ইয়ার দোস্তদের অভাব বোধ করেননি কোনওদিনই। অধুনা শোবার ঘর, সে সময়ের বড় বৈঠকখানাতেই বসত নাচগানের আসর। সেসময় মানুষ এত কেরিয়ার সচেতন ছিল না। ছিল না পণ্যের এত বিজ্ঞাপন। তাই বোধহয় সকলেরই জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। তাঁরা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে ভালবাসতেন ও পারতেনও। সেই সময় উইকএন্ড বা এই ধরনের কনসেপ্ট ছিল না মানুষের মধ্যে। এঁদের বিশেষত জমিদার পরিবারে রবিবার বাদে অন্যান্য দিনগুলি ছিল একই সঙ্গে কাজের ও অকাজের দিন। খুব বেশি হলে মেরেকেটে ঘণ্টাচারেক বরাদ্দ সময় এঁরা লাহাবাড়িতে দিতেন, বাকি সময়টা ছিল বিপুল অবসরের।

বড় জ্যাঠামশাই বলে চললেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। "...হাবুলবাবু, গোপাল ঘোষাল, মদন দে, মধু দে, এইরকম আরও অনেক বন্ধু প্রায়ই আসতেন সন্ধে ছ'টা বাজলেই। হাসি, ঠাট্টা, গল্প, বিশেষত রসের কথাই বেশি হত। আড্ডার মাঝে মাঝে গানও হত বেশ। কেউ কেউ ঘুঙুর নিয়ে আসতেন বাড়ি থেকে— পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উদ্দাম নাচ আর খঞ্জনী বাজিয়ে গান আড্ডার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল।"

—"আর খাওয়াদাওয়া?"

—"সে এক এলাহি আয়োজন। হুঁকো, গড়গড়ি, তামাক একদিকে যেমন থাকত, তেমনি একটা বড় রূপোর খোপকাটা ডিবেতে পানমশলার যাবতীয় আয়োজন থাকত। যেমন— একটা খোপে লবঙ্গ, আরেকটাতে ছোট এলাচ— এভাবে বড় এলাচ, মৌরি, ধনেভাজা, জর্দা, কি না সাজানো থাকত সেখানে।"

নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। আড্ডায় রাজনীতির গন্ধ থাকত না। সেটা আগেই জানিয়ে দিলেন তিনি। সে আড্ডায় নির্মল আনন্দ উপভোগ করাই

মূল লক্ষ্য ছিল। প্রফুল্লচরণ লাহা বললেন,"রাজার দেশে বাস করে রাজার সমালোচনা করা ওঁরা একদমই পছন্দ করতেন না। সব মিলিয়ে বলতে গেলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ওঁনারা এতই সন্তুষ্ট ছিলন যে, অভিযোগ বা প্রতিবাদ করার মতো মানসিক ইচ্ছা তাঁদের একদমই ছিল না। ঘুড়ি ওড়ানো, মাঝে মাঝে সদলবলে সিনেমা, বা আগরপাড়া, বরাহনগর, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি জায়গায় মাছ ধরতে যাওয়া, সপরিবার বা সবান্ধব বাগানবাড়ি যাওয়া— এ সবই ছিল তাঁদের বিনোদন। আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল এগুলিই। কে ক'টা মাছ ধরেছে, কে ক'টা বাগানবাড়ি কিনেছে, কিংবা কী কৌশলে পাশের অমুক বাড়ির ঘুড়িগুলো কাটা পড়েছে ইত্যাদি। আর প্রাপ্তবয়স্ক আড্ডার কথা বললে বলা যায়, কেউ যদি কোনও বাঈজিবাড়িতে অমুক বাঈজির একটা ফাটাফাটি নাচ দেখে এসেছেন, তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হত। তবে আড্ডায় পান, তামাক অবাধে চললেও মদ ছিল নিষিদ্ধ। রাত ন'টার মধ্যে ভেঙে যেত আসর, যে যার বাড়ি চলে যেতেন নির্ভয়ে, তখন এত চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব ছিল না।" ১৯২০ সালে আমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের জন্ম। ২৭ বছর পরাধীন ভারতে, তারপর বাকিটা সময় স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অসম্ভব উত্তেজিত ছিলেন জ্যাঠামশাই ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দল। প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত দু'তিনদিন তাঁদের আড্ডা বসতই। স্বাধীনতার সুফল বা কুফল নিয়ে প্রায়শই কিন্তু বিতর্ক লেগেই থাকত। প্রথম দিকে ইয়ারবন্ধুদের আড্ডায় রীতিমতো উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় ছিল স্বাধীনতা! পরে অবশ্য এই তর্ক-বিতর্ক কিছুটা মিইয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার জমিদারিপ্রথার অবসান করে, ব্যাঙ্কের সুদ কমানো হয়, এছাড়া চুরি ডাকাতির উত্তরোত্তর উপদ্রব প্রভৃতি কারণে বিরক্তি স্থান পায় জ্যাঠামশাইদের আড্ডায়।

রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জি, বিদ্যুৎ বোস, প্রদ্যুত বসু, আভা গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ নাথ, অমিয় নাথ— এইরকম কে না যোগ দিতেন তাঁদের আড্ডায়।

তবে রবিবারের সান্ধ্যকালীন আড্ডাটা ছিল স্পেশ্যাল, বন্ধুদের মধ্যে একটু আধটু গানবাজনার শখ যাঁদের ছিল তাঁরা তো গাইতেনই উপরন্তু গানের মধ্যে অর্গান বাজানো ছিল উপরি পাওনা। সে এক মধুর স্মৃতি! বিশেষ দিনে কানে আতর লাগিয়ে কত্তারা হাজির হতেন বৈঠকখানায়। তারপর গল্প, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি, রসের গল্প। বিশেষত আদিরসের গল্প ছিল হটকেকের মতোই জনপ্রিয়।

নানারকম ছড়া কেটে আদিরসাত্মক ইঙ্গিতকে আরও উসকে দেওয়ার প্রচলন ছিল। যেমন—

হাওয়া নাই বাতাস নাই
মশারি কেন নড়ে
পিছন দিকে ফিরে দেখি
দাদা-বৌদি কী রে।

ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে যা-ই আলোচনা হোক না কেন রাত্রি ন'টার মধ্যে আসর ভাঙতেই হবে, এমনটাই আদেশ ছিল আমার দাদুর। সে যুগে যখন পুরুষরা যথেচ্ছ ব্যভিচার করত, বাঈজি নাচাত, রক্ষিতার ঘরে রাত কাটাত— আমাদের পরিবারে এ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহিলাবর্জিত সেই আড্ডায় পরিবারের পর্দানসীন মহিলারা ও তাঁদের সন্তানেরা স্থান পেতেন কখনও, হয়তো একবার কি দু'বার সেই বিশেষ দিনটিতে খাওয়াদাওয়ার এলাহি আয়োজন হত, এখনকার ভাষায় যাকে বলে 'গেট টুগেদার'। আমাদের দু'মহলা বাড়ির বারবাড়ির বৈঠকখানা ঘরের সামনেই ছিল লম্বা পাথরের দালান, সেখানে লম্বা রোল করা আসন পেতে দেওয়া হত। প্রথমে বাচ্চারা, তারপর পুরুষরা, সবশেষে মহিলারা ওই সান্ধ্যভোজে অংশ নিতেন।

আর এক ধরনের আড্ডার কথা, যেটা না বললেই নয়, সেটা হল তাসের আড্ডা। বাড়ির পুরুষরা তো বটেই এ আড্ডায় মহিলারাও পিছপা ছিলেন না। রোজ দুপুরে রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করতে করতে বিশেষত মাতৃস্থানীয় মহিলারা এ আড্ডায় অংশ নিতেন। অবশ্য তুলনায় যাঁরা কমবয়স্ক তাদের তাসের আড্ডা বসত সন্ধেবেলায়। আমার বড় জেঠিমা শোভারানি, ন'জেঠিমা সন্ধ্যারানি ও মা ভারতী লাহা শোনালেন তাঁদের তাসের সান্ধ্যকালীন আড্ডার অভিজ্ঞতার কথা।

আমার দাদু ছিলেন অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ। নিজে আড্ডা দিলেও বাড়ির ছেলে, মেয়ে, বউ—কারও ক্ষেত্রেই তাস খেলার আড্ডা ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ করতেন না। আমার ঠাকুমা লীলাবতী ছিলেন স্বামীর মতানুসারী। কর্তা-গিন্নি প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধেবেলা ছ'টা বাজলেই ফিটনে চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরোতেন। এই ছিল সুযোগ। বাড়ির ছেলে-বউ-মেয়ে যত ছিল সবাই জড়ো হত বারবাড়ির বৈঠকখানায়। শুরু হত তুমুল তাসের আড্ডা, সেই সঙ্গে টুকটাক জলখাবার, চা ইত্যাদি। শুধু যে পরিবারের মধ্যেই আড্ডা সীমাবদ্ধ থাকত

তা নয়, পাশের বাড়ি, সামনের বাড়ির কিছু মেয়ে-বউও নিয়মিত যোগ দিতেন তাসের আড্ডায়। মূলত টুয়েন্টিনাইন বা ব্রিজ ধরনের খেলাই বেশি হত।

আমার দাদু-ঠাকুমার একমাত্র আদরের মেয়ে ঁপ্রতিভাসুন্দরী। তিনিও প্রায়ই এসে থাকতেন বাপেরবাড়িতে। চার পুত্র, এক কন্যাসহ বাপের বাড়িতে পদার্পণ করলেই মা-জেঠিমাদের মধ্যে পড়ে যেত সাজ সাজ রব। সিনেমা, তাসের আড্ডা, ক্যারাম খেলা, লুডো খেলা— সব কিছু মিলিয়ে এক জমজমাট ব্যাপার। আড্ডাটা আরও জমাটি হত যদি আমার দাদুর খুড়তুতো ভাই ঁঅন্নদাচরণ লাহার পরিবারবর্গ (দুই পুত্র পাঁচ কন্যা) উপস্থিত হতেন ঠনঠনিয়ার বাড়িতে। এ যেন সোনায় সোহাগা! এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়....মা জেঠিমারা কাকে ছেড়ে কার সঙ্গে গল্প করবেন। সকালে নামমাত্র ভাঁড়ারঘরের কাজ সেরেই সবাই একসঙ্গে জড়ো হতেন শাশুড়ি অর্থাৎ লীলাবতীর বড় ঘরে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া টানা লম্বা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে সে কী আড্ডা। কোথায় কোন হলে কী সিনেমা এসেছে, কোন অভিনেত্রী কেমন অভিনয় করেন, কার কোন অভিনেতাকে ভালো লাগে থেকে পুজোয় কে কেমন গয়না-শাড়ি নেবেন, কী শাড়ি এবারে পুজোয় উঠছে, নিউমার্কেটের কোন দোকান এবারে শাড়ি-টাড়ি কিনতে যেতে হবে— এমনই সব বিষয় থাকত আড্ডায়।

বিশেষত শীতের দুপুরে, খাওয়াদাওয়ার পরে বাদামবাটা দুধে ভিজিয়ে রোজ গা ধুয়ে, মুসুরডাল বাটা মেখে রোদে বসতেন ফর্সা মোটাসোটা গিন্নিরা আরও ফর্সা হওয়ার আশায়। বড় এলোচুলে জবাকুসুম মাখিয়ে আলতো হাতে ম্যাসাজ করে দিত বাড়ির কাজের মেয়েরা। কারও মাথায় উকুন, খুসকি বা পাকা চুল থাকলে তারও সুরাহা হত এইসময় অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। তবে বাড়ির কাজের লোকেরা এই কাজটি করত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে। গিন্নিদের রসের আলোচনায় অনেক রসদ তাদেরও জুটে যেত আপন আড্ডার উপকরণ হিসেবে।

এর মধ্যেই আবার কেউ হয়তো কারও গয়না নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। হাতের চুড়ি, বালার ডিজাইন থেকে কার কর্তা জোর করে গয়না বানিয়ে দিয়েছেন, কে কোন স্যাকরাকে দিইয়ে গয়না বানিয়ে খুশি নন, কোন দোকানে ভালো গয়না পাওয়া যায়, এসব আলোচনাও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হত।

শাড়ি-গয়না-সিনেমা— এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই কি আমাদের মা-ঠাকুমারা হোঁচট খেতেন? উত্তরে লাহাবাড়ির ন'গিন্নি সন্ধ্যারানি জানালেন, "একদমই নয়। আমরা

রীতিমতো পত্রিকায় কোনও ভালো গল্প, সিনেমা আর্টিস্টের জীবনী, উল বোনার নানা প্যাটার্ন, ক্রুশের আসন কী করে বুনতে হয়, রান্নার রকমফের প্রভৃতি নিয়েও জোরদার আলোচনা করতাম। সিনেমা পত্রিকা 'রূপমঞ্চ' ও 'মহিলা' পত্রিকাটি আমরা নিয়মিত পড়াতাম অনেকেই। এছাড়া পরচর্চার প্রসঙ্গ তো থাকতই, সঙ্গে আদিরসের ককটেল, কিন্তু রাজনীতির হালহকিকৎ সম্পর্কে কথাবার্তা নৈব নৈব চ।''

পরচর্চা কিরকম?

—''খ্যাঁদা হোক বোঁচা হোক
সব সইতে পারি
ওই মুখ নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করা
সেই দুঃখেই মরি''

এছাড়া আড্ডায় হতভাগ্য শাশুড়ি হয়তো শোনাতে বসলেন দুঃখের মহাভারত। উৎকর্ণ ননদ, জা, বৌদি, মাসি, পিসি, মাসতুতো দেওরের বউ। আহা রে! চোখের জল মুছতে মুছতে তাদের আলতারাঙা ঠোঁট হয়ে উঠত আরও রাঙা, ততোধিক চোখ, কান, নাক!

বাড়িতে নতুন বউ হয়ে আসা নার্ভাস প্রকৃতির শান্ত, রুগ্‌ণ বউটি প্রায়শই হয়ে পড়ত র‍্যাগিংয়ের শিকার। মধ্যাহ্নভোজের পর নববধূটি যখন শাশুড়ির হাতে এগিয়ে দিত পানের ডিবে, মধ্যবয়স্কা রমণী আড়চোখে তাচ্ছিল্যভরে চাইতেন নববধূটির দিকে। পরে হেসে পানটি চিবোতে চিবোতে আড্ডার নিয়মিত সদস্যদের সামনে শুরু করতেন ছড়া—

''শীতকালে ফাটায় চটায়
গ্রীষ্মকালে ঘামাচি
বর্ষাকালে হাজায় পচায়
কোন কালে বউ রূপসী?''

তবে এই নববধূটিই যখন সমবয়স্কাদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন তাসের আড্ডায় বাজিমাত করত, তখন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে আসত বই কী!

আড্ডায় আর একটি অবশ্যম্ভাবী সংযোজন ছিল গ্রামোফোন শোনা। ভালো রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায়ই বাজানো হত, বিশেষত গরমের দুপুরে হাতপাখা টানতে টানতে যখন ক্লান্ত হয়ে যেত হাত, চোখে একরাজ্যি ঘুম এসে যেত, তখন

ঢুলতে ঢুলতে অমুক ওস্তাদ, তমুক বেগমের নাকিসুরে গান স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত মেয়েদের।

সন্ধ্যারানির বাপের বাড়িও ছিল বউবাজারে বর্ধিষ্ণু একটি পরিবার। যুগল দত্ত ছিলেন তাঁর বাবার নাম। যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্ধ্যারানি আঠারো বোনের এক বোন।

কেমন ছিল তাদের আড্ডা? সেটাও জানিয়ে দিই। মধ্যাহ্নভোজনের পর, বিশেষত শীতকালে 'মার্কোলাইজ ওয়াক্স' ভালো করে হাতে পায়ে মুখে মেখে রোদ্দুরে বসতেন মেয়েরা। কেউ কেউ চুল শুকিয়ে গেলে 'পমেটম' জেল দিয়ে আঁচড়ে পাতা কেটে চুল বেঁধে ছাদে যেতেন। ঠোঁটে মাখতেন হেজলিন।

দত্তদের বাড়ির পাশেই ছিল কলুদের বাড়ি। যে কোনও কারণেই হোক না কেন দত্তদের মেয়ে-বউরা কলুদের হেয় জ্ঞান করতেন। আড্ডার মাঝখানে যদি কোনও মেয়ের চোখে পড়ে যেত যে কলুদের বাড়ির কোনও সদস্য ওদের দিকে নজর রাখছে, তখনই শুরু হয়ে যেত ওদের বাড়ির বিরুদ্ধে যোগসাজশ। বড়রা ইন্ধন জোগাতেন, আর ছোটরা লাফিয়ে, হেসে, ব্যঙ্গ করে, ছড়া কেটে কলুদের অপদস্থ করার চেষ্টা করত। অবস্থা সহ্যের সীমা ছাড়ালে ওপাশ থেকেও আসত প্রতিবাদ— কিন্তু মীমাংসা তো দূরের কথা, এ নাটক চলতেই থাকত দিনের পর দিন।

এই আড্ডার সুবাদেই ন'জেঠিমারা দলবেঁধে সিনেমা যাওয়া, এমনকী শুটিংও দেখেছিলেন। সেসময় বম্বে থেকে হিরোইন 'বেগমপারা' এসেছিলেন কলকাতায় 'বাগদাদ' ছবির শুটিং করতে। ১০-১২ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটির সে শুটিং দেখার অভিজ্ঞতা আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। বিশেষত বেগমপারার গয়নাগুলি দেখে অবাক হয়েছিল মেয়েটি। নিউমার্কেটের ঠাকুরলাল হীরালাল-এর গয়নাগুলি সত্যিই ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক।

প্রযোজক প্রেমচাঁদ আড়্ডি ছিলেন ন'জেঠিমার সম্পর্কিত জামাইবাবু। ওঁর সুবাদে আর একদিন মিনারে ওঁরা আঠারো বোন ও তাঁদের পরিবারবর্গ সুচিত্রা সেনের 'হাসপাতাল' সিনেমার একটা শো দেখতে গিয়েছিলেন। নায়ক অশোককুমার। পরবর্তী আড্ডায় দিদির মুখেই ওরা সকলে শুনেছিলেন যে, ম্যাডাম নাকি বড় গাড়ি ছাড়া শুটিংস্থলে আসেন না, শুটিং-এর সময় ফ্লোরে উনি কাউকে অ্যালাও করেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যারানির আড্ডায় তাস খেলা, ক্যারাম খেলা, লুডো খেলা, পরচর্চার সঙ্গে থাকত আর একটি জরুরি বিষয়, তা হল, রূপচর্চা। ওখান থেকেই জেঠিমা ইয়াডলে পাউডার, লিপস্টিক প্রভৃতির নাম শোনেন। যদিও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এইসব জিনিস ক্রমশ দুর্লভ হয়ে যেতে লাগল। রূপসচেতন মহিলাকুলের রাগ গিয়ে পড়ল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর। তখন কি সন্ধ্যারানি জানতেন যে তাঁর স্বামী কংগ্রেস করতেন এক সময়?

সন্ধ্যারানির স্বামী প্রশান্তচরণ লাহা অল্পবয়সে পল্লি উন্নয়ন সমিতির সদস্য ছিলেন। তারপর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে যখন ভর্তি হন, তখন কংগ্রেসে যোগ দেন। রাইচাঁদ বড়াল, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, অলকনাথ দে, গিরিজা ভট্টাচার্য, শিবদাস ভট্টাচার্য, অনিল দাস, এইরকম অনেককে নিয়ে বাড়িতে বৈঠকখানায় আড্ডা বসাতেন সপ্তাহে অন্তত দু'দিন। রাজনীতির কথা তো বটেই, এর সঙ্গে নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে ফেলেছিলেন। খদ্দরের জামা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরতেন এঁরা। তবে শুধুই রাজনীতির কথাই হত না। ন'জ্যাঠামশাই বললেন, ''সে কী আজকের কথা! কত গানবাজনা তখন হত। রাইচাঁদ গান করতো, ডমরুপাণি তবলা বাজাত। ওঃ, সে কী সুর, তাল, ছন্দ!''

রাজনীতির আলোচনা, গানবাজনা, সিনেমার আলোচনা ছাড়াও ছিল নতুন নতুন খাবার নিয়ে আলোচনা। দলের সকলেই প্রায় ছিলেন খাদ্যরসিক, তাই মাঝে মধ্যেই কালীঘাটের হারান মাঝির রাজভোগ, ভীম নাগের প্যারাডাইস, নবকৃষ্ণ গুঁইয়ের ভিকটোরিয়া সন্দেশ, শান্তিপুরের সুরভি সুধা— এসব মিষ্টি আনানো হত। সিগারেটের চল থাকলেও মদ ছিল নিষিদ্ধ। মেয়েদের নিয়ে আলোচনা হত না এমনটা নয়, তবে খুবই কম, এমনটাই বললেন আমার জ্যাঠামশাই।

আমার ন-জ্যাঠামশাই-এর জন্ম ১৯২৭-এ। ১৯৪৯-এ আমার মেজ জ্যাঠার ছেলে অলক লাহার জন্ম। অলক লাহার যৌবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ বিশ শতকের মাঝামাঝি দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে— সত্তরের নকশাল আন্দোলন, খাদ্যসংকট, এসব টালমাটাল রাজনৈতিক দোলাচলের মধ্যে কেটেছিল সেই যৌবনের দিনগুলি। অলক লাহাদের আড্ডায় কি প্রভাব পড়েছিল সেই দোলাচলের?

''অবশ্যই' জোর দিয়ে বললেন অলক লাহা।

অসিতাভ দত্ত, অমিত বসু, অসিত দে, অঞ্জন ভদ্র, প্রভাত ভট্টাচার্য, পিনাকী চট্টোপাধ্যায়— এইরকম আরও অনেক বন্ধুর সঙ্গে এঁরা গড়ে তুলেছিলেন 'খাই খাই ' ক্লাব।

ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম নিয়ে জোরদার বিতর্ক হত সেখানে। চারু মজুমদারকে নিয়েও কম আলোচনা হত না। মিনি ম্যাগাজিন বের করা হয়েছিল এই ক্লাবের তরফ থেকে— 'সময়' (বাংলা), 'ক্যালকাটা' (ইংরেজি)। বিভিন্ন সেলিব্রিটির লেখা যেমন এতে থাকত, তেমনই ক্লাবের সদস্যদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধও স্থান পেত। মাসিক এই পত্রিকাটির বিভিন্ন বিষয়, সমালোচনা, লেখার উৎকর্ষতা, মান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা এই আড্ডার মধ্যেই হত।

এই আড্ডার মাধ্যমেই একবার সকলে ঠিক করলেন, বন্যায় রিলিফের জন্য মেদিনীপুর যাওয়া হবে। সদলবলে সমাজসেবার প্রেরণা এই আড্ডার মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিল।

খাই খাই ক্লাবের তরফ থেকে প্রতি রবিবার একটা স্পেশ্যাল আড্ডার ব্যবস্থা করা হত। নাম ছিল 'রোববারের আড্ডা'। গৌরীনথ শাস্ত্রী, শ্যামল মিত্র, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকা হত ফি-সপ্তাহে। ক্লাবের সদস্যদের বাড়িতে পালা করে বসতো রোববার সকালের আড্ডা। এই আড্ডা মূলত ছিল সাংস্কৃতিক বিষয়ভিত্তিক। যেমন, সাহিত্য আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন থেকে শুরু করে হালের সত্যজিৎ, শঙ্কর, সুনীল কেউই বাদ পড়তেন না সেই আলোচনা থেকে। পাশ্চাত্যের শেলি, কিটস্, হ্যারল্ড রবিন্সও আলোচনায় স্থান পেতেন। এছাড়া গানবাজনার জগৎ, সিনেমা নিয়ে জোর আলোচনা চলতো সেই আড্ডায়। এর মধ্যেই চলতো খাওয়াদাওয়া— এলাহি আয়োজন থাকত। বেশ কিছু বন্ধুর অনুরোধে প্রায়ই হত খাবারের প্রতিযোগিতা— রসগোল্লা, জিলিপি, সন্দেশ—যে যত খেতে পারেন।

"সে সময়ের আড্ডাগুলো ছিল বড় আন্তরিক, যেন প্রাণের ভিতর থেকে উঠে আসা"— বললেন আমার দাদা। হয়তো চোখের কোণে একুট জল চিকচিক করে উঠল, হাতে ধরা পেপারওয়েটটা ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন,"বড় একা এখন আমরা সবাই। স্বচ্ছ মন, আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব— কোনওটারই অভাব ছিল না সেসময়ের আড্ডায়। প্রত্যেকে মনের প্রাণের কথা অকপটে স্বীকার করতে পারত অনায়াসে! প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে ভাবত. প্রয়োজনে উপদেশও দিত। এভাবেই হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে একটা 'কাউন্সেলিং' গোছের কিছু হয়ে যেত আমাদের অজান্তেই। কোনওরকম ডিপ্রেশন বা মানসিক চাপের অবকাশ সেসময় ছিল না, অথচ এখন আমাদের আড্ডায় এর সম্পূর্ণ

বিপরীত চিত্র। কে অফিসে কোন পোস্টে কীভাবে উঠল, বসেদের সম্পর্কে নিন্দে, ছেলে-মেয়ের কেরিয়ার কতটা উজ্জ্বল— এসবই এখন আড্ডার বিষয়বস্তু।"

অলকদার কথার অনুরণন আমার জীবনের ক্ষেত্রেও। তখন আমার বয়স বছর ছয়েক হয়তো। আমার জেঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন মিলিয়ে সবসুদ্ধ বারোজন একই যৌথ পরিবারে বাস করতাম। মনে আছে, রোজ বিকেলবেলো আমাদের বাড়ির নীচে বাগানে যাওয়া চাই-ই। বিকেলে আমাদের বাবা-মায়েরাও বাচ্চাদের নিয়ে বাগানে এসে হাজির হতেন। মায়েরা কেউ উল-কাঁটা হাতে নিয়ে, কেউ বা নিজের হাতে তৈরি করা স্পেশাল কোনও খাবার নিয়ে আসতেন সেখানে। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে মেয়ে-বউরা আসত সদলবলে। তারপর সকলে মিলে ভাগ করে খাবার খাওয়া হত। বাবারা অল্প দূরে সবুজ ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে শুরু করতেন তাস বা ক্যারাম খেলা। একটু বড় ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে দল করে গল্পগুজব করত, আর আমরা ছোটরা পাখিদের,খরগোসের খাঁচায় ঢুকে খাবার দিতাম। এরপর শুরু হত চা-পর্ব। বাড়ির কাজের লোকেরা বড়দের চা দেওয়ার পরেই তাদের আবার বলা হত আরেক প্রস্ত চায়ের জন্য। মায়েদের মুখে শুনেছি, এই দ্বিতীয় দফা চায়ের নাম ছিল 'দু নম্বর চা'। এই চায়ে দুধ থাকত না। কিন্তু চা নিয়ে বাড়ির কারও কোনও অভিযোগ ছিল না। 'চা' বস্তুটি যে শরীরের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, সেটা বোঝাতেই বাড়ির 'কত্তামা' অর্থাৎ আমার ঠাকুমার এমনধারা আইন ছিল।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর গতকাল অবধি যে আড্ডাটি অব্যাহত, তা হল 'ভাঁড়ারের আড্ডা'। নামটি কোনও বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়, বরং বলা যায় এটি 'আড্ডা' নামক বস্তুটির স্বরচিত একটি উপাধিমাত্র।

বেশ মনে আছে, ছোট থেকেই দেখতাম, মা জেঠিমারা 'মেয়ে করে' (বাঙালি ধরনের) শাড়ি পরে পিছনে চাবির গোছা ঝুলিয়ে ঠিক দশটা বাজলেই ভাঁড়ারে নেমে যেতেন। আনাজ কাটা, পান সাজা, রান্নার তদারকির ধুয়ো তুলে অনায়াসেই এই মহিলামহল এখানে কাটাতেন অনেকটা সময়। কর্তারা ওপর থেকে হাঁক পাড়লে নিতান্ত বিরক্তিভরে জানাতেন যে তাঁরা বিশেষ কাজে ব্যস্ত, ওপরে যাওয়ার সময় নেই। খুদে সাক্ষী আমরাই অর্থাৎ বাড়ির ছেলেমেয়েরাই একমাত্র জানতাম এই 'সময় না থাকার' আসল রহস্যটা কি।

সে যেন চাঁদের হাট। বাড়ির বউ, ছেলে, মেয়ে, কাজের লোক, রান্নার বামুন, নাপিত বউ, কখনও বা ঘটকমশাই— সকলে মিলে সে কী গভীর আড্ডা।

পরচর্চার ককটেলে মাঝে মাঝেই থাকত রসগোল্লার কিক্ (নতুন গুজব)। এরপর গিন্নিরা যখন রসেবশে বেলা বারোটা-একটা নাগাদ ওপরে উঠে যেতেন, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁদের মনমেজাজ থাকত বাতাসের মতো হালকা ফুরফুরে। কত্তারা খুশ, পরিবারও আইসক্রিমের মতো ঠান্ডা।

আমরা, বাড়ির ছেলেমেয়েরা সাধারণত আড্ডা মারতাম সন্ধেবেলায়। পড়াশুনা সেরে সে আড্ডার সীমিত সময় ছিল মোটে এক ঘণ্টা। পড়াশুনার চাপে একটু বড় যারা, তারা অর্ধেকদিনই আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে পারত না। ছোটরা, মানে আমরা, ওই একঘণ্টা খেলাধুলাই করতাম বেশি। এই আড্ডার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা থাকত না,গাড়িবারান্দা, ছাদ বা ঠাকুরদালানে আড্ডা মারতাম। ওই সীমিত সময়েই আমরা ছোটরা ঠিক করলাম সকলে মিলে নাটক করব।

সে বছর আমাদের বাড়িতে পুজোর পালা ছিল। বড়দের অনুমতি নিয়ে তাঁদেরও শামিল করলাম নাটকে। প্রায় সকলেই অংশ নিয়েছিল এই নাটকে। 'ভাড়াটে চাই' নাটকটিতে এমনিতেই কুশীলবের অভাব ছিল না, কিন্তু 'আমাদের কুশীলব' তো ততোধিক। তাই নির্দেশকের অনুমতি নিয়ে ঢোকানো হয়েছিল কাল্পনিক কিছু চরিত্র।

"সত্যি সে সব দিন যদি আবার ফিরে আসত!" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা, লাহাবাড়ির ছোট ছেলে প্রয়াত অজিত লাহার সহধর্মিণী ভারতী লাহা। সবে বধূ হয়ে এসেছিলেন লাহাবাড়িতে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনওই একা বোধ করেননি ইনি। আমার বাবা ছিলেন বরাবরই রসিক প্রকৃতির, ওঁদের ঘরেতেই তাই অধিকাংশ বসত আড্ডা। বিশেষত কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে আড্ডা যে সমানতালে চলত তা বলাই বাহুল্য।

এই তো সেদিন, বাড়ির সেজতরফের একমাত্র ছেলে অলক লাহা হঠাৎই এক আড্ডায় তাঁর মা পদ্মরানি লাহার উৎসাহে ঠিক করে ফেললেন লাহাবাড়ির উৎস, বংশলতিকা, সুকৃতি, পুজো বিষয়ে একটা আস্ত বই লিখবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। 'লাহাপরিবারের কথা' (উৎসব প্রকাশনা) বইটি প্রকাশ পেল ২০০৫-এর বইমেলায়। প্রকাশ করেলন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

লাহাবাড়ির আড্ডা নিয়ে গল্প করতে করতে কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল, চমক ভাঙল শাঁখের আওয়াজে। কাল মহাষষ্ঠী। লোকজনের ইতিমধ্যেই আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। চা-পর্ব সেরে ঘরের দিকে পা বাড়তেই কানে ভেসে

এল মহিলাকণ্ঠের কলরব। অভ্যস্ত চোখে তাকালাম ভেতরবাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে নীচে। মায়েদের ভাঁড়ার ঘর— মা, দিদি, কাকিমা, জেঠিমা, বোন, বউদিরা সদলবলে হাজির গন্তব্যে। উপলক্ষ পুজোর আনাজ, ফলমূল ইত্যাদি কাটা। কিছুদিন আগেই আমার মেজজেঠিমা পদ্মরানি প্রয়াত হয়েছেন। এত হই চই-এর মধ্যে ওঁর অনুপস্থিতি মনকে বিষাদগ্রস্থ করে তুলল। এতে কালের অমোঘ নিয়ম। একে লঙ্ঘন করে কার সাধ্য। মনকে সান্ত্বনা দিলাম আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম এ পরিবারের সদস্য হতে পারার জন্য।

'সুখে থাকা' এই ছোট্ট দুটি শব্দের মূল চাবিকাঠি কি নির্মল বন্ধুত্ব, আড্ডা? এই 'আড্ডা'র অভাবেই কি ভেঙে যাচ্ছে একের পর এক যৌথপরিবার? নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হয়ে যাচ্ছে অবসাদ আর হতাশার শিকার? হয়তো না, কিংবা হ্যাঁ-ই। সঠিক উত্তরের আশায় রইলাম আগামী প্রজন্মের কাছে।



জয়দেবের মেলায় কবিদের মৌতাত

উত্তর বিশ্বাস

১৯৮৫-৮৬, বর্ধমান ইউনির্ভসিটির গোলাপবাগ ক্যাম্পাস। চায়ের আড্ডায় সুররিয়ালিস্টিক জীবনানন্দ। আড্ডার তুফানে ভেসে যাচ্ছে অদিতি-দেবযানী-অরুণিমা সান্যালের মুখ। ওই সময়ে পৌষসংক্রান্তির দু'দিন আগে কেন্দুলি জয়দেব থেকে 'জয়গুরু, জয়গুরু' সম্বোধনে একটি হলুদ কাগজে আমন্ত্রণপত্র এল। পাঠিয়েছেন বেণীমাধব দাস বাউল, কবি মানস ভাণ্ডারী ও তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশে। বাউলমেলার আমন্ত্রণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যর মতো আমি আর পবন সাহা বাসের মাথায় উঠে সোজা হেতমপুর। ওই হেতমপুরে রাজবাড়ির পাশেই মানস ভাণ্ডারীর বাড়ি। আটচালা মাটির ঘরে লণ্ঠনের আলোয় 'বজ্র-বিদ্যুতের মতো ঢুকে গেল কবি বিনয় মজুমদার:

বৃষ্টির দেবতা আমি এ জীবনে যত বৃষ্টিপাত
করেছি সেসব কথা মনে পড়ে, ফলে বেঁচে আছি।
বৃষ্টিপতনের কথা কোনোদিন গোপন থাকে না।'

যাচ্ছি বাউল-ফকিরের মেলায়, তার আগের সন্ধ্যায় তুমুল কবিতার আড্ডা। পরের দিন সাতসকালে লক্ষ মানুষের ভিড়ে কেন্দুলি। তিনজনের দলে ঝড়ের মতো ঢুকে মাখনের মতো লেপটে গেল লিকলিকে চেহারার তেজি ঘোড়া কবি লিয়াকত আলি। তার সান্নিধ্যেই কেন্দুলি মেলার চৌষট্টি গলিতে দু'দিন কাটানো। তারপর বাইশ বছর লিয়াকতের সঙ্গে দেখা নেই। অকস্মাৎ এই বসন্তের এক নিদাঘ দুপুরে হাতে পেয়ে যাই লিয়াকতের মোবাইল নম্বর। কথাপ্রসঙ্গে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে ভাসে। ২০০৮-এর কেন্দুলি মেলায় আমরা দুজনেই 'মনের মানুষ' আখড়ায় কাটিয়েছি পবন দাস, সাধন দাস বৈরাগ্য, দীনদয়ালের আড্ডায়, অথচ কেউ কাউকে চিনতে পারিনি। চৌদ্দভুবনের কেন্দুলির এ-ও এক বিস্ময়! বিস্ময়ের স্মৃতিযানে ধরা পড়ল বাউল-ফকির মেলার অন্য এক বৈভব। সেখানে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা দীর্ঘকাল ধরে কেন্দুলিমেলায় বাউলসঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, তৈরি হয়েছে বোহেমিয়ান আড্ডার আলো-আঁধারি মাখা পৃথক ভুবন। সেই ভুবনের বাসিন্দা কারা? কীভাবে, কেনই বা, কোন আনন্দের আকর্ষণে তাঁরা বাউলের অন্ধ গলিতে সৃষ্টির সুরা পান করেন? এসব প্রশ্নের উৎসেই আছে সম্ভবত সেই পুরুষ, কবি ও প্রেমিক 'গীতগোবিন্দম্'-এর স্রষ্টা জয়দেব। কবি জয়দেবই কি সেই হাজার বছর আগে কবিতা-সঙ্গীত আর প্রেমের ঐশ্বর্য, ছড়িয়ে রেখেছেন কেন্দুলির আকাশ-বাতাস, অজয়তীরবর্তী লাল মাটির ধূলিকণায়! নইলে বাংলা তথা ভারতের আর কোনও ধর্মাশ্রিত লোকায়ত গ্রামীণ মেলায় এতসংখ্যক কবি-সাহিত্যিকদের ধারাবাহিকভাবে আড্ডার নোঙর ফেলতে দেখা যায় না।

জয়দেব-পদ্মাবতীর প্রেমের আকুল আর্তিতে লুকিয়ে আছে বাউল ও বাউলগানের মোহময় ভাবমাধুর্য। ফলে কাব্যসৃষ্টি ও আড্ডার নির্ভেজাল আনন্দের শ্রীক্ষেত্র হিসেবে কবি-শিল্পী—সাহিত্যিকদের কাছে কেন্দুলি গভীরভাবে আকর্ষণীয়। নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষের জবানিতে সেই সব আড্ডার দিকগুলি আলোচনা যেতে পারে।

বাউল-ফকির-সন্ত-সাধুদের প্রাচীন এই মেলায় বাংলাভাষার কবি-সাহিত্যিকদের আনাগোনা বহুকালের। রবীন্দ্রস্নেহধন্য শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের কাছে আমি এক সন্ধ্যায় শুনেছিলাম 'রবীন্দ্রনাথ একবার কেন্দুলিমেলায় যেতে গিয়েও ফিরে এসেছিলেন, কেননা তাঁকে কোনওভাবেই আকর্ষণ করেনি, ন্যাড়ানেড়ির কাণ্ডকারখানা বলে।'

রবীন্দ্রনাথ যাননি, কিন্তু অনেক কবি-সাহিত্যিক-গবেষক কেন্দুলিমেলায় শুধু গিয়েছেন বললে ভুল বলা হয়, রীতিমতো তাঁবু ফেলে আড্ডা দিয়েছেন। যেমন, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কিংবা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের ভাণ্ড পূর্ণ করেছেন। তেমনই পরবর্তিকালে অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, বিকাশ চক্রবর্তী এবং বিশেষভাবে বলতেই হয় বাউলগবেষক শক্তিনাথ ঝায়ের কথা। আরও অনেক বাউলপ্রেমী-গবেষক আখড়ায় দলবদ্ধ আড্ডায় বাউলের সঙ্গে থেকে বাউলতত্ত্বের মুক্তো খুঁজেছেন।

নিজের দলবল নিয়ে একসময় নোঙর ফেলেছিলেন ভ্রমণকাহিনির লেখক শঙ্কু মহারাজ। দীর্ঘকাল ছাত্রদের নিয়ে বাউলআড্ডায় মেতেছিলেন ডঃ সুধীর করণ। গবেষণা ঘরাণার বাইরের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং সেই শেকড় আরও গভীরে। বাউল মৌতাতে তাঁরা প্রকৃতই ফকির হয়ে ফিরতেন বাড়িতে। এঁদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক সমরেশ বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত দু-একবারের বেশি আকর্ষণ বোধ করেননি। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাড়-কাঁপানো শীতে বাউলের আড্ডায় মত্ত হয়ে স্নানে যেতেন নদীতে, সেখান থেকে তুলে আনতে বন্ধুদের কালঘাম ছুটে যেত। শক্তিই পানাগড় থেকে ইলামবাজার হয়ে কেন্দুলিতে আসার পথে নাকি আবিষ্কার করেছিলেন চিকরবেতা গ্রাম। সেখানে জোড়া-মদের দোকানের সন্নিকটে বসত কবিদের আড্ডা, মদ খেয়ে মাতাল হতেন, মাতাল হয়ে কবিতা শোনাতেন 'আমি স্বেচ্ছাচারী'। পরের দিন কেন্দুলি গিয়ে নতুন করে বসত আড্ডা। যতদিন ভাঁড়ারে পানীয় থাকত, ততদিন আড্ডা চলত। তাঁকে ঘিরে অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখক, কবিরা মেতে উঠতেন। কোনও কোনও মধ্যরাতের বাউল-আড্ডায় মত্ত হয়ে ল্যাংচা আর দৈত্যভোগ ছোঁড়াছুঁড়ি হত। ফিরতি পথে শক্তি শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর জঙ্গলে কাটিয়ে যখন কলকাতায় ফিরতেন তখন কলম দিয়ে বেরুতো তুখোড় সব অনবদ্য পদ্য।

ঠিক ওই সময়ে জয়দেবের মেলার অন্যতম ঠেক 'চিত্রবাণী'র ব্যানারে। সে এক গ্রেট টিম। তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিদগ্ধব্যক্তিত্বসম্পন্ন দীপক মজুমদার, শিল্পী হিরণ মিত্র, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনেত্রা ঘটক এবং অবশ্যই আজকের বাংলা ব্যান্ডের আদি কারিগর 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এখন বিশ্বনাথ দাস বাউল, সুবল গোঁসাই ও গৌরখ্যাপাদের শরীরে-কণ্ঠে বাঁধভাঙা উন্মাদনা। দীপক মজুমদার ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রথম গৌরখ্যাপাকে মেট্রোপলিটান কলকাতায় দাপাতে এনেছিলেন। যৌবনের

গৌরখ্যাপাকে নিয়ে এঁরা মাতিয়ে রাখতেন কেন্দুলির আড্ডা। এমনও শোনা যায় গৌরখ্যাপা ও দীপক মজুমদার ছিলেন হরিহরআত্মা, কিন্তু আড্ডায় মাঝে মাঝে এমন ফাইটিং হত যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তবে সে সাময়িক। কিছুক্ষণ পরে দু'জনেই স্বমহিমায় ফিরতেন। মেলার সময় এঁরা অনেকে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন। আড্ডা বসাতেন সুধীরবাবার আশ্রম তমালতলায়। এইসব আখড়ায় মজাদার সাহিত্যরসিক লেখক মতি মুখোপাধ্যায় এবং তারাপদ রায়কে দেখা যেত। তারাপদ রায় খুব বেশি মাখামাখিতে মেতে উঠতেন না। সন্ধ্যাতেই শান্তিনিকেতনে ফিরতেন। একবার শুধু কবি দীপ মুখোপাধ্যায়কে সারারাত পুলিশ নিয়ে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরেছিলেন।

ইতিমধ্যে কেন্দুলির সাহিত্যআড্ডায় রাজকীয় অভিষেক ঘটিয়েছেন কবি অমিত গুপ্ত। 'শকুন্তলা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে অমিত গুপ্ত নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। কেন্দুলি মেলা ঘিরেই 'শকুন্তলা' পত্রিকার সৃজন ও বাড়-বাড়ন্ত। বাউল কবিতা ও বাউল বিষয়ক নানা সমালোচনা-প্রবন্ধ-সাক্ষাৎকার ছাপা হত। তার থেকেও বেশি আকর্ষণীয় অমিত গুপ্তকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবি ও বাউলদের নতুন ঠেক, নতুন ঘরানার আড্ডা। বাউলের কেন্দুলি প্রাঙ্গণে অমিত গুপ্ত ছিলেন এক অরিজিন্যাল আড্ডাড়ু। একবার যে তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে-ই তাঁর স্যাঙাত। বাউলগান আর কবিতার এমন যুগলবন্দি আড্ডা আর কারও সেভাবে স্থায়ী হয়নি। দীপ মুখোপাধ্যায়, শৌভিক চক্রবর্তী, রঞ্জন ঘোষাল, ভাস্কর ভট্টাচার্য ও আরও অসংখ্য বাউলপ্রেমী ঠেকবাজ বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পী। এঁদের মধ্যে দীপ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক মিশুকে এবং অন্তরঙ্গ। তরুণ কবিদের বুকের ভেতরে আগলে রাখতেন। প্রাচীন বাউলদের কোথা থেকে ধরে আনতেন। মাটির হাঁড়িতে গুছিয়ে রান্না করতেন পূর্ণদাস বাউলের দিদি রাধারানি। দীপ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শকুন্তলা-র পক্ষে 'ষোড়শী শকুন্তলা' কবিতা সংকলন প্রকাশ পায়।

অমিত গুপ্ত অথবা শকুন্তলা-র আড্ডার দুটো অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। মেলায় রাত্রি দশটার অমিত গুপ্ত। সাদা ট্রাউজার আর বাটিক প্রিন্টের পাঞ্জাবি, বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের ওপরে দামি শাল। সুস্বাস্থ্য, দীঘল চোখের মানুষটার আকণ্ঠ পানীয়। অনেকের সঙ্গে আমি, মানস ভাণ্ডারী, পবন সাহা এবং লিয়াকত। মেলার ভিড় ঠেলে আখড়া পরিক্রমা। হঠাৎ দেখি দীপ্ত, তেজি মানুষটা ক্রমশ নুয়ে পড়ছেন, ক্রমে হামাগুড়ি দিচ্ছেন অমিতদা। বেদনার বটের তলায় 'অন্ধের

একতারা' খোঁজার মতো কী যেন হাতড়াতে হাতড়াতে ধুলোতেই শুয়ে পড়লেন। শেষ আড্ডা একেবারে নিভৃত। ভবাপাগলার আশ্রমের পিছন দিকে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর ভাড়া করে বসে আছেন। খড়ের শতরঞ্চি পাতা। খড়ের পিছনে সাজানো বোতল। শিবশঙ্কর পাশে বসে আছে। কোণে মাটির হাঁড়িতে আলু-মাছের তরকারি, ঠিক মাংসের মতো। আমি যেতেই জড়িয়ে ধরলেন। শিবশঙ্করকে বললেন, "উত্তরকে অমৃত দাও"। আমি আমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমি তো অবাক, অমিতদার দু'চোখে বৃষ্টির ধারা। বাবা সম্বোধনে, ভালোবাসায় আকুতি। সেদিন সেই নিভৃত সন্ধ্যায় দীপ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। আর কীভাবে যেন হাজির হয়েছিলেন নদিয়া-মুর্শিদাবাদের জিন্দা ফকির। ফকির শুনিয়েছিলেন— 'কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইয়ের কুদরতি/ অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে একটা রূপের বাতি।'

কেন্দুলিতে আর দেখা হয়নি অমিতদার সঙ্গে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বোলপুর শুঁড়িপাড়ায় বিশ্বনাথ দাসের বাড়িতে একরাত কাটিয়েছিলাম। সে দিন টের পেয়েছিলাম বাউলের প্রকৃত এক বন্ধু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নাগালের বাইরে।

অমিত গুপ্তকে কেন্দ্র করে যেমন একটা বড় ধরনের সাহিত্য-আড্ডা গড়ে উঠেছিল, তেমনই আরও ছোটবড় বৃত্ত বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে জয়দেবের মেলায়। অনেক সময় বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েও আড্ডা চলত তিন-চার দিন মকরসংক্রান্তিতে ওই বাউলমেলায়। একসময় কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, মলয় সিংহ, ব্রত চক্রবর্তী, সুব্রত রুদ্ররা তাঁবু ফেলতেন হালাখ্যাপা বাবার আশ্রমে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বিভিন্ন বাউল আশ্রমে বাউলদের সঙ্গে ডেরা তৈরি হত শহর ও গ্রামীণ কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। যেমন ভবাপাগলার আশ্রম এবং বিশেষ করে বেণীমাধবের আশ্রমে। আটের দশকের শেষ এবং নয়ের দশকে পার্থপ্রতিম নন্দী, বরুণ দেব, শঙ্কর ব্রহ্ম, বিপুল চক্রবর্তী, তনুশ্রী চক্রবর্তী, শৌভিক চক্রবর্তী এবং উৎপলকে এই সব আশ্রমে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যেত। স্থানীয় রাধাশ্যাম দাসের বাড়িতেও বসত গান ও কবিতার আড্ডা। উৎপল তো ফকিরি মতে দীক্ষাও নিয়ে ফেললেন। গানের সঙ্গে কবিতা নির্মাণে 'ইচ্ছাক্ষ্যাপার আয়নামহলে' আবিষ্কার করলেন সহজ-মাকে।

এলিট কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডার স্থায়ী আখড়া যেমন সুধীরবাবার তমালতলার আশ্রম, তেমনই বেণীমাধব তাঁর আখড়ায় আরেকটি আড্ডামহল

গড়ে তুলেছিলেন। কবি সাহিত্যিকদের বিশেষ পুরস্কারে প্রতিবছর সম্মানিত করতেন। কয়েক বছর আগে বেণীমাধব দেহ রেখেছেন, তথাপি আড্ডার আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে-মধ্যে বেণীমাধব চলে আসবেন অনিবার্যভাবে।

অনিবার্যভাবে জয়দেবমেলার সাহিত্য-আড্ডার আরও অসংখ্য বাউলপ্রেমী বাউণ্ডুলে মানুষ এসে যাবেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কবি অরুণ চক্রবর্তী, লিয়াকত আলি, আশানন্দন চট্টরাজ, অরুণ চক্রবর্তীর কেন্দ্রস্থল মূলত তমালতলা। পদ্মাসনে লাল পোশাক আর চুলদাড়ির বাউলীয় বিন্যাসে প্রকৃতই বাউলকবি। 'বাউলের বাগানবাড়ি' অরুণদার বিখ্যাত কবিতা। অরুণদাকে ঘিরে গৌতম চৌধুরী, দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি জহর সেনগুপ্ত, প্রশান্ত রায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ-ইউনিভার্সিটির তরুণ কবি-গবেষক-ছাত্রছাত্রীরা অরুণদার নিষ্ঠভক্ত। ওই তমালতলায় সারারাত পার্শ্বমঞ্চ গড়ে উঠত টগরগাছের নীচে। একবার গৌরখ্যাপা-পবন দাস বাউলের সে কী ঝগড়া! অরুণদার মধ্যস্থতায় গানের পাল্লাতে স্বর্গীয় আনন্দধারা বইলো তমালতলায়। তাঁর তারুণ্যের ঠেক এখনও প্রোজ্জ্বলমান। এখনও বাউলদের চুমো খান, পাকেট থেকে লজেন্স বের করে তরুণ কবিদের কাছে টেনে নেন বাউলীয় অন্তরঙ্গতায়। আর আশানন্দন চট্টরাজ লোকায়ত জীবনের এক আস্ত বীরভূম। ঘাড়ে ঢাউস ব্যাগ, প্রাচীন কম্বল ভাঁজ করে কাঁধে ফেলে চলেছেন বাউলের মেলায়। পরিচিত মুখ দেখলেই গায়ে হাত দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা। ব্যাগে থাকে ম্যাগাজিন এবং স্বরচিত গানের পুরোনো খাতা। সদাহাস্য এই নির্ভেজাল বাউলপ্রেমিক কবে থেকে কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলায় নোঙর ফেলেছেন তা আমার অজানা, তবে দেখেছি তাঁর লেখা সেই 'বড়লোকের বিটি লো' কিংবা 'ও ননদি আর দু'মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে'...যা স্বপ্না চক্রবর্তী গেয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, সেই সময় থেকে।

সত্তরের দশক থেকে লিয়াকতের কাঁধে ঝোলা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিত গুপ্ত থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের কবি, সাহিত্যিক, বাউল-ফকিরদের সান্নিধ্যেই তাঁর সাধুসঙ্গ। দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মুজিবর রহমান কিংবা কুমুদকিঙ্কর—সকলের সঙ্গেই বিভিন্ন সময়ের মেলাপ্রাঙ্গণে আড্ডায় মজেছেন। সত্তরের ঝোলা এখন ফকিরি-ঝোলাতে রূপান্তর ঘটেছে। হেতমপুরের মানস ভাণ্ডারী, কোগ্রামের অরুণ মুখোপাধ্যায়, আসানসোলের নীলোৎপল ভট্টাচার্য একসময় লিয়াকতের সঙ্গে কেন্দুলি পরিক্রমা করেছেন কবিতার ডাকহরকরার মতো। এই সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বন্ধুত্বের বেড়াজালে জড়িয়ে নিতেন সন্তু সেনগুপ্তের সঙ্গে আদিত্য

মুখোপাধ্যায়কে। তাঁদের ঝোলায় থাকত জয়দেবমেলা উপলক্ষে 'দিদিভাই' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। মেলা উপলক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা পাঠ ও আড্ডার স্থায়ী পীঠস্থান 'হরিদাস আশ্রম'। 'চণ্ডীদাস' পত্রিকার পক্ষে কুমুদকিঙ্কর অনুষ্ঠানের হোতা। ওখানে বীরভূমের অনেক প্রবীণ-নবীন কবিদের ভিড় জমে থাকত। লিয়াকত একবার সাংঘাতিক খেপে গিয়েছিলেন। কবিতাপাঠের পরিবর্তে বর্তমানে কবিদের গতিপ্রকৃতি আর আধুনিক কবিতার গুষ্টি উদ্ধার চলছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হঠাৎ লিয়াকত মাইক ভেঙে মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ড ঘাড়ে করে দিল দৌড়। সে কী কাণ্ড! উঃ, ভাবাই যায় না। লিয়াকতের সঙ্গ নিয়ে এসেছিলেন দুবরাজপুরের বাবলু আর 'মানসলোক' পত্রিকার সম্পাদক-নাট্যকার অনুপম দত্ত। অনুপম এতটাই বাউলে মজলেন যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে চর্যাপদের কবিদের মতো সঙ্গিনী নিয়ে নির্জনে চলে গেলেন সাধনভজনের জন্য। কুমুদকিঙ্করের সঙ্গে বীরভূম সাহিত্য পরিষদের একটা মেলবন্ধন ছিল। পরিষদ 'বীরভূমিক' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে। এ বিষয়ে ডঃ কিশোরীরঞ্জন দাস এবং কৃষ্ণনাথ মল্লিকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কুমুদকিঙ্করের মৃত্যুর পর 'চণ্ডীদাস' পত্রিকার সম্পাদক এখন আল আফতাব। সুভাষ কবিরাজ 'জয়দেববার্তা' নামে একটি কাগজ প্রকাশ করেন। 'স্বপ্ননীড়' পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়। আনারুল হক, রঞ্জিত ঘোষ— সকলেই এই সব পত্রিকাবৃত্তে মেলার ক'দিন সাহিত্য আড্ডায় প্রাঙ্গণ মাতিয়ে রাখেন। মত্ততার মধ্যেই গানে-ভাবে- অনুরাগে তৈরি হয় সাহিত্যের বিচিত্রসম্ভার।

জয়দেব কেন্দুলির বাউলবৃত্তে গ্রামীণ ও নাগরিক কবি সাহিত্যিকরা যেমন প্রাণের আকর্ষণে যুক্ত হয়েছেন তেমনই বাংলার বিশিষ্ট বাউলদের সঙ্গে অনুরাগী ভক্তবেশে যুক্ত হয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ। কেউ সাহিত্যিক, কেউ কবি-গবেষক কেউ গায়ক, কেউ মিউজিশিয়ান। পূর্ণদাস, লক্ষ্মণ দাস, কখনও সনাতন দাস, হরিপদ গোঁসাই, কখনও সুবল দাস, বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে অনুরাগী বিদেশি-বিদেশিনিরা আসর জমিয়েছেন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বাউলমেলায়।

একদা ফিল্মমেকার জর্জ লুনো এসেছিলেন, এসেছিলেন নাটকের কর্মশালার জন্য গ্রোটাস্কি, ইউজোনিয়া বাবা। তাঁদেরই অনুসারী হয়ে বেশ কিছুকাল ধারাবাহিকভাবে তাঁবু ফেলেছিলেন অবনী বিশ্বাস এবং তাঁর স্ত্রী ইলিয়ানোরা, সঙ্গে খোলবাদক পাখি ও প্যাট্রিসিয়া। ভাস্কর ভট্টাচার্য ও রঞ্জন ঘোষাল এক সময় ছিলেন সেই বৃত্তে। বিশ্বনাথ বাউল এবং তাঁর যোগ্য সন্তান আনন্দর সঙ্গে কেন্দুলির

আড্ডায় সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন বহু বিদেশি ও বিদেশিনিরা। তাদের নীলচক্ষু মায়াবি সঙ্গতায় মেলার বিভিন্ন আখড়ায় যে আড্ডা চলত সেখানে তাদের সঙ্গে বেশ কিছু কবি, সাহিত্যিকের মেলবন্ধন হত।

আশির দশকের শেষে, আমি তখন শান্তিনিকেতনে। ওখানে আমাদের একটা সাহিত্য-আড্ডা ছিল, চিনাভবনের সামনে ছাতার তলায়। পৌষমেলা শেষ হলে বাউলদের মতোই জয়দেবের মেলায় যাওয়ার জন্য আমাদের তোড়জোড় চলত। অহনা বিশ্বাস, সজল দে, কচ সান্যাল, বিবেকানন্দ সাঁতরা, মনীষা-ভাস্বতী, সুবীর-প্রণয়, মলয় পাত্র ওরফে অনিকেত এবং দীপাঞ্জনা রুজ। বাউলের মতোই চাদর কম্বল পুঁটুলি করে বেরিয়ে পড়তাম। এলোমেলোভাবে মেলায় পৌঁছে কীভাবে যেন হারিয়ে যেতাম। পরে ওই তমালতলা। কচ তখন 'অমলতাস' নামে একটি কাগজ সম্পাদনা করছে। অহনা, মনীষা বের করছে 'সাহিত্যবিতান'। সকলের ঝোলায় সেই সব কবিতার কাগজ। মনে আছে তমালতলায় তখন তরলে-হাওয়া ম-ম করছে। খড়ের চাতালে বাউলের গান ক্রমে নিভে এল এক সময়। টগর-জবা-বকুলের তলায় শহুরে যুবক-যুবতীর ঠেক। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক জায়গায় আড়ংঘাটার কৃষ্ণদাস, ধূপগুড়ির কালাচাঁদ দরবেশ, বোলপুরের নিমাইচাঁদ। গান . আর কবিতার আড্ডায় সকলের চোখে তখন ভিন্ন নেশা। নিমাইয়ের দোতারার সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচছে ইউনিভার্সিটির মেয়েরা। দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেশাড়ু কণ্ঠে অসাধারণ জীবনানন্দ— মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেল/ মুখে যা বলোনি, নারী, মনে ভেবেছো তার প্রতি/ লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো/ দেহ হবে মন হবে —তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।' গুম মেরে ঠিক সিদ্ধপুরুষের মতো বসে আছেন অরুণ চক্রবর্তী। তাঁকে টলাতে পারছে না কেউ। হঠাৎ তিনি চোখ তুললেন, মহাদেবের গাম্ভীর্য নিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'যতই ঢালো দুধ গঙ্গাজল/ শিবলিঙ্গ কাত হয় না কখনও—বুঝলে বুড়ো।' সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা। ওই আড্ডায় দীপাঞ্জনা 'ঘরামির ঘর বাঁধা' নিয়ে লালনের একটি অসাধারণ গান করেছিল। তমালতলার সেই দৃশ্য আজও দু'চোখের ক্যানভাসে লেগে আছে। ভোর হতেই রাতজাগা ক্লান্তি নিয়ে শরণার্থীর মতো সকলে শান্তিনিকেতনে ফিরত। আমি আরও দু'রাত আখড়ায় আখড়ায়। কখনও কদম্বখণ্ডীর শিয়ালাই আখড়ায়, কখনও নিত্যানন্দ-ষষ্ঠীখ্যাপাদের সঙ্গে দুর্গাপুর প্যান্ডেল কিংবা ব্রহ্মকূপে মাকি-সাধনদাস বৈরাগ্যের আনন্দলহরীর মজলিশে।

সময়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে কেন্দুলিমেলার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেড়েছে। নাগা, হাফ-নাগা সন্ন্যাসী প্রায় দুর্লভ হলেও বেড়েছে কীর্তনের আসর। বাউল-ফকির-সুফি-চিস্তিয়া সাধুসন্তদের ভিড়ে বেড়েছে স্থায়ী-অস্থায়ী আশ্রম আখড়া। আড্ডাবাজ কবি, শিল্পীদেরও গড়ে উঠেছে নতুন ঠেক। বর্তমানের অভিসারে কবি-শিল্পী-গবেষকদের নতুন ঠেক 'মনের মানুষ'। গ্রামের প্রান্তে অজয়ের পাড়ে বাঁধসংলগ্ন শিশু, শিরীষ, পলাশ, আকাশমণির সবুজঘন মায়াবি অঙ্গন। সেই অঙ্গনের কেন্দ্রবিন্দুতে সাধন দাস-মাকি কাজুমি।

যে সব কবি ও গবেষক সত্তরের দশকে কেন্দুলিতে আসতেন উন্মাদের মতো, আজ তাঁরা অনেকেই পঁচিশ বছর পর 'মনের মানুষ'-এর আড্ডায়।

গত বছরে এখানে জমে উঠেছিল দারুণ আড্ডা। তার কিছুটা উল্লেখ না করে পারছি না। কুঠিয়ার ভিতরে বসে আছি, আমার সঙ্গে তরুণ পরিব্রাজক প্রীতম মিশ্র। হঠাও দরজা ফাঁক করে এক বাউলানি চিকণ কণ্ঠে বললেন, "খ্যাপাবাবার ওখানে একটু সাধুসঙ্গ হবে, চলুন।" বাউলানির ঘোমটা খুলে দেখি নিত্যানন্দ, সখীভাব নিয়ে এই কম্ম করে বেড়াচ্ছে। সে এক রগড়!

সেই সন্ধ্যায় অনেক কিছুই প্রাপ্তি হয়েছিল, তথাপি বিশেষভাবে উল্লেখ্য বহুদিন পর পবনের রোমান্টিক কণ্ঠে 'ওই যে আমার দেহমাঝে/ কোন চন্দ্র কোথায় বিরাজে' আর খ্যাপাবাবার সঙ্গে তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ সহজিয়া কবি মিরালেপার ও চৈতন্যদেব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য-তত্ত্বের বস্তুবাদী মূল্যায়ন। সান্ধ্যকালীন সেই আড্ডার ভিড়ে সম্ভবত লিয়াকত ছিলেন। বাইশ বছর পরে তাকে আমি চিনতেই পারিনি।

'মনের মানুষ'-এর আড্ডা ক্রমশ এমন মরমীভাবে দানা বাঁধছে হয়তো নবীন-প্রবীণ বাউল-আউলের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-গবেষকদের নতুন ঠিকানা তৈরি হবে। বহুকাল পরে হয়তো এখানেই পেয়ে যাব পুরনো দিনের দীপ মুখোপাধ্যায়, লিয়াকত আলি, লীনা চাকী, উৎপল ফকিরদের মতো দিলদরিয়া কবি-সাহিত্যিক-গবেষকদের। তাঁদের অনবদ্য বাউল সাহিত্যের অক্ষরলিপি পড়ে খুঁজতে আসবে নতুন প্রজন্মের উনিশ-কুড়ির অনুজ আর ডিএক্স-রা। তাদের নতুন ঘরানার নিবিড় আড্ডায় কেন্দুলি মেতে উঠবে নেশাড়ুর মতো। এভাবেই জয়দেব-কেন্দুলির সাহিত্যআড্ডার ঐতিহাসিক পরম্পরা প্রবহমান থাকবে, উন্মোচিত হবে সাহিত্য ও শিল্পের সহজিয়া দিগন্ত।



গ্রামজীবনের বহুমুখী আড্ডা

লোকেশচন্দ্র বিশ্বাস

গ্রাম্য জীবন খুবই সাদামাটা ও নিস্তরঙ্গ। গ্রামের মানুষ যেন নেই-রাজ্যের অধিবাসী। এখানে নেই ভালো শিক্ষাব্যবস্থা, নেই তেমন কোনও স্বাস্থ্যপরিষেবা, নেই বিনোদনের আধুনিক ব্যবস্থা, নেই রোজগারের স্থায়ী ব্যবস্থা। এই এতো নেই-এর মধ্যে গ্রামের মানুষদের যা আছে তা হল, প্রাণপ্রাচুর্য। আর সেই প্রাচুর্যের উৎস হল 'গ্রামীণ আড্ডা'।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। এই পরিবর্তনের হাওয়া লাগার আগে গ্রামের পুরুষদের আড্ডা বসত চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে। সেই চণ্ডীমণ্ডপের বর্ণনা পাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসে।

রাঢ়ের গ্রামীণ সমাজে চণ্ডীমণ্ডপের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু, ভাগীরথীর পূর্বপারের মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতে চণ্ডীমণ্ডপের চেয়ে গৃহস্থের বৈঠকখানার গুরুত্ব অনেক বেশি। গ্রামের বেশির ভাগ স্বচ্ছল গৃহস্থের নিজস্ব চাষাবাদ ছিল। ফলে বাড়িতে চাষ ও গোরু-মহিষ দেখাশোনা করার জন্য রাখাল-কিষাণ থাকত। এইজন্য

প্রতিটি গৃহস্থের মূল বাড়িসংলগ্ন বা বাড়ির সামনের অংশে গোয়াল ও বৈঠকখানা করা হত। সেই সব বৈঠকখানায় বিভিন্ন বয়সী মানুষের আড্ডা বসত। কোনওটায় বয়স্কদের, কোনওটায় যুবকদের আড্ডা, কোনওটায় চলত কৃষ্ণযাত্রা, আলকাপ বা বোলানের শখের যাত্রার রিহার্সাল। সেখানেও আড্ডা হত। সেইসব আড্ডা প্রায় প্রতিদিন বসত, চলত রাত ন'টা বা দশটা পর্যন্ত।

বর্তমানে কৃষিতে উন্নত ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং যন্ত্র এসেছে। ফলে সনাতন কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন হওয়ায় এবং অপরদিকে যৌথপরিবার ভেঙে পড়ায় 'বৈঠকখানা' সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় এসেছে 'মাচা' বা 'মাচান'-সংস্কৃতি।

পাড়ার রাস্তার মোড়ে বা রাস্তার ধারের গাছতলায় বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করা হয়। এই মাচায় সকাল থেকে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ আড্ডায় বসে। সকালের দিকে সেখানে নানা রকম বিষয় আলোচনা হয়। তার মধ্যে চাষাবাদ সংক্রান্ত কথাই বেশি হয়। মোটামুটি সকাল আটটার সময় গ্রামের লোকজন বিভিন্ন কাজে বের হয়ে যায়, তখন পাড়ার বৃদ্ধরা মাচায় বসে আড্ডা দেন। এই আড্ডায় তাঁরা স্মৃতি রোমন্থনই বেশি করেন। তাছাড়া ধর্মকথা, পরনিন্দা, পরচর্চাও থাকে। দুপুরে স্নান, খাওয়াদাওয়ার পর পাড়ার বৃদ্ধরা আবার মাচায় ফিরে আসেন, গল্পগুজবের সঙ্গে বিশ্রামও হয়। গ্রামের মধ্যবয়স্ক ও যুবকরা মাঠ বা কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে বিকেলে মাচায় আড্ডা দিতে বসে।

কার কি হল, কার গোরু-মহিষ কেমন, কার ফসল ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে, এ সবই আলোচ্য বিষয় থাকে। রাত পর্যন্ত শুধু মধ্যবয়স্ক ও তরুণরা মাচায় থাকেন।

মণ্ডপতলায় আগে যখন আড্ডা বসত, তখন সকলে হুঁকোতে তামাক খেতেন, হাতে হাতে হুঁকো ঘুরত। বড়দের সামনে ছোটরা সরাসরি তামাক খেত না. তাদের দিকে পিছন ফিরে একটু আড়াল করে হুঁকো খেত। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলত,'নচের আড়ালে হুঁকো খাওয়া'। এখন হুকো বা হুক্কার প্রচলন নেই, তাই মাচায় বসে বিড়ি খাওয়া হয়। এই মাচা সম্পর্কে একটু বিশদ বলা দরকার। কারণ, গ্রামবাংলায় আড্ডায় এই মাচার বিশেষ ভূমিকা আছে।

আগে মাচার ওপর কোনও আচ্ছাদন থাকত না। বৃষ্টিতে আড্ডা বিঘ্নিত হত। এখন প্রায় প্রতিটি মাচার উপর টিন বা পলিথিনের আচ্ছাদন দেওয়া হচ্ছে। ফলে মাচায় সারা ঋতুতেই আড্ডা চলে।

আগে মাচা ব্যবহার করা হত ফলের বাগান ও পটলখেত পাহারা দেওয়ার জন্য বা ধান ঝাড়াই করার জন্য। বৈঠকখানা অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার মাচা-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মাচা শুধু আড্ডার জায়গা নয়, এটা সকলের বিশ্রামের জায়গাও। এই মাচা-সংস্কৃতি নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, ডোমকল, লালবা গ মহকুমার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই আছে। তবে যেখানে মাচা নেই সেখানে গরুরগাড়ির উপর বসে আড্ডা চলে।

মাচার মতো আর একটি আড্ডা দেওয়ার জায়গা হল বাঁধানো বট, পাকুড় (অশ্বত্থ), বকুল বা নিমগাছতলা। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকে বট-পাকুড়ের বিয়ে দিয়ে গাছের গোড়া বাঁধিয়ে দেয়। কেউ কেউ বাবা-মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে গাছের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। বর্তমানে পঞ্চায়েতও বাঁধিয়ে দিচ্ছে। এইগুলি অবশ্যই পাড়ার মধ্যে সর্বজনের ব্যবহারস্থানের গাছ হতে হবে। ব্যক্তিমালিকানার গাছ হলে হবে না। বাঁধানো গাছের গোড়ায় সকাল-বিকেল আড্ডা বসে।

কোনও কোনও গ্রামে পুকুরের পুরোনো বাঁধানো ঘাটে পুরুষদের আড্ডার আসর বসে। মাঠে কাজের মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ও জলখাবারের সময় ছায়াযুক্ত গাছতলায় কিছুক্ষণের জন্য গল্পগুজবের আসর হয়। এই আড্ডায় সুখ-দুঃখের কথা, চাষাবাদের কথা বা নিছক হাসি-ঠাট্টায় আড্ডা মেতে ওঠে।

শস্য ঝাড়াই-বাছাই করার যন্ত্র গ্রামে-গঞ্জে আসার আগে রবিশস্য ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য ফাঁকা মাঠে এক জায়গায় অনেক কৃষিজীবী মানুষ একত্রে খামার তৈরি করত। চৈত্রমাসে মাঠে জোরে দখিনা বাতাস বয়ে চলে। গোরু ঘুরিয়ে রবিশস্য মাড়াইয়ের পর দখিনা বাতাসে এই শস্য উড়িয়ে ভুসি আলাদা করত। চাষিরা সারারাত খামারে থাকত। সেখানে কুঁড়েঘর তৈরি করত। সেই জায়গায় বসে তারা গল্পগুজব করতো বা আড্ডা দিত।

যন্ত্রচালিত আখমাড়াই কল গ্রামে আসার আগে গোরু-মহিষ দিইয়ে আখ মাড়াই করা হত। আখ মাড়াইয়ের জন্য একটা ঘেরা জায়গা থাকত, তাকে 'বান' বা 'সাল' বলা হত। সারা শীতকাল আখ মাড়াই চলত। সালে কাজের লোক ছাড়াও পাড়ার লোকেরা সন্ধেবেলায় এখানে এসে আড্ডা দিত। তবে আখের সালে মেয়েদের যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। লোকবিশ্বাস, মেয়েরা ঋতুকালীন সময়ে ওখানে গেলে সালের অমঙ্গল হয়, অর্থাৎ গুড় খারাপ হবে।

কথক ঠাকুর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কথকতার আসর বসান। এই আসরের শুরু ও শেষে শ্রোতাদের মধ্যে আড্ডা চলে। গল্প শুনতে সবাই ভালোবাসে। প্রায়

প্রতিটি গ্রামেই এক বা একাধিক রূপকথা বা কিস্‌সা বলার লোক থাকে, তারা অবসর সময়ে আশেপাশের মানুষকে গল্প শোনায়। কিন্তু বিশেষ করে ভাদ্রমাসের প্রতি রাতেরবেলায় দলবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে গল্প শুনিয়ে বেড়ায়। গল্প শুরুর আগে ও শেষে শ্রোতারা আড্ডা মারে।

প্রতিটি গ্রামের মানুষ সকাল-বিকাল মুদিখানার বারান্দায়, কামারশালায় বা ছুতোরের কারখানায় আড্ডায় বসে।

খেলার মাঠে, সে ফুটবল হোক আর হাডুডু, বুনদাঁড়ি ইত্যাদি খেলা শুরুর আগে পরে কিশোররা আড্ডা মারে। আড্ডার বিষয় হল প্রেম বা মেয়ে।

গ্রামের বৈষ্ণব আশ্রম বা বাউলের আখড়ায় সকাল-বিকেলে বিশেষ বয়সের মানুষের আড্ডা বসে। এই আড্ডায় গানবাজনা, ধর্মতত্ত্বালোচনা এবং কোনও ক্ষেত্রে গঞ্জিকা সেবনও চলে।

কৃষ্ণযাত্রা, বোলান, মনসার ভাসান ইত্যাদি লোকনাট্য ও শখের যাত্রার রিহার্সাল দেওয়ার সময় আড্ডা বসে। গ্রামের মানুষ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া দাওয়া করে রাস্তায় বের হয়। অবসর বিনোদনের জন্য তারা তাস খেলতে বসে, সেই খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি সন্ধ্যায় ও রাতে জবর আড্ডা হয়।

সবুজ বিপ্লবের আগে যখন সনাতন কৃষিপদ্ধতি চালু ছিল, তখন চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঠে কোনও ফসল থাকত না। রাখালরা গরু-মোষ মাঠে ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে আড্ডা দিত। সেখানে 'রাখালি কবি'র (অশ্লীল ছড়া) লড়াই হত। এখন সারা বছর মাঠে ফসল থাকায় রাখালের সেই কবির লড়াই গেছে বন্ধ হয়ে।

গ্রামে কোনও বাড়িতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মতো সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক দিন আগে ওই বাড়ির কর্তা নিজ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে প্রতিনিধি ডেকে সভা করেন। সভাতে বয়স্করা উপস্থিত হয়ে অতীতের নানান গল্প করেন আসন্ন অনুষ্ঠানটি কীভাবে সফল হবে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, ও সমাজের অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করা হয়। এই সুযোগেও আড্ডা বসে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নমঃশূদ্রদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিজ গ্রামের ও অন্য গ্রামের মোড়লদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, আড্ডার পরিবেশ খুব সহজেই গড়ে ওঠে।

আগে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার হরিতলায় বা দুর্গামণ্ডপের সামনে বৈশাখমাসব্যাপী প্রতিদিন নাম-সংকীর্তন হত। সেই সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে আড্ডা চলত। এভাবেই উল্টোরথ ও গ্রামীণ নানা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আড্ডা বসে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মণ্ডপতলায়, শিবপূজাকে কেন্দ্র করে গাজনতলায়, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে আড্ডা চলে সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এছাড়া বিভিন্ন মেলাতো আছেই। মেলা উপলক্ষে ছোট ছোট আসর বসে, অবশ্যই আড্ডার। আবার পৌষসংক্রান্তিতে পৌষলাকে কেন্দ্র করে আড্ডা হয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে গ্রাম-গঞ্জের হাটে চা কোম্পানিরা চায়ের প্রচারের জন্য বিনা পয়সায় জনগণকে চা খাওয়াত। গ্রামের কিছু মানুষের মধ্যে সেই চা খেতে খেতে চায়ের নেশা ঢুকে পড়ে। এখন বাড়িতে সকল সদস্য চা খেতে বসে, পারিবারিক আড্ডা দেয়। সর্বত্র এখন চায়ের দোকান, সে সব জায়গায় চা-প্রেমীদের আড্ডা খুবই জমজমাট হয়।

পুরুষদেরই শুধু আড্ডা আছে, তা নয়। গ্রামের মেয়েদেরও বিভিন্ন স্থানে আড্ডা বসে। মেয়েদের আড্ডার আসরের সবচেয়ে বড় সুবিধা এরা ছোট-বড় মানে না। একই আসরে যৌবনসংক্রান্ত আলোচনায় মা, মেয়ে, কাকিমা, জেঠিমা একসঙ্গে অংশ নেয়, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। মেয়েদের আড্ডার উৎকৃষ্ট স্থান হল নদী বা পুকুরের স্নানের ঘাট— বাসন মাজতে মাজতে, কাপড় কাচতে গিয়ে, স্নান করে ফেরার সময়। ধারাবাহিক আড্ডা চলতেই থাকে এইসব জায়গায়। এই আড্ডার বিষয় থাকে পরনিন্দা, পরচর্চা, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি। এই আড্ডা থেকে কখনও ঝগড়ারও সৃষ্টি হয়ে যায়।

আর্থ-সামাজিক কারণে ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া হিন্দু-মুসলমান সমাজের মেয়েদের ঝগড়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এদের ঝগড়ার মধ্যে একটা নাটকীয় ভঙ্গি থাকে। উচ্চস্বরে বিশেষ সুর ও ছন্দে অশালীন শব্দের ফুলঝুরি ঝরে, যৌনতাবিষয়ক অনেক প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করা হয়। ঝগড়ার জায়গায় পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে ঝগড়া উপভোগ করে এ-ও একধরনের আড্ডা বলা যায়।

এই সব পিছিয়ে পড়া পাড়ার পুরুষরা বেশির ভাগই দিনমজুর। ফলে তারা খাওয়াদাওয়া করে সাতসকালে বেরিয়ে যায়। এদের বাড়ির মেয়েরা ভোরবেলায় রান্নাবান্না করে। পুরুষরা কাজে চলে গেলে মেয়েদের বিশেষ কাজ থাকে না। তারা সারাদিন লাগাতার আড্ডা দিয়ে চলে।

বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। মেয়েলি ব্রতের ছড়াছড়ি। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মেয়েরা 'কুলাই পুজো' করে। সজ্জিত কুলো নিয়ে ওই দিন দুর্গামণ্ডপে বা ব্রাহ্মণ বাড়িতে বা পাড়ার কারও বাড়িতে সমবেত হয় পুজোর আগে ও পরে। পুকুরঘাটে গিয়ে মেয়েদের আড্ডা চলে। এই পুজো উপলক্ষে দল বেঁধে মেয়েরা মাঠে যায় খাবারদাবার নিয়ে। সেখানে বসে নিজেদের মধ্যে খাবার বিনিময় করে ও প্রচুর আড্ডা দেয়। একে বলে 'মাঠপালুনি'। এভাবেই নানা লৌকিক দেবতার পুজোকে উপলক্ষ করে মেয়েরা আড্ডায় মাতে। যেমন, হরিষষ্ঠীতে কাঁচাঘট পুজো, পৌষসংক্রান্তিতে 'বাউরি তোলা', জ্যৈষ্ঠমাসে গাছষষ্ঠীপুজো ইত্যাদি পুজোয় পাড়ার সব মেয়ে জড়ো হয় , আর খুবই সরস আড্ডা জমে।

মেয়েদের আড্ডার সবচেয়ে ভলো আড্ডা বিয়ের বাসরে। মেয়েরা সারারাত নতুন বরকে নিয়ে হাসি-মস্করা করে, বৌদিস্থানীয়রা আদিরসাত্মক কথাবার্তা বলে আসর জমিয়ে দেয়। রাত কাটে আড্ডায় মশগুল হয়ে। এটাই বোধহয় মেয়েদের দীর্ঘতম আড্ডার আসর।

মেয়েদের আড্ডার আরও অনেক সুযোগ আছে বিয়ে উপলক্ষে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুদের মধ্যে (বিশেষত ফরিদপুর জেলার) 'অকূলে পুজো' প্রচলন আছে। নববধূ শ্বশুরবাড়িতে আসার কিছুদিন পর এই পুজো হয়। সম্পূর্ণ মহিলাকেন্দ্রিক এই পুজোয় প্রতিবেশী মেয়ে-বউ ও বৃদ্ধদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৃদ্ধারা পৌরাণিক গল্প বলেন। বর-কনেকে কেন্দ্র করে আড্ডা বসে।

এইরকম অজস্র আড্ডা আছে গ্রামের মহিলাদের জন্য। মহিলাদের আড্ডা দেওয়ার একটা অন্যতম জায়গাও অবলুপ্তির পথে। গ্রামীণ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঢেঁকি প্রাণবন্তভাবে যুক্ত। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহে ঢেঁকিপুজো একটা অধ্যায়। গ্রামীণ বিবাহে নান্দীমুখের সময় ঢেঁকিতে ধান ভানা একটা অপরিহার্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিয়ের গাত্রহরিদ্রার হলুদ কোটা হয় ঢেঁকিতে। এই রকম আরও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঢেঁকি অত্যন্ত জরুরি।

ঢেঁকিঘরে মেয়েদের আড্ডা বেশই প্রাণবন্ত হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানতে, চিঁড়ে কুটতে কমপক্ষে তিন জন লাগে। দু'জন পাড় দেবে, একজন 'নোটে'র মধ্যে নেড়ে দেবে। কাজও চলে, মুখও চলে। তাদের সঙ্গে জোটে আরও মহিলা। সেই আড্ডায় সাংসারিক অনেক কথা তো হয়ই পরচর্চা চলে। ফলে আড্ডা ভালোই জমে। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে গ্রামে হাস্‌কিং মেশিন ও চিঁড়ে কোটার থ্র্যাশার আসায়

ঢেঁকির অপমৃত্যু ঘটে গেছে। মহিলাদেরও একটা বড় আড্ডার স্থান চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সংস্কৃতি, এমনকী আড্ডার জায়গারও পরিবর্তন হচ্ছে। ঘাসজমি বা রাস্তার ধারে দরমার বেড়া ও টালির চ'ল দিয়ে ক্লাবঘর বানিয়ে পাড়ার যুবকরা সেখানে আড্ডা দেয়। আবার বেকার যুবকরা মিলে সমিতি গঠন করে তহবিল তৈরি করে টাকা খাটায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই ক্লাবে সারাদিন আড্ডা দেয় অনেকেই।

মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজে একটা সামাজিক বন্ধন থাকেই। গ্রামীণ সমাজে এই বন্ধনটা প্রবল। বন্ধনে শিথিলতা এলে ঝড় ওঠে গ্রামীণ সমাজে। এবং তা আড্ডার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও আত্মহত্যা, হত্যা, বধূনির্যাতন, ডাকাতি, মারামারি ইত্যাদি ঘটনা কোনও গ্রামে ঘটলে সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির নিস্তরঙ্গ জীবনে আলোড়ন ওঠে। ফলে আড্ডায় ওই ঘটনা মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

তবে গ্রামীণ আড্ডার মুখ্য বিষয় হল— পরনিন্দা, পরচর্চা। আড্ডার এই পরনিন্দা ও পরচর্চার যতই খারাপ দিক থাকুক না কেন, এর কিছু ভালো দিকও আছে। যেমন, এই কারণে গ্রামসমাজে অনেকেই সংযত জীবন-যাপন করে। গ্রামীণ প্রবাদ আছে—'পাশাপাশি বাস/ দেখাদেখি চাষ'। আড্ডার মাধ্যমে নবীনরা প্রবীনদের কাছ থেকে চাষের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় কীভাবে শস্যকে রক্ষা করা যায়, সেসব শিক্ষা পায় আড্ডা থেকেই।

এই সব আড্ডা থেকে ছেলে-মেয়ের বিবাহের যোগাযোগ হয় কখনও। শস্য ও গরু-মোষ কেনাবেচার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজের তরুণ-তরুণীরা বিপথগামী হচ্ছে কি না, সে সব তথ্যও পেয়ে যায় আড্ডা থেকে।

গ্রামীণ আড্ডায় আরও ভালো দিক দেখা যায়। যতই পরনিন্দা বা পরচর্চা হোক না কেন, সমাজে যতই দলাদলি, গোষ্ঠীকোন্দল থাকুক না কেন, এ সব আড্ডাই সকলের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিপদে-আপদে মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে।

সবশেষে বলা যায়, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে আড্ডা হল বিনোদন। সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই বিনোদন এখনও জরুরি।

আরও গাঙচিল

গল্প

আশমানি কথা. উচ্ছেদের ৫ কহন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫
ও কমরেড: এক যুগ তেরো গল্প শৈলেন সরকার ১৫০
তাহাদের কথা: পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ ও
জীবনের গল্প সম্পাদনা: মিলন দত্ত ১০০
অন্নদাতা ও অন্যান্য গল্প সত্য মণ্ডল ১৫০

উপন্যাস

জন্মের মাটি শান্তা সেন ১৫০
পিতামহী শান্তা সেন ১৫০
ছায়া পুতুলের খেলা রবিশংকর বল ১৭৫
রক্তপুঞ্জে গেঁথে যাওয়া মাছি আকিমুন রহমান ২০০
আঠারো কাঠার বাড়ি আকিমুন রহমান ২০০
পুরুষের পৃথিবীতে এক নারী আকিমুন রহমান ১৭৫
মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল অভিজিৎ সেন ২০০
সংক্রমণ শৈলেন সরকার ১৫০
নষ্টনগর স্বরূপ দত্ত ২০০
চৈত্রফুল অনিল ঘড়াই ১৭৫
সরল উপাখ্যান সমীরণ দাস ১৫০

প্রবন্ধ

অলীক সংলাপ রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত ২০০
এতদিন ডাকে না-ফেলা চিঠি অশোক মিত্র ২০
অন্তের স্পর্শের মতো শঙ্খ ঘোষ ২০
লোকায়তের অন্তরমহল সুধীর চক্রবর্তী ২৫
কলকাতা প্রতিদিন অশোক মিত্র ২৫০
নির্বাচিত ধ্রুবপদ-১ সম্পাদনা: সুধীর চক্রবর্তী ৫০০
দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা (দ্বিতীয় মুদ্রণ) সম্পাদনা: সেমন্তী ঘোষ ২৫০
স্বাধীনতা· স্বদেশ, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পাদনা: আনন্দ দাশগুপ্ত ২৫০
মননের মধু অরিন্দম চক্রবর্তী ২৭৫
জীবনানন্দ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভূমেন্দ্র গুহ ২৭৫
তথ্যের অধিকার (পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ) সম্পাদনা· ভবেশ দাশ ২৫০
সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি সম্পাদনা· ভবেশ দাশ ৪০০
সংস্কৃতি, কী আছে তোমার পেটিকায় হাসান আজিজুল হক ১৫০
বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায় সুধীর চক্রবর্তী ১৭৫
কলিযুগ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ২৫০
ফকিরনামা সুরজিৎ সেন ২৭৫
বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
মিডিয়া নিয়ে সাতপাঁচ সোমেশ্বর ভৌমিক ১৭৫
ভগবানের লেঠি: ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ আশীষ লাহিড়ী ১৭৫
শ্বেত অশ্ব আর ইয়েসমিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ শুভাপ্রসন্ন ১৭৫
শূদ্র জাগরণ গৌতম রায় ১৭৫
আদরের উপবাস: রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০
রামানুজন· গণিত ও নিয়তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি মিহির সেনগুপ্ত ১৫০
চলমান যৌনকর্মী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) সুবোধ দাস ২০০
অনন্তের অ্যানাটমি স্বাতী ভট্টাচার্য ২০০
বিবি থেকে বেগম (দ্বিতীয় মুদ্রণ) আকিমুন রহমান ১৫০
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ: (দ্বিতীয় মুদ্রণ) দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ১৫০
পরমাণু চুক্তি নয়. নবীকরণযোগ্য শক্তিই ভরসা (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রদীপ দত্ত ১৫০